মাক্বামাতে মাযহারী

শাহ্ গোলাম আলী দেহলভী র.

২

মাক্বামাতে মাযহারী

হাকিমাবাদ
খানকায়ে
মোজাদ্দেদিয়া

মাক্বামাতে মাযহারী

শহীদ মির্জা মাযহার র. এর জীবন ও কর্ম

২য় খণ্ড

শাহ্ গোলাম আলী দেহলভী র.

অনুবাদ

মাওলানা মুমিনুল হক

সম্পাদনা

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

মাক্বামাতে মাযহারী

দ্বিতীয় খণ্ড

শাহ্ গোলাম আলী দেহলভী র.

অনুবাদ

মাওলানা মুমিনুল হক

সম্পাদনা

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশক

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া

ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০১০

মুদ্রক

শওকত প্রিণ্টার্স

১৯০/বি, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

ফোন- ০১৭১১-২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫-৩০২৭৩১

প্রচ্ছদ

আব্দুর রোউফ সরকার

বিনিময়

১১৫ টাকা

MAQAMATE MAZHARI (Volume-II**)** A Life Sketch of Shaheed Mirja Mazhar Jane Janan by Shah Golam Ali Dehlabhi (Rh.) translated in Bengali by Maolana Mominul Haque/Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia, Bhuigar, Narayangonj, Bangladesh. Exchange Tk. 115 US $ 10

ISBN 984-70240-0061-3

শাহ্ গোলাম আলী দেহলভী র.

জীবনের মানে জানে সফেদ কপোত
দীলের দুয়ারে দোলে দখিনা মলয়
তোমাকেই ভালোবাসি প্রেমের শপথ
মালিকের মজলিশে দেখা য্যানো হয়
আঁধার আকাশে জ্বেলে দ্বীনের হেলাল
চলে গেলে চরাচর ছেড়ে আখেরাতে
কাঁদালে আশেকজনে কাঁদালে স্বকালে
আজো জ্বলো দীপ হয়ে স্মৃতির সভাতে ।

অতীতের ইতিহাসে তোমার এসেম
গোলাম আলীর নামে নূরানী হরফে
যেমন খোদাই আছে, সে কিসিম প্রেম
জ্বলুক আবার তেজে বুকের বরফে ।

তুহিন তিমিরে এনে ইমানের তাপ
আবার দেখাও দ্বীন,প্রেমের প্রতাপ ।

আমাদের প্রকাশিত বই

তাফ্‌সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
মাক্বামাতে মাযহারী ১ম ও ২য় খণ্ড
মুকাশিফাতে আয়নিয়া
মাআরিফে লাদুন্নিয়া
মাব্‌দা ওয়া মা'আদ

মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
নকশায়ে নকশ্‌বন্দ ◆ চেরাগে চিশ্‌তী ◆ বায়ানুল বাকী
জীলান সূর্যের হাতছানি ◆ নুরে সেরহিন্দ ◆ কালিয়ারের কুতুব ◆ প্রথম পরিবার
মহাপ্রেমিক মুসা ◆ তুমিতো মোর্শেদ মহান ◆ নবীনন্দিনী

আবার আসবেন তিনি
সুন্দর ইতিবৃত্ত ◆ ফোরাতের তীর ◆ মহাপ্লাবনের কাহিনী
দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন ◆ কী হয়েছিলো অবাধ্যদের

THE PATH
পথ পরিচিতি ◆ নামাজের নিয়ম ◆ রমজান মাস ◆ ইসলামী বিশ্বাস
BASICS IN ISLAM ◆ মালাবুদ্দা মিনহু

সোনার শিকল
বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন ◆ সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
তৃষিত তিথির অতিথি ◆ ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
নীড়ে তার নীল ঢেউ ◆ ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

সূচীপত্র

মাক্বামাতে মাযহারী

بسم الله الرحمن الرحيم

শায়েখ সাদী রহ. এর একটি কবিতার মর্ম-বক্তব্য এরকম— প্রেম শিখতে হলে পতঙ্গের কাছে শেখো। তারা আলোর প্রেমিক। আলোর উপরেই তারা বার বার ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে, যতক্ষণ না মৃত্যুবরণ করে।

আল্লাহ্প্রেমিকগণ এরকমই করেন। নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহ্র স্মরণমগ্ন হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকেন আল্লাহপ্রেমের আগুনে। এভাবেই একসময় আলিঙ্গন করেন মৃত্যুকে।

তাঁরা আছেন বলেই এখনো পৃথিবী আছে। জীবন আছে। জীবনের প্রবহমানতা আছে। সংসার-সমাজ আছে। পথপ্রাপ্তি, পরিত্রাণ আছে তাঁদেরই কাছে। তাঁরাই আল্লাহর পথের যোদ্ধবৃন্দ। শয়তান ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে তাঁরা নিরন্তর যুদ্ধরত। অপ্রেমের অমানিশা দূর করে তাঁরাই মহামানবতার ললাটদেশে উদ্ভাসিত করে তোলেন প্রেম ও প্রজ্ঞার অক্ষয় প্রত্যুষ। তাঁদের আদর্শের আমন্ত্রণ অনির্বাণ দীপশিখা হয়ে আমাদেরকে প্রেমপথে সমর্পিত করে দিতে চায়।

আসুন। নিকটতর হই। তাঁরা আল্লাহ্র ওলী (বন্ধু)। তাঁদের কথা মহাগ্রন্থ আল কোরআনে ঘোষিত হয়েছে এভাবে— 'জেনে রাখো! আল্লাহ্র বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না'।

তাঁরাই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। প্রতিনিধি। আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রিয়ভাজন ও নৈকট্যভাজন হতে গেলে তাঁদের সংসর্গধন্য হওয়া ছাড়া অন্য কোনো অবলম্বন আর নেই। আল্লাহ্পাকের নির্দেশও এরকম— 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সত্যবাদীগণের অন্তর্ভুক্ত হও'।

আউলিয়া কেরামের দলমধ্যে রয়েছেন বহুবিধ পূর্ণত্ব এবং উৎকর্ষ লাভকারীগণ। মির্জা মাযহার র. ছিলেন তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠগণের একজন। প্রেম ও প্রজ্ঞার প্রতিভূ ছিলেন তিনি। আল্লাহপ্রেমের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন অগণিত আল্লাহ্অন্বেষকগণের অন্তরে।

একথা বহুজনবিদিত যে, মোজাদ্দেদিয়া তরিকার পীর-বুজুর্গগণ মহান প্রভুপালকের দরবারে বিভিন্ন কামালিয়াত লাভ করে ধন্য হয়েছেন। এই তরিকার অনুসারীগণের উচিত, তাঁদের প্রত্যেকের জীবন, কর্মপ্রণালী ও উপদেশবাণী সম্পর্কে জানা। তাঁদের রচিত গ্রন্থসমূহের জ্যোতিধারায় স্নাত হওয়া। এর বিকল্প কিছু নেই।

'মাক্বামাতে মাযহারী' তেমনই জ্যোতির্ময় একটি গ্রন্থ। এর স্বনামধন্য রচয়িতার নাম শাহ্ গোলাম আলী দেহলভী। এই দ্বিতীয় ও শেষ খণ্ডে তাঁর জীবনচরিত সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে তাঁর প্রিয়তম খলিফা শাহ্ আবু সাঈদের জীবনালেখ্যও।

মীর্জা মাযহারে শহীদ জানে জানাঁ, শাহ্ গোলাম আলী দেহলভী এবং শাহ্ আবু সাঈদের নাম আমাদের সেজরা শরীফে রয়েছে ২৮, ২৯ এবং ৩০ সংখ্যক ক্রমধারায়। এই ত্রয়ী ওলী-আল্লাহ্র মাজার শরীফও রয়েছে একই বেষ্টনীতে, পাশাপাশি। দিল্লী শহর তাঁদেরকে বুকে ধরে রাখতে পেরে নিশ্চয় ধন্য। কৃতজ্ঞও। বহুদেশের জিয়ারতকারীগণ এখনও সেখানে গমন করেন। ফিরে আসেন হৃদয়ের পাত্র পূর্ণ করে নিয়ে। পরিতৃপ্তির অপরিতৃপ্তি নিয়ে।

হে আমাদের মহিমময়, প্রেমময়, মহাপ্রতাপশালী, অপ্রতিরোধ্য অভিপ্রায়ধারী আল্লাহ্! তুমি অনুগ্রহের অন্তহীন পারাবার! সতত ক্ষমাপরবশ! আমরা তোমার দয়া ও ক্ষমাপ্রাপ্তির আশায় সতত তোমার পানেই ধাবমান। দয়া করে আমাদেরকে গ্রহণ করো। সর্বোৎকৃষ্ট দরূদ ও সালাম অনন্তকাল ধরে অন্তহীন ধারায় বর্ষণ করো তোমার একান্ত প্রেমাস্পদ মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা স. এর প্রতি। তাঁর মোহেব ও মাহবুবগণের প্রতি। আমীন।

আমরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছি— প্রশংসা-প্রশস্তি-স্তব-স্তুতি সবকিছুই তোমার।

শুরুতে ও শেষে সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ

বিশেষ ব্যক্তিবর্গের নিকট লিখিত মকতুবসমূহ

মকতুব–১

স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তুমি আমার বংশমর্যাদা সম্পর্কে জানতে চেয়েছো। এতে হয়তো তেমন কোনো কিছু ছিলো, তাই এর মধ্যে ছিলো এক ধরনের উদাসীনতার প্রভাব। কিন্তু শেষে তোমার অনুরোধ সীমা অতিক্রম করলো। তাই সংক্ষেপে কিছু লিখতে বাধ্য হলাম।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, এ ফকীরের অস্তিত্বের আগমন ঘটেছে এক ফোঁটা পানি থেকে, আর তার পরিণতি হচ্ছে এক মুঠো মাটি। পরীক্ষার জগতে এ অধমের বংশধারা আটাশ ওয়াসেতায় (মাধ্যমে) হজরত শেরে খোদা আলী মুর্তযার রা. পুত্র মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া পর্যন্ত পৌঁছেছে।

আমার পিতামহগণের মধ্য থেকে একজন আমীর কামালুদ্দীন তায়েফ থেকে হিজরী অষ্টম শতাব্দীতে কোনো এক কারণে তুর্কিস্তানে এসেছিলেন। সেখানে এসে তিনি সেখানকার উলুশ কাকশালান গোত্রের সরদার জনৈক শাসকের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন এবং ওই গোত্রের ঘনিষ্ঠতা অর্জন করেছিলেন। ওই সরদারের যেহেতু কোনো পুত্রসন্তান ছিলো না, তাই সে এলাকার শাসনের দায়িত্ব পড়েছিলো আমীর কামালুদ্দীনের আওলাদগণের উপর।

বাদশাহ্ হুমায়ুন যখন ভারত রাজ্য আফগান সুর বংশের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করেন, তখন এই খান্দানের দুই ভাই মাহবুব খান এবং বাবা খান, যাঁরা তিন পুরুষের মাধ্যমে আমীর কামালুদ্দীনের আওলাদ ছিলেন— তাঁরা বাদশাহ্ হুমায়ুনের সঙ্গী হয়েছিলেন। এই দুইজনের জীবনী আকবরী শাসনামলের ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাঁদের মাতৃবংশ আমীর সাহেবে কোরআন তৈমুর পর্যন্ত পৌঁছেছে। আমার বংশ শুধু চার পুরুষে বাবাখান পর্যন্ত পৌঁছেছে। বাবাখান আকবরী শাসনামলে বিদ্রোহ করেছিলেন। সেই অপরাধের শাস্তি দেয়া হয়েছিলো আমার পিতা মির্জা জানকে। সে শাস্তি ছিলো পদাবনতি। তিনি জীবনের এক বিরাট অংশ

কাটিয়েছিলেন বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের খেদমতে। অবশেষে জীবনের এক পর্যায়ে এসে তিনি তরকে দুনিয়ার দৌলত লাভ করেছিলেন এবং তিনি কাদেরিয়া তরিকার খলীফা আবদুর রহমান দেহলভী থেকে ফায়দা হাসিল করেছিলেন। ১১৩০ হিজরী সনে তাঁর ইনতেকাল হয়।

আমার জন্ম হয় ১১১৩ হিজরীতে। ষোল বছর বয়সে আমি পিতৃহারা। বিশ বছর বয়সে হিম্মতের মাধ্যমে কোমর বেঁধে দুনিয়াত্যাগী হয়ে যাই এবং ফকিরীর জীবন শুরু করে দেই।

আমি সে সময়ের প্রচলিত শিক্ষা গ্রহণ করেছিলাম আমার পিতার জীবদ্দশায় পিতার কাছ থেকেই। তারপর হাজী মোহাম্মদ আফজল শিয়ালকোটি, যিনি শায়েখুল হাদিস শায়েখ আবদুল্লাহ ইবনে মালেক মক্কীর শাগরেদ ছিলেন— তাঁর কাছ থেকে হাদিসের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করি। হাফেজ আবদুর রসুল দেহলভী— যিনি শায়েখুল কুররা শায়েখ আবদুল খালেক শাওকীর কাছ থেকে এলমে ক্বেরাতের সনদ গ্রহণ করি।

নকশ্বন্দিয়া তরিকার জিকির, খেরকা ও এজাযত লাভ করি সাইয়্যেদ নূর মোহাম্মদ বদায়ুনী র. এর কাছ থেকে, যিনি দু'ওয়াসেতায় হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। জীবনের একটি অংশ আমি তাঁর খেদমতে অতিবাহিত করেছি। তাঁর ইনতেকালের পর নকশবন্দিয়া তরিকার বিভিন্ন মাশায়েখ থেকে ফায়দা গ্রহণ করেছি। অবশেষে শায়েখ মোহাম্মদ আবেদ সুনামী র. এর নিকট থেকে ফয়েজ গ্রহণ করেছি। তিনিও দু'ওয়াসেতায় হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. পর্যন্ত পৌঁছেছেন।[১] তাঁর নিকটে দীর্ঘকাল থেকে কাদেরিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া ও চিশতিয়া তরিকার খেরকা এবং এজাযত হাসিল করি। এখন পর্যন্ত (১১৮৫ হিজরী) ওই সকল হজরতের নির্দেশে তালেবে মাওলাগণের তালীম ও তরবিয়াতের কাজে নিজেকে মশগুল রেখেছি। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীব সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর বরকতে খাতেমা বিল খায়ের নসীব করুন। আমিন।

মকতুব–২

নকশ্বন্দিয়া তরিকার অনুসারী যাঁরা উচ্চ মাকামের দাবী করেন— তাঁদের উপর আরোপিত প্রশ্নের জবাব প্রসঙ্গে।

স্নেহবরেষু! তুমি দু'টি সন্দেহের বিষয়ে লিখেছো। একটি হচ্ছে সেরহিন্দ শরীফের হজরতগণ অর্থাৎ মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর আওলাদ ও খলীফাগণ উচ্চ মাকামের দাবী করে থাকেন। কিন্তু তার নমুনা পূর্ববর্তী ওলীগণের

মতো করে প্রকাশ পায় না। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে— তাঁরা আপন মুরিদগণকে শানদার সুসংবাদ শুনিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁদের হালসমূহ উক্ত সুসংবাদের উপর প্রমাণ হিসাবে সাব্যস্ত হয় না। তাঁদের ওই সমস্ত বর্ণনা দ্বারা তাঁরা যে পূর্ববর্তী ওলীগণের সমপর্যায়ের তা প্রমাণিত হয় না।

প্রথম সন্দেহের জবাবঃ জেনে রাখা প্রয়োজন যে, আগেকার জামানার বুজুর্গগণ ফানার স্তরসমূহের বাস্তবায়নের পরও উচ্চতর কামালাতের দাবী করতেন। এ সকল বিষয়ের বর্ণনা বিভিন্ন গ্রন্থে ভুরি ভুরি রয়েছে।

বস্তুতঃ আউলিয়া কেরামের এক জামাত এমন ছিলেন যে, ওই সকল শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে বর্ণনা প্রকাশ করতে তাঁরা আদিষ্টই ছিলেন। আর এক দল মত্ততার প্রাবল্যের কারণে ছিলেন আত্মনিয়ন্ত্রণহীন (মাযুর)। সুতরাং এ তরিকার শ্রেষ্ঠত্বের প্রচারের বিষয়ে এ দু'টি বিষয়ের যে কোনো একটিকে মনে রাখা উচিত। মনে রাখতে হবে নবুওয়াত ব্যতীত অন্য কামালিয়াতসমূহ শেষ হয়ে যায়নি। ফয়েজের উৎস আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ সম্পর্কেও কৃপণতার ধারণা করা যায় না। সুতরাং ওই বুজুর্গগণের বিষয়ে সুধারণা রাখতে বাধা কোথায়? শেষ কথা হচ্ছে, তাঁরা ছিলেন মুসলমানদের মধ্যে পুণ্যবান। কামালিয়াতের নমুনা প্রকাশ পাওয়া যদি দৃঢ়তার সাথে হয়, তবে বুঝতে হবে, তাঁরা ছিলেন কারামতের ঊর্ধ্বে। সুতরাং এ তরিকার শক্তিশালী আসহাব যাঁরা, তাঁদের কাছ থেকে পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে তা প্রকাশ পেয়েছে। যারা দুর্বল তাদের বিষয় ধর্তব্য নয়। আর যদি কামালিয়াত দ্বারা কারামত ও কাশফ উভয়েরই প্রকাশ বুঝায়, যা সর্বসাধারণ পছন্দ করে থাকে, তাহলে বলতে হয়, এ বিষয়টিকে সুফিয়ানে কেরাম বেলায়েতের জন্য শর্ত মনে করেন না এবং তা বেলায়েতের জন্য অপরিহার্যও নয়।

এ কথা অবিদিত নয় যে, সাহাবা কেরাম যাঁরা সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাঁদের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি খুব কম প্রকাশিত হয়েছে। যেহেতু নকশ্বন্দিয়া তরিকা মোজাহাদা ও রিয়াজতের দিক দিয়ে সাহাবা কেরাম ও তাবেয়ীগণের অনুরূপ এবং কিতাব ও সুন্নাহর পূর্ণ অনুসরণকারী, তাই এ তরিকার পুরোধাগণের শওক (আস্বাদন) ও বেজদান (প্রাপ্তি) সাহাবা কেরামের অনুরূপ। 'ফালা তাকুনান্মিনাল মুমতারীন'[২] (সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্গত হয়ো না)।

দ্বিতীয় সন্দেহের জবাবঃ কামেল ব্যক্তিবর্গের বাতেন জগতের পূর্ণতা সম্পর্কে অবগত হওয়া সহজ কাজ নয়। বিশেষ করে এ তরিকার নেসবত যা প্রকার ও ধরনরহিত তা সাধারণজনের অবগত হওয়ার বিষয় নয়। তবে যিনি সহী ফেরাসতের (অন্তর্দৃষ্টির) অধিকারী, তাঁর কাছে বিষয়টি গোপন থাকে না। বাহ্যিক আলামত প্রকাশ পাওয়ার ক্ষেত্রে অধিক ইবাদত, সাধনা, শিখরস্পর্শী জওক শওক এবং দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি তো থাকেই। এর মধ্যে মুখলিস ও

রিয়াকারী, নিষ্ঠাবান ও দাম্ভিক, হক ও বাতেল (সত্য ও মিথ্যা) পন্থী সকলেই শরীক থাকতে পারে। কোনো কোনো সময় মাসুম (নিষ্পাপ) অর্থাৎ আম্বিয়া কেরাম ব্যতীত অন্যান্যদের ক্ষেত্রে পাপও প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে।

সত্য কথা হচ্ছে, নবুওতের জামানা দূরবর্তী এবং কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হওয়ার কারণে জাহেরী এবং বাতেনী বিষয়সমূহের পূর্ণতার ক্ষেত্রে দুর্বলতা উপস্থিত হয়েছে।

তাই বলে বর্ণিত সুসংবাদ অবাস্তব নয়। এ সকল সুসংবাদ থেকে মাশায়েখগণের উদ্দেশ্য একথাই বুঝানো যে, মুরিদগণ উক্ত মাকামসমূহের মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম। এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, মুরিদগণ খ্যাতনামা আউলিয়া কেরামের মতো শক্তি ও উচ্চ মর্যাদা হাসিল করে নিয়েছে, যার মধ্যে পারস্পরিক সমতা অপরিহার্য হয়। একজন ভালো যোগ্যতাসম্পন্ন তালেব যদি জীবনের একটি অংশ এহেন চেষ্টা সাধনার মধ্যে ব্যয় করে এবং এই বুজুর্গগণের বাতেনী যোগ্যতায় শরীক হতে পারে, তাহলে তা অর্জন করা অসম্ভব কিছু নয়।

ফয়েজ রূহুল কুদ্দুস আয় বাযে মদদ ফরমায়েদ
দিগারাঁ হাম বকতাদ আঁচে মসীহামী কারদ।

অর্থঃ জিবরাইলের ফয়েজের মতো ফয়েজ যদি সাহায্য করে, তবে পরবর্তীগণও ওই সকল বিষয় প্রদর্শন করতে পারবে, যা নবী ঈসা দেখিয়েছেন।

জেনে রাখা উচিত যে, হজরতগণের নেসবত হচ্ছে প্রতিবিম্বজাত। আয়নার মধ্যে সূর্যের যেরূপ প্রতিফলন ঘটে ঠিক তদ্রূপ। পীরের আয়না (কলব) এর নূর মুরিদের উপর প্রতিফলিত হওয়ার জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। এমনকি সেই প্রতিবিম্বটি একীনে পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং মুরিদ কামালিয়াত (পূর্ণতা) অর্জন এবং পূর্ণতা প্রদানের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। কোনো কোনো সময় মাকাম অর্জিত না হয়ে তার প্রতিবিম্ব মুরিদের বাতেনের আয়নায় প্রতিফলিত হতে শুরু করে এবং সেই মাকামটি সাব্যস্ততার স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। এমতাবস্থায় পীর সূক্ষ্ম কাশফ এবং সাব্যস্ততার দৃষ্টিকে কাজে লাগানো ব্যতীতই মুরিদকে উক্ত মাকামের সুসংবাদ জানিয়ে দেন। অতঃপর মুরিদ তার পীর থেকে পৃথক হওয়ার পর ওই নেসবতটি বিলুপ্ত হয়ে যায়, যা পীরের পাশে থাকার শর্ত সাপেক্ষে অর্জিত হয়েছিলো। সুতরাং যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়, তা প্রকাশ পায় না। এরকম অবস্থা ভালো নয়। এটি ভুল এবং এ ধরনের ভুল বক্তব্য বিশেষ করে এ যুগে রেওয়াজে (প্রথায়) পরিণত হয়েছে। কেনো না এই পীরদের মধ্যে কাশফের নেসবত খুব কম পাওয়া যায়। তাছাড়া মুরীদগণেরও হিম্মত দুর্বল হওয়ার কারণে তারা এজাযতপ্রাপ্তির বাণী বা মাকাম লাভের সুসংবাদ শোনার জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকে।

মকতুব–৩

সুফিয়ানে কেরামের পরিভাষা ‘নেসবত’ শব্দের অর্থ

তুমি প্রশ্ন করেছিলে, সুফিয়ানে কেরামের পরিভাষা ‘নেসবত’ শব্দের অর্থ কী?

জেনে রাখা উচিত, আরবী ভাষায় নেসবত শব্দের অর্থ দু’দিকের সাথে সম্পর্ক। সুফিয়ানে কেরামের পরিভাষায় নেসবত শব্দটির অর্থ ওই সম্পর্ক, যা আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে হয়ে থাকে। মানতেকীদের পরিভাষায় স্রষ্টা ও সৃষ্টির সাথে সম্পর্ককে বলে নেসবত। যেমন পাতিলের সাথে কুমারের সম্পর্ক। বাহ্যিকভাবে কিতাব ও সুন্নত দ্বারাও এ রকম অর্থই প্রকাশ পাায়।

সুফিয়ানে কেরামের মধ্যে যাঁরা ওয়াহদাতুল ওজুদ বিশ্বাস করেন, তাঁদের মতে নেসবতের অর্থ কাছরতের (অধিকতার) মধ্যে ওয়াহদাত (অনেকের মধ্যে একক দর্শন) এর বহিঃপ্রকাশ। যেমন পানির ঢেউ ও সলিলবিন্দুর মধ্যে পানির বহিঃপ্রকাশ। তাঁরা বলে থাকেন, এই কাছরত আমাদের হাকীকী ওয়াহদাত (প্রকৃত একক) এর মধ্যে কখনও বেষ্টনকারী হতে পারে না। এ ব্যাখ্যার কথা হচ্ছে হক তায়ালার সঙ্গে মাখলুকের ‘আইন’ (সত্তা) সাব্যস্ত করা। তাঁরা বিষয়টিকে ব্যাখ্যা ও উদাহরণসহ আকল ও শরীয়তগত জ্ঞানের মাধ্যমে পেশ করেন।

ওয়াহ্‌দাতুশ্‌ শুহুদে বিশ্বাসী সুফিয়ানে কেরাম এ নেসবতকে আসল (মূল) ও যিল (প্রতিবিম্ব) এর সাথে সম্পর্ককে বুঝে থাকেন। যেমন সূর্য থেকে বিকশিত রশ্মির সঙ্গে রয়েছে সূর্যের নেসবত। এখানে যিল বা প্রতিবিম্ব দ্বারা তাজাল্লি (বিকাশ) বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মরতবায়ে ছানিয়ায় (দ্বিতীয় পর্যায়ে) কোনো জিনিস প্রকাশিত হওয়া। সুতরাং প্রতিবিম্বগত আধিক্য সূর্যের প্রকৃত এককত্বের মাকাম নয়। প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য এতোটুকুই যে, যিল (প্রতিবিম্ব) এর কোনো হাকীকত (তত্ত্ব) নেই। আর হাকীকত তার আসল (মূল) থেকে পৃথক নয়। এই সত্তাই আসল, যিনি মর্তবায়ে সানিতে (দ্বিতীয় স্তরে) আবির্ভূত হয়ে নিজেকে প্রতিবিম্বরূপে জাহির করেছেন। তাই বলে একটিকে অপরটির সদৃশ মনে করা ঠিক নয়। এ সাদৃশ্য ঢেউ এবং সাগরের বেলায় সঠিক হবে। তাই ওয়াহ্‌দাতুশ্‌ শুহুদ মতের অনুসারীগণ এ ব্যাখ্যার মাধ্যমে ‘অপরত্ব’ এভাবে সাব্যস্ত করেন যে, তৌহিদে ওজুদীতে যেনো প্রকৃতপক্ষে কোনো ত্রুটি সৃষ্টি না হয় এবং কিতাব ও সুন্নত দ্বারা সহজে বিষয়টির মর্মোদ্ধার করা যায়।

প্রথম সংজ্ঞা অনুসারে নেসবত এর অর্থ যে কাছরতের মধ্যে ওয়াহদাত বা অনেকের মধ্যে এক দর্শন, তার তাৎপর্য সুফিয়ানে কেরামের কিতাবসমূহ থেকে জানতে হবে। ওয়াহদাতুশ্‌ শুহুদ মতাবলম্বীগণের নিকট নেসবত শব্দের সংজ্ঞা এরকম সম্ভাব্য বস্তুর হাকীকত এলমে এলাহীর স্তরে আদম (অস্তিত্বহীনতা) এবং

ওজুদ (অস্তিত্ববানতা) এর মধ্যে মিশ্রিত থাকা। এভাবে আদমে এযাফী (সম্বন্ধকৃত নিস্তি) সমূহ যেমন আদমে এলেম (জ্ঞানহীনতা) বুঝাতে বলা হয় 'জেহেল' এবং আদমে কুদরত (শক্তিহীনতা) বুঝাতে বলা হয় ইজয (অক্ষমতা)। এ সকল শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে। এগুলো দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। সিফতে হাকীকী বা প্রকৃত গুণাবলীর আয়না এ সকল আদমের বিপরীত। আর ওই সকল সিফতের প্রতিবিম্ব এই আয়নাসমূহে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। আর এ মিশ্রণই হচ্ছে আলমের তাআইয়্যুনসমূহের উৎস। তাঁদের মতে এলেমের মধ্যে আইনে ছাবেতা আদমে এযাফী ও সিফতে হাকীকীর প্রতিবিম্বের সাথে মিশ্রিত, বহির্জগতীয় ছায়ার দর্পনসমূহ যা প্রকৃত বহির্জগতের প্রতিবিম্ব এবং যা বহির্জগতীয় প্রতিক্রিয়ার উৎস হয়ে গিয়েছে। তাঁদের মতে বহির্জগতীয় আইন (মূল সত্তা) ওজুদে যিল্লী (প্রতিবিম্বজাত অস্তিত্ব) এর মধ্যে বিদ্যমান এবং খারেজে যিল্লি সুসাব্যস্ত এবং যা ওজুদে হাকীকী (প্রকৃত অস্তিত্ব) এর জন্মভূমি। দুনিয়া এবং তার অনুগামী সকল কিছু প্রতিবিম্ব বা ছায়া হিসাবে আল্লাহ্তায়ালার সত্তা থেকে অস্তিত্বপ্রাপ্ত। কারণ ওজুদে হাকীকী (বাস্তব অস্তিত্ব) এবং খারেজে হাকীকী (বাস্তব বহির্জগত) উভয়ের মধ্যে আল্লাহ্তায়ালা ব্যতীত আর কোনোকিছু নেই। তৌহিদের তাৎপর্য এটাই।

আদম (নিস্তি) হচ্ছে যাবতীয় মন্দ ও ত্রুটির উৎস স্থল। আর ওজুদ (হাস্তি) হচ্ছে কল্যাণ ও পূর্ণতার উৎস। দুনিয়া হচ্ছে আদম ও ওজুদের মিশ্রণ। বরং আদম (নিস্তি) হচ্ছে তার যাতি বৈশিষ্ট্য, আর ওজুদ (হাস্তি) হচ্ছে ধারকৃত। এ কারণেই দুনিয়ায় রয়েছে সুন্দর ও কুৎসিত উভয়ের অবস্থান। তবে সৌন্দর্যের যাবতীয় দিক আল্লাহ্তায়ালার সত্তা থেকে কল্যাণপ্রাপ্ত। যাবতীয় প্রকারের মন্দ আদমের পক্ষ থেকে আগত। সালেক যখন তার যোগ্যতার শক্তি এবং শায়েখের জযবা (আকর্ষণ) দ্বারা (যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তায়ালার জযবার প্রতিবিম্ব) সায়েরে এলমী (জ্ঞানগত ভ্রমণ) এর মাধ্যমে এমকান (সম্ভাব্যজগত) এর নিচতা থেকে ওজুব (অবশ্যম্ভাবী জগত) এর উচ্চতার দিকে ভ্রমণ করে, তখন জুলমতী এবং নূরানী পর্দাসমূহ দূর হয়ে যায়। হাদিসের ভাষায় ওই পর্দাসমূহকে খালেক ও মাখলুকের মধ্যে প্রতিবন্ধক বলা হয়েছে। জাহের (বান্দা) ও মুজহের (আল্লাহ্) এর মধ্যে স্থাপিত নেসবতের ফলে সেই পর্দাসমূহ দূরীভূত হয়ে যায়, যা সালেকের তাআইয়্যুন এর দর্পনে শামসে হাকীকী (প্রকৃত সূর্য অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার নূরসমূহ) প্রতিবিম্বিত হওয়ার অন্তরায় ছিলো। তখন নূরের প্রবাহ সেই দর্পনকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। এরকম হালকে ফানার নেসবত বলা হয়। এই ফানা লাভের পর সালেকের জন্য অপরিহার্য হয় আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে প্রত্যেক মাকামের উপযোগী তাঁর বিশেষ দান লাভ করা, যার মাধ্যমে সালেক বাশারিয়াতের কারখানা

ও শরীয়তের আহকাম ঠিক রাখতে সক্ষম হয়। একে বলা হয় বাকা'র নেসবত। অতঃপর সালেক যদি সমস্ত জুলমাতী ও নূরানী পর্দা দূর করার পর সিফত ও শুয়ুনাতের তাজাল্লীসমূহ অতিক্রম করে যাতে বাহাত (অবিভাজ্য সত্তা) পর্যন্ত উপনীত হতে পারে এবং সময়টি যদি নবুওয়াতের সময় হয়, তখন তিনি নবী হন এবং ইসমতের (নিষ্পাপত্বের) দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যান। সেখানে মন্দ প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা আর অবশিষ্ট থাকে না। আর নবুওয়াতের জামানা না হলে সালেক এমকান থেকে ওজুব পর্যন্ত যতো দূরত্ব অতিক্রম করেছেন, সেই মোতাবেক আদম (নিস্তি) থেকে উৎপন্ন নিছক মন্দগুলো তাঁর কাছ থেকে দূর হয়ে যায়, তখন আদমের তমসারাজি নূরের প্রাবল্যে সুস্থির হয়ে যায়। আর সালেক হয়ে যান কল্যাণের প্রকাশস্থল। তাঁর দিক থেকে মন্দ প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা তখনো কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাই তিনি তখন হয়ে যান নায়েবে নবী (ওলী)। তিনি তখন মানব জাতির তরবিয়াত ও এসলাহে (প্রতিপালন ও সংশোধনকর্মে) আত্মনিয়োগ করেন। এ জন্যই বলা হয়, নবীগণ মাসুম (নিষ্পাপ) আর ওলীগণ মাহফুজ[৪] (সুরক্ষিত)।

নেসবত প্রকাশের অর্থ এটাই, যা সুফী সম্প্রদায়ের পরিভাষা। ওয়াহ্দাতুশ্ শুহুদ মতাবলম্বী মোজাদ্দেদিয়া তরিকার সুফীগণ সম্পর্কে এটাই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আল্লাহ্ তাঁদেরকে রহম করুন। আমিন।

মকতুব–৪

এলমে হুজুরী ও এলমে হুসুলীর বর্ণনা

স্নেহবরেষু! আপনার প্রশ্ন ছিলো, ফানা হাসিল হওয়ার পর স্থায়ী হুজুরী থাকা অপরিহার্য। কিন্তু দেখা যায় আল্লাহ্তায়ালার তরফ থেকে সালেকের কখনও কখনও গাফলত (উদাসীনতা) উপস্থিত হয়। এর কারণ কী?

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সূত্রপাত করা হলো এভাবে— এলেম দু'প্রকার[৫] এলমে হুজুরী ও এলমে হুসুলী। হুজুরী হচ্ছে ওই এলেম যা আলেমের মধ্যে অপরিহার্যরূপে বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ এই এলেম তার সত্তাসম্পৃক্ত। যেমন এলমে নফস (সত্তাগত এলেম) যা নিজ সত্তা ও তার আনুষঙ্গিকতার সাথে সম্পৃক্ত। আর হুসুলী হচ্ছে ওই এলেম, যা আকল (বুদ্ধি) ও ইন্দ্রীয়ের মাধ্যমে স্মৃতির দর্পনে মালুমের সুরতে (জ্ঞাত আকৃতিতে) আগমন করে। সালেক যখন এলমী সায়েরের মাধ্যমে এমকান (সম্ভাব্যজগত) এর নিচতা থেকে ওজুদ (অবশ্যম্ভাবী জগত) এর উচ্চতায় পৌঁছে, তখন যে এলেম উপলব্ধ হয়, তা হচ্ছে এলমে হুজুরী। তখন আর তা হুসুলী এলেম থাকে না। জনাবে এলাহীর কাছ

থেকে আরেফের প্রাপ্ত এলমে হুজুরী লাভের অবস্থা এরকম— সুফিয়ানে কেরামের নিকট বস্তুসমূহের অস্তিত্ব হচ্ছে ছায়াতুল্য, বাস্তব নয়। অর্থাৎ কাছরত (অনেক বস্তু) যা দেখা যায়, তা সবই ওজুদে হাকীকীর (আল্লাহ্) এর প্রতিবিম্ব। বাস্তবে এক সত্তা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। প্রতিবিম্বের আধিক্য মূলতঃ শান এর আধিক্যের কারণে হয়ে থাকে। প্রতিবিম্ব যতক্ষণ তার মূল থেকে গাফেল থাকবে এবং তার প্রতিবিম্বতা সম্পর্কে সচেতন না হবে, ততক্ষণ সে অহমিকার জগতে নিজেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্বই মনে করবে। সে তখন তার কথাবার্তায় 'আমি' শব্দ দ্বারা ধারণাগত অস্তিত্বের দিকে ইশারা করতে থাকবে। সুফিয়ানে কেরামের পরিভাষা মোতাবেক সে যখন সুলুকের মাধ্যমে খালেক ও মাখলুকের মধ্যে যে দূরত্ব, হাদিস শরীফের বর্ণনায় যাকে নূরানী ও জুলমতী পর্দা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, সে পর্দা যখন দূর হয়ে যাবে, তখন সে তার মূলের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে। সালেক তখন তার নিজেকে ওয়াসেল (মিলন লাভকারী) এর প্রতিবিম্বের অধিক আর কিছুই পাবে না। সে তখন তার নিজ সত্তা ও তার অনুগামী সব কিছুকেই ধারকৃত বস্তু বলে মনে করবে। বুঝতে পারবে ছায়ার বাস্তবতা আলাদা কিছুই নয়। বরং তিনিই আসল, যিনি মরতবায়ে সানিতে (দ্বিতীয় স্তরে) তাআইয়্যুনে যিল্লি (ছায়াগত নির্ধারণ) এর সাথে প্রকাশ করেছেন। তার কাছে আরও সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে 'আমি' শব্দটি যাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় এবং এর দ্বারা যাঁর দিকে ইশারা করা হয়, তিনিই আসল। তার প্রতিবিম্বটি আসল নয়। তখন তাআইয়্যুনে যিল্লী এর সাথে তার যে এলমে হুজুরী ছিলো, তা মূলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। প্রথমতঃ 'আমি' শব্দের ইশারা মূলের দিকে হয়। তারপর সেই 'আমি' শব্দ প্রতিবিম্বের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এ অবস্থাটি যখন স্বতন্ত্রভাবে বিরাজমান থাকে তখন তাকে দায়েমী হুজুরী বলা হয়। ফানা বাস্তবায়িত হওয়ার পর সেই হুজুরী দূরীভূত হয় না। কখনও যদি এ অবস্থার মধ্যে ত্রুটি দেখা দেয়, তখন সে দুর্বলতা বা ত্রুটিটি আসে এলেমের মধ্যে। মূল এলমে হুজুরীর মধ্যে নয়। [৬]

আরেফের মধ্যে যতক্ষণ অনুভূতি বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ সাধারণ মানুষের মতো তার মধ্যে এলমে হুসুলীও বিদ্যমান থাকে। কারণ মানবীয় কার্যাবলী প্রকাশ পাওয়া তার উপর নির্ভর করে। আল্লাহ্তায়ালার দরবারে এই এলেমের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। কেনো না আল্লাহ্তায়ালার দরবারে তার কোনো অধিকার নেই।

এমতো সন্দেহের কারণ এই যে, সালেক এলেম এর ভুলকে এলমে হুজুরীর ত্রুটি মনে করে এলমে হুজুরীর স্থায়ীত্বকে অস্বীকার করে। হজরত ওমর ফারুক রা. একবার বলেছিলেন, 'উসাল্লী ওয়া উজহিজুল জায়শ' (আমি নামাজও পড়ি এবং সৈন্যবাহিনীও প্রস্তুত করি)। এখানে বর্ণিত দু'প্রকার এলেমের দিকে ইশারা

করা হয়েছে। কেনোনা সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করার সম্পর্ক হুসুলী এলেমের সাথে। আর নামাজের মধ্যে হুজুরী থাকার সম্পর্ক এলমে হুজুরীর সাথে। আর একথাও সুস্পষ্ট যে, হজরত ওমরের নামাজ হুজুরীবিহীন ছিলো না। আর জেহাদের প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা আসবাব সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা ছাড়া হতে পারে না।

দু'প্রকারের এলেম যদি একই সময় অর্জিত না হয়, তাহলে এ দু'টি কাজ এক সঙ্গে এক ব্যক্তি দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। এ হিসেবে দ্বিতীয় খলীফা হজরত ওমর ফারুকের উক্তিটি সঠিক হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই বিষয়টি অনুধাবন করুন। ওয়াস্‌সালাম।

মকতুব–৫

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর বক্তব্য সম্পর্কে উদ্ভূত সন্দেহের জবাব

স্নেহাস্পদ! হজরত কাইয়ুমে জামানী ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর মর্যাদা ও কারামত সম্পর্কে বেওকুফদের নিকট যে সমস্ত সন্দেহ পেশ করা হয়, তোমার সে জাতীয় প্রশ্ন আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। জেনে রাখা উচিত যে, এ সমস্ত প্রশ্নের ভিত্তি মূর্খতা অথবা প্রতিহিংসা। অস্বীকার করার প্রথা তো বহুত পুরাতন। এটি নতুন কোনো বিষয় নয়। বাড়াবাড়িকারীরা শায়েখ আকবর র. এবং অন্যান্য আকাবেরগণকে কাফের সাব্যস্ত করণার্থে অনেক পুস্তিকা লিখেছিলো। হজরত মোজাদ্দেদ র. সেগুলো খণ্ডন করার জন্য তাঁর লিখিত অনেক মকতুবে সন্দেহসমূহের জবাব দিয়েছেন[৭]। তাঁর আওলাদগণের মধ্য থেকে হজরত শাহ ইয়াহ্ইয়া র. এ বিষয়ের উপর বিস্তারিত পুস্তিকা লিখেছেন[৮]। হজরত মৌলভী ফারাখ শাহ র. ও 'কাশফুল গেতা আন ওয়াজহিল খাতা' নামক একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। মির্জা মাযহার র. এর এক মুখলিস অনুসারী মাওলানা মোহাম্মদ বেগ তুর্কী এবং মক্কীও একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। তাঁর নাম 'আতিয়াতুল ওয়াহ্হাব আল ফাসিলা বাইনাল খাতা ওয়াস্ সাওয়াব'। এটি প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে লিখিত হয়েছিলো। শায়েখ ইব্রাহীম কুর্দী মদিনীর শাগরিদ মোহাম্মদ বরজঞ্জীর লিখিত পুস্তিকার প্রতিউত্তরে এটি লেখা হয়েছিলো। আরব দেশের চার মাযহাবের আলেমগণ তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন।

অজানা কোনো মারেফতের কথা যখন প্রকাশিত হয়, তখন তা প্রতিহিংসার কারণ হয় অথচ সৌন্দর্যের উৎস রয়েছে এহেন অপ্রচলিত মারেফতের মধ্যেই। প্রথম যুগ থেকে চলে আসা মারেফত যা প্রকাশিত হয়েছিলো হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর মাধ্যমে। প্রত্যক্ষ কল্যাণবাহী কুরুনে ছালাছার পর তা

পর্দাচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিলো। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর পবিত্র মৃত্তিকার বিশেষত্বের কারণে তার পুনঃপ্রকাশ ঘটেছে। কেনোনা এ মৃত্তিকা রসুলেপাক স. এর পবিত্র মৃত্তিকারই অবশিষ্টাংশ। ইনসাফের কথা হচ্ছে, এ সমস্ত কথার প্রবক্তাদের দিকে প্রথমেই দৃষ্টিপাত করা উচিত। তাঁরা যদি কিতাব ও সুন্নাহর অনুসারী হন এবং তাঁদের অধিকাংশ কাজ ও কথা যদি শরীয়তের পাল্লায় ওজনকৃত হয়, তাহলে তাদের মোতাশাবেহ কথাগুলোকে মোহকাম কথার মোতাবেক তাবীল (ব্যাখ্যা) করা যেতে পারে। অন্যথায় তাঁদের আত্মমর্যাদা প্রকাশক কথামালাকে আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দেয়া উচিত এবং তাঁদেরকে নিরুপায় মনে করা সমীচীন। কেনোনা এহেন সুফী সম্প্রদায়ের অনেক ওজর হয়ে থাকে। কখনও কখনও তাঁদের এবাদতসমূহ হালের প্রাবল্যের কারণে তাদের উদ্দেশ্যের সহায়ক হয় না। কখনও কখনও কাশফ লব্ধ জ্ঞানের মধ্যে ধারণা ও কল্পনা মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার কারণে ভুল হয়ে যায়। অবশ্য এরূপ ভুলের ক্ষেত্রে তাঁদেরকে এজতেহাদী খাতা হিসাবে উপেক্ষা করা হয়। আবার কখনও তাঁদের পরিভাষার প্রকাশ তেমন ভালো নিয়মে হয় না। সুতরাং এ সব বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করে তাঁদের বিষয়ে অতিরিক্ত উক্তি বর্জন করাই শ্রেয়। বিশেষ করে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর শৃংখলাবদ্ধ সম্ভ্রান্ত বাণীর বেলায় অতিরিক্ত মন্তব্য করা বাচালতা মাত্র। কেনোনা তাঁর তরিকার ভিত্তি পুরোপুরি সুন্নত অনুসরণের উপর এবং তাঁর রচনাবলীও এরকম নসীহতে ভরপুর। তাঁর সম্পর্কে ফেতনা সৃষ্টির সবচেয়ে বড় কারণ তওহীদে ওজুদীর অস্বীকার এবং তওহীদে শুহুদীর সমর্থন। হজরত শায়েখ মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী র. এর (শায়েখে আকবরের) জামানা থেকেই মোজাদ্দেদ র. এর যুগ পর্যন্ত মানুষের স্মৃতিতে ওয়াহদাতুল ওজুদের মাসআলা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিলো। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. তওহীদে ওজুদীকে যে অস্বীকার করেছিলেন, তা জাহেরী আলেমদের অস্বীকারের মতো ছিলো না। বরং যে মাকাম থেকে সুফিগণ ওয়াহদাতুল ওজুদের কথা বলেন, তিনি সেই মাকামকে বিশ্বাস ও সমর্থন করেন। তবে তিনি মনে করেন আসল মাকাম তারও উর্ধ্বে। তিনি আল্লাহ ও মাখলুকের মধ্যে গাইরিয়াত (অপরত্ব)কে এমনভাবে সাব্যস্ত করেন যে, ওজুদে হাকীকীর এককত্বের মধ্যে কোনোরূপ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। তার ওয়াহদাতুল ওজুদ মতবাদীদের বিপরীতে যাঁরা খালেক ও মাখলুকের মধ্যে আইনিয়াত সাব্যস্ত করেন। ওয়াহদাতুল ওজুদ ও ওয়াহদাতুশ্ শুহুদের মাসআলা অন্য মকতুবের মধ্যে পৃথকভাবে লেখা হয়েছে।

ওয়াস্ সালাম।

মকতুব –৬

কতিপয় সন্দেহের জবাব

হামদ ও সালাতের পর ফকীর জানে জানানের তরফ থেকে মৌলভী সাহেবে মেহেরবান সাল্লামাহুর রহমান [১০] এর কাছে লিখিত আমার এই মকতুব। আপনার লেখা এক দীর্ঘ চিঠি আমার হস্তগত হয়েছে, যার মধ্যে আপনি হজরত কাইয়ুমে জামানী ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এ সম্মানিত মাকাম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছেন।

মান্যবরেষু! এরূপ সন্দেহ হয়ে থাকে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর বক্তব্যসমূহ ভালো করে বোধগম্য না হওয়ার কারণে। হজরতের মকতুবসমূহ যদি তিন খণ্ডই হস্তগত হয়ে থাকে তাহলে তা পাঠ করতে থাকুন। হৃদয়ে প্রশান্তি আসবে। খাতিরজমা (নিবিষ্টতা) সৃষ্টি হবে। হেদায়েতমূলক কিছু কথা আমি এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

জেনে রাখা উচিত যে, হজরত সুফিয়ানে কেরাম ওজুদ শব্দের অর্থ তিনভাবে করে থাকেন। প্রথমঃ ওজুদ মানে কওন (হওয়া) এবং হুসুল (অর্জিত হওয়া)। এটি হচ্ছে আমরে এনতেযায়ী। অর্থাৎ কোনো কিছু থেকে কোনো কিছু বের হয়ে আসা। দ্বিতীয়ঃ ওজুদে মুম্বাসাত, যা প্রথম অর্থ এনতেযা এর অর্থকে পরিবর্তন করে দেয় অর্থাৎ তার অর্থ সাদের আউয়াল। তার মানে কোনো কিছু থেকে বের হওয়া নয়, বরং প্রাথমিকভাবে যা আত্মপ্রকাশ করে। এটি হচ্ছে প্রথম অর্থ এনতেযা এর উৎস। এই দু'প্রকারের ওজুদ যাতে বারী তায়ালার পরে। আর আল্লাহ্পাকের যাত এই দু' ওজুদের প্রতিফলনের উৎস হতে পারে না। তৃতীয়ঃ ওই ওজুদ, যা আওয়ালুল আওয়ায়েল (প্রথম সমূহেরও প্রথম) এবং মাবদাউল মাবাদি (উৎসসমূহের উৎস)। সুফী সম্প্রদায়ের ধারণায় উক্ত ওজুদ হচ্ছে আইনে যাত (স্বয়ং সত্তা)। আর সকল যাত (সত্তা) উক্ত ওজুদ থেকে প্রতিফলনের উৎস হয়ে থাকে। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. বলেছেন, আল্লাহতায়ালার যাত (সত্তা) নিজেই নিজের প্রতিফলনের উৎস। ওজুদ ও যাত যখন প্রকৃতপক্ষে এক হয় তখন প্রতিফলন প্রকাশিত হওয়াকে ওজুদের দিকে নেসবত করা যেতে পারে। আবার যাতের দিকেও নেসবত করা যেতে পারে। উভয়ের অর্থ একই। এ দু' এর দিকে নেসবত হওয়ার মধ্যে কেবল শব্দগত পার্থক্য আছে। এখানে তাসালসুল (আবর্তন) এর কোনো কিছু নেই। কেনোনা তাসালসুল (আবর্তন) তো ওই অবস্থায় বলা যেতে পারে, যখন হক তায়ালা অন্য কোনো ওজুদ থেকে ফায়দা গ্রহণ করেন এবং ওই ওজুদ থেকে প্রতিফলনের উৎস হন, আর সেই ওজুদ এর অবস্থাও যখন এ রকম হয়। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. ওজুদে

কায়েনাত (সৃষ্টজগত) কে আল্লাহতায়ালার উপর এতলাক করা এবং হামলে মোয়াতাত[১০] এর আলোকে একটি দ্বারা অপরটিকে বুঝানো থেকে দূরে রয়েছেন সতর্কতার জন্য। কেনোনা শরীয়তে এ ধরনের শব্দব্যবহারের বিষয়ে কোনো উদ্ধৃতি নেই। আল্লাহ্তায়ালার নাম ও সিফত সবই তওফিকী বিষয়।

আপনার আরও দু'টি বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। হাকীকতে মোহাম্মদী এবং হাকীকতে মোহাম্মদীর উপর হাকীকতে কাবাকে প্রাধান্য দেয়ার বিষয়ে মকতুবাত শরীফের তৃতীয় খণ্ড অধ্যয়ন করলে এ দু'টি বিষয়ের জবাব পাওয়া যাবে। এখানে এ সন্দেহের জবাব প্রদান সুদীর্ঘ হবে[১২]।

হজরত বড় পীর সাহেব র. বলেছেন, 'কাদামী হাজিহি আলা রাক্বাবাতি কুল্লি ওয়ালিইল্লাহি' (আমার পা সকল ওলীর গর্দানের উপর)। তাঁর এ উক্তি সম্পর্কে আপনি যা লিখেছেন তার উত্তরে বলবো, তিনি যদি এ কথা দ্বারা তাঁর সমসাময়িক গুলিগণকে খাস করে বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে আপত্তির কী আছে? আদবের কারণে তিনি পূর্ববর্তীগণকে বাদ দিয়েছেন। এটাই স্বাভাবিক। কেনোনা পূর্ববর্তীগণের মধ্যে কেউ কেউ তো তাঁর মাশায়েখ ছিলেন। আবার কেউ কেউ ছিলেন তাঁর পিতা-পিতামহ। তাঁর এমতো উক্তিকে হাদিসের মর্ম অনুসারে ব্যাখ্যা করতে হবে। লা ইউদরা আউয়ালুহু খাইরুল আম আখিরুহু অর্থাৎ উম্মতের ব্যাপারে এটা বুঝা যায় না যে, দীন প্রচারের ক্ষেত্রে প্রথম দল উত্তম না শেষ দল। তাঁর বক্তব্য দ্বারা শেষ অংশকেই হয়তো বুঝিয়েছেন। আর তিনি উক্ত শেষ অংশের মধ্য থেকে একজন। কাজেই তাঁর উক্তির অর্থ শেষ অংশের মধ্যে তিনি উত্তম। কামালাতে নবুওয়াত ব্যতীত অন্যান্য কামালতসমূহের ধারা তো রুদ্ধ হয়ে যায়নি। আপনার পত্রের আলোকে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে আমি বাধ্য ছিলাম। 'আল মা'মূরু মা'যূরুন আল্লাহুম্মা আরিনাল হাক্কা হাক্কান ওয়া আরিনাল বাত্বিলি বাত্বিলান' (কেউ কোনো কাজে বাধ্য হলে সে হয়ে যায় নিরুপায়। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে হককে হক রূপে এবং বাতিলকে বাতিল রূপে প্রদর্শিত করো)। ওয়াস্ সালাম।

মকতুব–৭

হামদ ও সালাতের পর ফকীর জানে জানানের পক্ষ থেকে প্রেরিত পত্র। আপনার অনুগ্রহলিপি আমার হস্তগত হয়েছে। আপনি জিজ্ঞেস করেছেন, কাইয়্যুমে জামানী ইমামে রব্বানী হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি এবং মাহবুবে সুবহানী শায়েখ আবদুল কাদের জিলানীর মধ্যে অধিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয়েছে কার?

মান্যবরেষু! জেনে রাখুন, শ্রেষ্ঠত্ব দুই প্রকার। আংশিক ও সার্বিক। প্রকাশ্য বিষয় যে, আপনার প্রশ্ন আংশিক শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে নয়। আর সার্বিক বা পূর্ণাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্যের আধিক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর তার সম্পর্ক বাতেন জগতের সাথে। এক্ষেত্রে আকলের কোনোরূপ কার্যকারিতা নেই। তবে মর্যাদার কম বেশী দ্বারা উদ্দেশ্যের দাগ লাগানো যেতে পারে, কিন্তু কোনো লাভ হবে না। সমাধানের সূত্র হলো কিতাব, সুন্নত ও প্রথম যুগের এজমা (ঐকমত্য)। একথাও সুস্পষ্ট যে, এই বুজুর্গের আবির্ভাব হয়েছিলো কিতাব, সুন্নত ও এজমার যুগের পরে। কাজেই শরীয়তের এ তিনটি উসুল এ বিষয়ে নিরবতা প্রদর্শন করেছে। কাশফের মধ্যে ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই তা প্রতিপক্ষের উপর দলিল হতে পারে না। মুরিদগণের কথা নির্ভরযোগ্য নয়। কেনো না মুরিদগণের আপন পীর সম্পর্কে প্রচার একটা সীমা পর্যন্ত মহব্বতের কারণে হয়ে থাকে। এই দুই বুজুর্গের কামালিয়াত সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে পারেন এবং তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে অকাট্য ফয়সালা দিতে পারেন, এমন দায়িত্ব কোনো কাশফধারীকে দেয়া যায় না। কাজেই সব চেয়ে নিরাপদ পন্থা হচ্ছে বিষয়টিকে আল্লাহ্‌তায়ালার এলেমের উপর সমর্পণ করে দেয়া এবং এ ধরনের অতিরিক্ত কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা। এই দুই বুজুর্গকেই মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত থাকতে দেয়া উচিত। এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করা বেআদবী। তাছাড়া বিষয়টি দীন-শরীয়তের এমন কোনো জরুরী বিষয় নয় যে, তা আলোচনা করা অপরিহার্য। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর প্রতি আমাদের সীমাহীন মহব্বত রয়েছে। এর মধ্যে বিরতি দান অনুচিত। আর মহব্বতের বিষয়টি আমলের গণ্ডি অতিক্রম করে ফেলেছে[১৪]।

হারগেজ দরবেশ ও কমনমী বায়েদ যদ
আয হদ বরুঁ কদম নমী বায়েদ যদ
আলমে হামা মের আতে জামাল আযলী আস্ত
মী বায়েদ দীদ ও দম নমী বায়েদ যদ।

অর্থঃ ন্যূনতা ও অতিরিক্ততার প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়। সীমার বাইরে কদম রাখাও নিরাপদ নয়। মহাবিশ্ব জামালে আযলীর দর্পনতুল্য। কেবল পর্যবেক্ষণ করো। বিরতি দিয়ো না।

মকতুব–৮

মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর বাণী থেকে সৃষ্ট দু'টি ধারণার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্পর্কে

মান্যবরেষু! আপনি লিখেছেন, মুমকিনাত (সম্ভাব্য জগত) এর হাকীকত সম্পর্কে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর কাশফ এই ওয়াহেদিয়াত (এককত্ব) এর স্তরে যে সত্তা, তাকে এলমে এলাহীতে কামালাতে এলাহীর বিস্তৃতি বলা হয়। প্রত্যেক সিফতে কামালের (পূর্ণ গুণাবলীর) বিপরীতে উক্ত গুণ না থাকাই ওই গুণকে সাব্যস্ত করে এবং তার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যেমন এলেম সিফতের বিপরীতকে আদমে এলেম বা জাহালাত বলা হয়। এভাবে অন্য সিফতগুলোর উপর কিয়াস করতে হবে।

তমীযকারী আদম (হীনতা) সমূহের দর্পনসমূহ মোকাবেলায় থাকার কারণে ওই সকল সিফতের নূর বা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং এসব সিফত আলমের তাআইয়্যুন (নির্ধারণ) এর উৎস এবং মুমকিনাতের হাকীকত হয়েছে। আদমসমূহ ওই সমস্ত হাকীকতের উৎসস্থল হয়েছে এবং তাতে প্রতিবিম্বগুলো হয়েছে রঙধনুতুল্য। এজন্য মুমকিনাত (সম্ভাব্যজগত বা সৃষ্টিজগত) এর আইন (মূল সত্তা) বহির্জগতে ওই সমস্ত হাকীকতের কেন্দ্রের উপর প্রতিফলনের উৎস হয়েছে। ওগুলো মুমকিনাত ওজুদ (অস্তিত্ববান হওয়া) এবং আদম (অস্তিত্বহীন হওয়া) উভয় অবস্থাকেই কবুল করে। এ জন্যই এ সব মুমকিনাত খায়ের ও শার (ভালো ও মন্দ) উভয়ের উৎস হতে পারে। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাশফ হচ্ছে হজরত আম্বিয়া কেরামের তাআইয়্যুনসমূহের উৎস হচ্ছে সিফতসমূহ। এটাই উল্লেখিত প্রতিবিম্বসমূহের মূল এবং এ সব ওজুদে ওজুবীর হিস্সা রাখেন বা ফয়েজ প্রাপ্ত হন। তাই এই হজরতগণের হাকীকতের মধ্যে আদম (অস্তিত্বহীনতা) প্রবেশ করা উচিত নয়, যদিও তারা মুমকিনাতের অন্তর্ভূত। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর তাহকীক (নিশ্চিতি) অনুসারে নিরেট হাকীকতের মধ্যে আদম (অস্তিত্বহীনতা) থাকতে পারে না। সুতরাং এক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন কী?

মান্যবরেষু! যেহেতু এলমে এলাহীতে পবিত্র সিফতসমূহের ওজুদ এবং পার্থক্যকৃত আদমসমূহের মধ্যে সমান্তরাল সাব্যস্ত হয়েছে, যে কারণে যে রূপ আদমসমূহ সিফতসমূহের দর্পণ হয়েছে সেরূপ সিফতসমূহও আদমসমূহের দর্পন হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এখানে মোআমেলা বিপরীত। এখানে সিফতসমূহের জায়গায় আদমসমূহ রঙধনুতুল্য হয়েছে। ফলে আদমে হাকীকত (অস্তিত্বহীনতার তত্ত্ব) ওজুদে কবীতে পরিণত হয়েছে। এজন্যই আম্বিয়া কেরাম সকলেই মাসুম (নিষ্পাপ)। তাঁদের কাছ থেকে মন্দ কিছু প্রকাশ না পাওয়ার কারণও এটাই। কিন্তু তাঁদের খারেজী ওজুদ (বহির্জগতীয় অস্তিত্ব) বা দেহ আদম

ও ওজুদ উভয়কেই কবুল করে। তাঁদের দেহজগতে এমকানকে (সম্ভাব্যজগতকে) সাব্যস্ত করার জন্য তাঁদের হাকীকতে আদমের এতটুকু দখলই যথেষ্ট। ওয়াস্ সালাম।

মকতুব–৯

'সুফী যখন নিজকে ফিরিঙ্গি কাফেরের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে না করবে তখন সে ফিরিঙ্গি কাফেরের চেয়ে নিকৃষ্ট হবে' এ কথার তাৎপর্য সম্পর্কে।

আপনি প্রশ্ন করেছেন, কোনো এক বুজুর্গ বলেছেন,[১৬] সুফী যতক্ষণ নিজেকে ফিরিঙ্গি কাফেরের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে না করবে, ততক্ষণ সে ফিরিঙ্গি কাফেরের চেয়ে নিকৃষ্ট' এ কথা কীভাবে সঠিক হয়? সুফী একজন মুমিন ব্যক্তি। কখনও তিনি আলেম ও মুত্তাকীও হয়ে থাকেন। সহু ও চেতনার অবস্থায় স্বীয় গুণাবলীও তার আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে এলেমও রাখেন। একই শ্রেণীর বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে মর্যাদার তারতম্য এ সব গুণাবলী ও অনুষঙ্গের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। তার সত্তা ও হাকীকতের ভিত্তিতে নয়। ফিরিঙ্গি কাফের কুফুরী ও নাফরমানীতে নিমজ্জিত আর একজন সুফী ইমান ও ইমানী গুণাবলীতে সুশোভিত— এ কথা জানা সত্ত্বেও সুফী নিজেকে কাফেরের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করবেন কেমন করে? তাকাল্লুফী (জোর) করে যদি তিনি এ রকম মনে করেন, তাহলে মর্যাদাপূর্ণ গুণাবলীর মোকাবেলায় নিকৃষ্টতাকে বড় মনে করা হবে। শরীয়ত ও জ্ঞানগত দৃষ্টিতে এরকম চিন্তার অপকৃষ্টতা সুস্পষ্ট।

মান্যবরেষু! আমাদের মোজাদ্দেদিয়া তরিকার হজরতগণের মত হচ্ছে, মুমকিনাত (সম্ভাব্য জগত) এর হাকীকত সম্বন্ধকৃত আদম (নিস্তি) ও প্রকৃত গুণাবলীর প্রতিবিম্বের সমন্বয়ে গঠিত। অর্থাৎ আদম (নিস্তি)সমূহ এলমে এলাহীতে ইসিম ও সিফতসমূহের সমান্তরালে থাকার কারণে এলমে এলাহীতে তাদের অস্তিত্ব সৃষ্টি করেছে এবং তা ইসিম ও সিফতসমূহের দর্পনে রূপান্তরিত হয়ে আলমের তাআইয়্যুন (নির্ধারণ)সমূহের উৎস হয়ে গিয়েছে। তারপর তা হয়েছে খারেজে যিল্লী (ছায়াগত বহির্জগত) (আল্লাহ্ ছাড়া যা কিছু আছে তাকে খারেজ বলা হয়)। আর খারেজের (বহির্জগতের) হাকীকত হচেছ ছায়া। সেখানে আল্লাহ্র কুদরতে ওজুদে যিল্লীতে (ছায়াগত অস্তিত্বে) বিদ্যমানতা পেয়েছে। খারেজ এ ধরনের সংমিশ্রণের কারণে ভালো ও মন্দের প্রতিক্রিয়ার উৎস হয়েছে। সে তার সত্তাগত আদমের (নিস্তির) কারণে মন্দসমূহ অর্জন করে। আর ছায়াগত ওজুদের কারণে অর্জন করে কল্যাণ। একথা সুস্পষ্ট যে, আলমের মধ্যে যখন কোনো ব্যক্তি সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত কোনো দর্পন দেখে, তখন সে প্রথমেই সূর্যের কিরণ দেখতে পায়– দর্পন দেখতে পায় না। কেনোনা দর্পনতো এখানে সূর্যকিরণ দ্বারা

আচ্ছাদিত। আর আয়নার সত্তাটির উপর দৃষ্টিপাত করলে আয়না নামক নির্ধারিত বস্তুটিই দেখতে পাওয়া যাবে। কিরণ আর দৃষ্টিগোচর হবে না। কারণ তার দৃষ্টি তখন জাহেরের উপর থাকবে না। সুফী যখন কোনো কিছুর উপর দৃষ্টিপাত করেন তা ভালো হোক অথবা মন্দ, তার নজরটি জাহেরের উপর পতিত হয়। বুঝতে পারে জাহেরটি ওজুদের (অস্তিত্বের) প্রকাশস্থল এবং সেটি ভালো মন্দের উৎস। তাতে ওজুদের বিকাশ থাকে বলে তা থেকে মঙ্গল পরিলক্ষিত হয়। আর সুফী যখন তার স্বীয় সত্তার দিকে নজর করেন, তখন তার নজর নিজের সত্তাগত আদম (নিস্তি) এর উপর পতিত হয়— যা মন্দের উৎস মূল। তখন তিনি নিজেকে কল্যাণ ও পূর্ণতা থেকে মুক্ত দেখতে পান। কল্যাণ ও পূর্ণতা স্বীয় সত্তার মধ্যে যা দেখতে পান, তা অপর থেকে ধারকৃত বলে জানেন। নিজের বলে মনে করেন না। সে কারণেই সুফী বাধ্য হয়ে নিজেকে ফিরিঙ্গি কাফের এবং অন্যান্য খারাপ বস্তু থেকে নিম্নস্তরের মনে করেন।

এখানে এ বিষয়টি বুঝা গেলো যে, উল্লেখিত কথাটি যিনি বলেছেন, তাঁর বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, একজন কামেল সুফী কখনও ভালো ও পূর্ণতর নেসবত নিজের বলে মনে করেন না। বরং তা ধারকৃত বস্তু বলে মনে করেন। পূর্ণ ফানা এবং বিশুদ্ধ দর্শন হাসিল হওয়ার তাৎপর্য এটাই। সুফীর দৃষ্টি যদি নিজের ওজুদের দিকে এবং ধারকৃত নূরের প্রতি পতিত হয়, আর তার মরতবা বা স্তরসমূহের দিক যদি আদম (নিস্তি) দ্বারা আবৃত থাকে, তাহলেই তিনি নিজের বেলায় আনাশ্ শামস (আমিই সূর্য) দাবী করতে পারেন। হুসাইন ইবনে মনসুর র. এর আনাল হক বলার রহস্য এটাই। তিনি এরূপ দর্শনের ক্ষেত্রে মাযুর (নিরুপায়) ছিলেন। দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর ভুল হয়েছিলো। মত্ততার প্রাবল্যের কারণে তিনি আদম ও ওজুদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেননি। এ পথের অনেক সালেকেরই এ রকম ভুল হয়ে থাকে। তবে ওই ব্যক্তি এহেন ভুল থেকে রক্ষা পেতে পারেন, যাকে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর হাবীব স. এর বরকতে সুরক্ষিত রাখেন।

মকতুব—১০

একজন ওলী কঠিন রোগাক্রান্ত হয়েও রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা না করে ধৈর্য ধারণ করলেন। অথচ নবী আইয়ুব আ. রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। এতে করে ওলীর সবর একজন পয়গম্বরের সবরের উপর মর্যাদা পায়। এ বিষয়টির জটিলতা নিরসন প্রসঙ্গে।

আপনি লিখেছেন, কোনো এক বুজুর্গ হজরত আইয়ুব আ. এর মতো কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। অপর এক বুজুর্গ তাঁর সেবা করার সময় তাঁকে প্রশ্ন করেন,

আপনার অবস্থা কেমন? উত্তরে তিনি বলেন, অবস্থা তো প্রকাশ্য। তবে আমি এখনও 'রব্বাহু আন্নি মাস্‌সানি ইয়াদ দুরবু' [১৭] (হে আমার রব! আমাকে দুরাবস্থায় পেয়েছে) বলিনি। অর্থাৎ আমি হজরত আইয়ুবের মতো বিচলিত হইনি এবং তাঁর মতো করে আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করিনি। এমতাবস্থায় ওই বুজুর্গের সবরের মাকাম হজরত আইয়ুব আ. এর সবরের মাকামের চেয়ে উচ্চ মনে হয়। সবরের মাকাম তো অতি উচ্চ মাকাম। এতে করে কি হজরত আইয়ুব আ. এর উপর ওই ওলীর অধিক মর্যাদা প্রমাণিত হয় না? কিন্তু এটাতো এজমার (ঐমত্যের) পরিপন্থী। এর সমাধান তা হলে কী?

মান্যবরেষু ! বাহ্যতঃ এখানে সন্দেহ সৃষ্টি হয় বটে, তবে বিষয়টি নিয়ে যদি গভীরভাবে চিন্তা করা হয়, তবে সন্দেহের অবকাশ আর থাকে না। হজরত আইয়ুব আ. বলেছিলেন, ''রব্বাহু আন্নি মাস্‌সানি ইয়াদ দুরবু ওয়া আংতা আরহামুর রহিমীন' (প্রভু আমি দুঃখ কষ্টে পড়েছি, আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু)। তাছাড়া এও বলেছিলেন, 'আন্নি মাস্‌সানি ইয়াশ্ শায়ত্বনু বিনুসুবিওঁ ওয়া আ'যাবিন' [১৮] (শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে)। বাহ্যিকভাবে এই আয়াতত্রয়ের বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর অস্থিরতা ও বেসবরী প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত। তিনি তাঁর সম্পর্কে বলেন— 'আনা ওয়াজাদনাহু স্ববিরান নি'মাল আ'বদু আন্নাহজু আওয়াব' (নিশ্চয়ই আমি তাকে ধৈর্যশীলরূপে পেয়েছি। সে আমার কতোই না ভালো বান্দা। সে আমার দিকে খুবই ধাবিত)। এতে করে বুঝা যায় তাঁর এহেন বেসবরী সবরের এক সূক্ষ্ম প্রকাশ। তা না হলে আল্লাহ্‌তায়ালা এই বেসবরীকে সবর বলে স্বীকৃতি দিতেন না। বিষয়টির রহস্য এই যে, হজরত আইয়ুব আ. এর নফস দীর্ঘদিন ব্যাপী বিভিন্ন মুসিবতে আক্রান্ত হয়েছিলো। যেমন মাল ও সন্তান-সন্ততি ধ্বংস, নিজের কঠিন রোগযন্ত্রণা, দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হওয়া, তাঁর প্রতি ও তাঁর সাথী-সঙ্গীগণের প্রতি সাধারণ লোকদের ঘৃণা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য। এ সব কিছুতেই তিনি ধৈর্যশীল ছিলেন। যখন আল্লাহ্‌র রহমতের সময় নিকটবর্তী হলো তখন তিনি অনুভব করলেন, এ সব বিপদ মুসিবত দূরিভূত হওয়া আহাজারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এমন অবস্থায় বেসবরী বা অধৈর্য প্রকাশ করা আদবেরই নামান্তর। তিনি তখন সবরের মাকাম থেকে উন্নতি করে রেজার মাকামে পৌঁছে গিয়েছিলেন, যা নৈকট্যের মাকামসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ মাকাম। তিনি তখন সেই মাকামে অবস্থান করছিলেন। তাই বেসবরীর লজ্জার উপর সবর করেছিলেন এবং আহাজারী প্রকাশ করেছিলেন। এরূপ আদবের পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে 'নে মাল আবদু' এবং 'ইন্নাহু আওয়াব' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। 'আওয়াব' 'আওবুন' ধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ ধাবিত হওয়া, রুজু হওয়া। কেনোনা তিনি এতো বছরের

সবরের কারণে নফসের খাহেশের (প্রবৃত্তির কামনার) প্রতি ধাবিত হননি। বরং আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টির প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন। তাই এমতো বেসবরী তখন আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট অনুমোদিত ছিলো। আল্লাহতায়ালা তাঁর সবরের প্রতিদান দিয়েছেন এবং বাহ্যিক বেসবরীকে বাতেনের হালের প্রতি লক্ষ্য করে সবর হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর সম্পর্কে বলেন 'আনা ওয়াজাদনাহু স্ববিরান নি'মাল আ'বদু আন্নাহজু আওয়াব' (নিশ্চয়ই আমি তাকে ধৈর্যশীলরূপে পেয়েছি। সে আমার কতোই না ভালো বান্দা। সে আমার দিকে খুবই ধাবিত)

শায়েখ আকবর ইবনে আরাবী র. হজরত আইয়ুব আ. এর ঘটনা প্রসঙ্গে বলেছেন, অপরের কাছে অভিযোগ করা থেকে স্বীয় নফসকে বিরত রাখার নাম সবর। হজরত আইয়ুব অন্য কারো কাছে অভিযোগ করেননি। তিনি নিজের হাল আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে উপস্থাপন করেছিলেন, যা সবরের পরিপন্থী নয়। উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব এখনও সম্পন্ন হয়নি। উক্ত ওলী যখন আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে আহাজারী প্রকাশ করেননি তখন নবীর উপর ওলীর মর্যাদাই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ওলীকে নবীর উপর প্রাধান্য দেয়া যাবে না। ওই বেচারা ওলী তো কামালাতে নবুওয়াতের স্বাদ গ্রহণ করেননি। তাঁর কাছে উবুদিয়াতের হাকীকত এবং রেজার মাকামের পূর্ণতার কোনো অবগতি নেই। তিনি যা বলেছেন, তা মত্ততার প্রাবল্যের কারণে বলেছেন। কাজেই তিনি মাযুর। ওয়াস্‌ সালাম।

মকতুব–১১

জিকিরে জেহের ও জিকিরে খফীর বর্ণনা

হামদ ও সালাতের পর প্রকাশ থাকে যে, কোনো কোনো হানাফী মতাবলম্বী ফেকাহবিদ জিকিরে জেহের (সশব্দে জিকির) কে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছেন এবং তাঁরা তা নাজায়েয বলে ফতোয়া প্রদান করেছেন। আবার অপর পক্ষে কিছু কিছু মোহাদ্দেছীনে কেরাম সাব্যস্ত করেছেন যে, জিকিরে জেহেরের শরয়ী অবস্থান আছে। তাঁরা জিকিরে জেহেরকে জিকিরে খফীর (গোপন জিকিরের) উপর মর্যাদা দিয়েছেন। মূলতঃ উভয় পক্ষই তাঁদের বক্তব্যে ভারসাম্যতা হারিয়েছেন। তাঁরা ইনসাফের আলোকে কথা বলেননি। বিষয়টি সমাধানের দাবী রাখে।

জেনে রাখা উচিত, জিকির শব্দের অর্থ স্মরণ করা। এই স্মরণ তিন প্রকার— ১. মুখের জিকির। এই জিকিরে কলবের সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন নেই— কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের জিকির বা স্মরণ গাফলতেরই একটি প্রকার। মূলতঃ এটি জিকির নয়। ২. কলবের জিকির। এই জিকিরে জিহবা নড়া চড়া করবে না।

সুফীগণের পরিভাষায় একে খফী জিকির বলা হয়। সুফীগণের মোরাকাবা করার ভিত্তি হচ্ছে এই জিকির। সকল সিলসিলায় এর প্রচলন আছে। কলবী বা খফী জিকিরের দু'টি দিক আছে। কখনও এই জিকিরের উদ্দেশ্য হয় জাতে বাহাত (অবিভাজ্য সত্তা) এর হুজুর, যা সিফতের দর্শনমুক্ত হয়ে থাকে। আবার কখনও এতে সিফতের দর্শন হতে পারে। এ দু'টি দিকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই আয়াতের মধ্যে [২০] 'ওয়াজ্‌কুর রব্বাকা ফী নাফসিকা তাদ্বার্‌রুআ'ওঁ ওয়া খীফা ওয়া দূনাল জাহরি মিনাল ক্বওলি বিল গুদ্বুউইয়্যি ওয়াল আসাল' (তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশংকচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে)। দ্বিতীয় প্রকার জিকিরে জিকিরকৃত সত্তার হুজুরী (উপস্থিতি) চায়। তার নেয়ামত ও দান সমূহের সম্বন্ধ যার মধ্যে রয়েছে, তা দর্শন না করে প্রতিক্রিয়া প্রাপ্তদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার অবস্থান আছে মনে করে জিকির করতে হবে। শরীয়তের ভাষায় একে ফিকির (চিন্তা-গবেষণা করা) বলে। ফিকিররূপী জিকির একীন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। কোরআন ও হাদিসে এর উপকারিতার বিষয়ে বহু আলোচনা রয়েছে।[২১] মুখের জিকির যা কলবের সাথে করা হয়, জিকিরের প্রকারসমূহের মধ্যে এটি সবচেয়ে পরিপূর্ণ। তাও আবার দুই প্রকার। প্রথমতঃ জিকিরকারী জিকিরের শব্দ কেবল নিজে শুনতে পাবে, অন্যকে শোনাবে না। শরীয়তের ভাষায় একে বলা হয় খফী (গোপন) জিকির। এর প্রমাণ রয়েছে এই আয়াতে এভাবে 'উদঊ রব্বাকুম তাদ্বাররুআঁও ওয়া খুফইয়াহ, ইন্নাহু লা ইউহিব্বুল মু'তাদীন' (তোমরা বিনিতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো; তিনি জালিমদিগ্‌কে পসন্দ করেন না)।

দ্বিতীয়তঃ এ ক্ষেত্রে জিকিরকারীর জিকিরের শব্দ অন্যেও শুনতে পাবে। শরীয়তে একে জিকিরে জেহের (সশব্দে জিকির) বলে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো কোনো কল্যাণের কারণে জিকিরে জেহেরকে জিকিরে খফীর উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। তবে সাধারণতঃ জিকিরে খফী জিকিরে জেহেরের চেয়ে উত্তম নয়। যেমন জেহরী নামাজে সশব্দে ক্বেরাত পড়তে হয়। এর উদ্দেশ্য ঘুমন্ত লোকদেরকে জাগ্রত করা এবং তাদেরকে গাফলত থেকে সাবধান করা।

জিকিরে খফীর হেকমত হচ্ছে— এতে নফস সামা ও রিয়ার (সুনাম ছড়ানো ও লোক দেখানো) প্রবণতার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া, যা আমল কবুল হওয়ার পথে প্রধান অন্তরায়। জিকিরে খফি জিকিরে জেহের থেকে উত্তম— একথা কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। এই হাদিসের মাধ্যমে তো জিকিরে জেহের নিষেধই করা হয়েছে, বলা হয়েছে 'ইন্নাকুম লা তাদঊনা আসাম্মা ওয়ালা গায়েবা' [২২] (নিশ্চয়ই তোমরা কোনো বধির ও অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না)। বিশেষ অবস্থার সাথে জিকিরে জেহের এবং প্রচলিত পদ্ধতির মাধ্যমে [২৩] মোরাকাবা করার নিয়মের

প্রচলন শেষ জামানায় শুরু হয়েছে। এ সব কিতাব ও সুন্নাহ থেকে সরাসরি আসেনি। বরং তরিকার মাশায়েখগণ এলহাম ইত্যাদির মাধ্যমে এগুলো পেয়েছেন। শরীয়ত এ বিষয়ে নিশ্চুপ। এসব নিয়ম মোবাহের গণ্ডিতে পড়ে। আর এগুলো থেকে অবশ্যই ফায়দা পাওয়া যায়[২৪]। এগুলোকে অস্বীকার করা জরুরী নয়। তবে একথা স্পষ্ট যে, কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা যা সাব্যস্ত তা ওই সকল নিয়ম অপেক্ষা উত্তম, যা কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত নয়, যদিও তা কোনো দিক দিয়ে মোবাহ ও উপকারী হয়।

শাদ্দাদ ইবনে আউস র. এর বর্ণনা থেকে সাব্যস্ত হয়, রসুলে পাক স. হজরত আলী রা.কে সশব্দে কলেমা তাইয়্যেবার জিকিরের তালীম দিয়েছিলেন। ওই জিকিরে জেহের ছিলো মধ্যম ধরনের জেহের। ওই হাদিসের প্রথমাংশে বলা হয়েছে, রসুলেপাক স. তাঁকে দরজা বন্ধ করে জিকির করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা পূর্ণ খফী জিকিরের দিকেই ইশারা করে[২৫]। জিকিরে জেহের জায়েয কি নাজায়েয এ সম্পর্কে এখানে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়নি। বরং কোনটির মর্যাদা বেশী, সে কথাই এখানে আলোচ্য বিষয়। জিকিরে জেহেরকে জিকিরে খফীর উপর প্রাধান্য দেয়া নসকে অস্বীকার করার নামান্তর। আবার সকল প্রকার জিকিরে জেহের অস্বীকার করাও তদ্রূপ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জিকিরে জেহেরের শরীয়তসম্মত গুরুত্ব আছে। জিকিরে খফীর মধ্যে প্রচলিত মোরাকাবা সুন্নত বলে সাব্যস্ত। শেষ জামানার লোকদের মধ্যে যে জিকিরে জেহের প্রচলিত আছে, তার ফজিলত তো দূরের কথা, এরকম করা আসলে ফজুল কাজ[২৬]। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যে ঝগড়া হয় তা কোনো ভাবেই গ্রহণযোগ্য এবং দৃষ্টিপাতযোগ্য নয়। এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা খুবই মন্দ কাজ। ভারসাম্য রক্ষা করাই ভালো। খাইরুল কালামে কাল্লা মা দাল্লা (সংক্ষিপ্ত কথা যা দলিল সম্পন্ন, তাই উত্তম)। তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যে হেদায়েত অনুসরণ করে এবং মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর অনুগত হয়।

মকতুব—১২

সেমা সম্পর্কে

মান্যবরেষু ! সেমা (সঙ্গীত) এর বিষয়ে ফেকাহ্ শাস্ত্রের ইমামগণ ও সুফিয়ানে কেরামের মধ্যে প্রচুর মতভেদ আছে[২৭]। প্রথম দল ফাসাদের দ্বার বন্ধ করার লক্ষ্যে বলে থাকেন, সেমা অকাট্যভাবে হারাম। দ্বিতীয় দল আত্মিক প্রেরণার প্রাবল্যের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণভাবে সেমা বৈধ বলে মন্তব্য করেন।

তবে ইনসাফের কথা হচ্ছে সেমা দু' প্রকার। এক প্রকার হচ্ছে কোনো ব্যক্তি ফেতনার কারণ সৃষ্টি না করে ছন্দোবদ্ধ বাক্য ছন্দময় আওয়াজে শরীয়তে নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুপ্রবেশ না ঘটিয়ে যদি সেমা গায় এবং তাতে শ্রোতৃমণ্ডলির বাতেন জগতে কোনো ফাসাদ সৃষ্টি না হয়; বরং তদস্থলে মনের মধ্যে খুশি বা চিন্তার উদ্রেক করে, তবে এ প্রকারের সেমা অবশ্যই বৈধ হবে। কেনোনা এ ধরনের সেমা তৈরী হয় ছন্দোবদ্ধ বাণী ও ছন্দময় আওয়াজ— এ দু'টি বৈধ বিষয়ের সমন্বয়ে। সুতরাং তাতে অবৈধতা কেমন করে আসবে? তাছাড়া প্রথম যুগে শরীয়তসম্মত অনুষ্ঠানাদি যেমন বিয়ে শাদী ও সন্তানের জন্ম উপলক্ষে আকাবেরগণ এরকম আমল করতেন। উম্মতের পরহেজগার উলামা কেরামও কখনও কখনও এরকম করতেন। যেমন হাদিস গ্রন্থসমূহে ওগুলোর বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে উক্ত বুজুর্গগণ এ আমল কদাচিত করেছেন। আমলগুলোকে তাঁরা অপরিহার্য মনে করেননি।

দ্বিতীয় প্রকার সেমা শেষ যুগের গায়কগণ যার প্রচলন করেছে এবং তাকে উৎকর্ষের চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছে দিয়েছে, অন্তর্ভুক্ত করেছে শরীয়তগর্হিত বিষয়— এ প্রকার সেমার মধ্যে যে পরিমাণ শরীয়তনিন্দিত বিষয় শামিল হবে, সে পরিমাণ হারাম হবে। আর হারাম বিষয়কে হালাল মনে করলে সর্বসম্মতিক্রমে তা হবে কুফুরী। কামেল ব্যক্তিবর্গের একটি জামাত বৈধ সেমার প্রতিও আগ্রহ বোধ করেন না। এটি তাঁদের রুচিগত বিষয়— শরীয়তের কোনো বিধান নয়। যেমন শরাব পানকারী কোনো মিষ্টি জিনিস পছন্দ করে না এবং আফিমখোর কোনো লবণাক্ত জিনিস পছন্দ করে না। অথচ এ দু'টির কোনোটিই তাদের জন্য হারাম নয়। যেমন চিশতিয়া সিলসিলার হজরতগণের নেসবতের নেশা শরাবের নেশার মতো।[২৯] তাঁরা নীরবতার স্থলে শোরগোল ও সঙ্গীতের মাধ্যমে স্বাদ উপভোগ করে থাকেন। আর নকশ্‌বন্দিয়া তরিকার বুজুর্গগণের নেশা আফিমের নেশার মতো। তাঁরা শোরগোল ও হাঙ্গামার স্থলে নীরবতা অবলম্বন করেন। সুতরাং বৈধ সেমা সম্পর্কিত মতভেদ হয়েছে যার যার রুচিগত পার্থক্যের কারণে। এটি দীন-শরীয়তের বিষয় নয়। সকল তরিকার আকাবেরগণ দীন ও মিল্লাতের অনুসারী। তাঁরা কেউ লোভ ও প্রবৃত্তির অনুসরণকারী নন। তাছাড়া তাঁরা অবৈধ আমল পরিহার করার ব্যাপারে সকলেই একতাবদ্ধ। অবশ্য উভয় পক্ষের দলভূত মূর্খদের বিষয় ধর্তব্য নয়। অতিরঞ্জিত ও বাড়াবাড়ি করা নিষিদ্ধ।

এই মাসআলাটি বিস্তারিত জানার জন্য হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী[৩০] ও শায়েখ সোহরাওয়ার্দী[৩১] প্রমুখ মুহাক্কিকগণের কিতাবসমূহ পাঠ করা উচিত।

আল্লাহ্‌র শোকর যে, এ বান্দা (মির্জা মাযহার) অবৈধ সেমা থেকে তওবা এবং বৈধ সেমাকে বর্জন করতে পেরেছে। সেমার বৈধতা বা অবৈধতার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এ বান্দা কিতাব ও সুন্নতের অনুসরণকারী। এ বিষয়ে আত্মিক স্বাদ এবং প্রাপ্তির বিষয়ে কিতাব ও সুন্নতের অধিক কিছু করার প্রয়োজন নেই। সেমা বিষয়ক কিতাবসমূহে এমন কিছু বর্ণনা ও বিশুদ্ধ হাল পাওয়া যায় যে, অনেক উচ্চ মাকামের বুজুর্গগণও বৈধ সেমার মধ্যে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে গেছেন। সুতরাং যে সকল আলেম সুফিয়ানে কেরামের আস্বাদপ্রবণতা সম্পর্কে অবগত, যাঁদের সুস্থ ও নিরাপদ বিবেকবোধ এবং রুচিবোধ আছে, তাঁরা এ লেখার মূল্যায়ন করতে পারবেন[৩২] খাইরুল কালামে কাল্লামা দাল্লা। উত্তম কথা যা সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণ্য। ওয়াস্ সালাম।

মকতুব—১৩

জবর ও এখতিয়ারের মাসআলা

মান্যবরেষু! জবর ও এখতিয়ার অর্থাৎ মানুষ তার কাজ করতে মজবুর (বাধ্য) নাকি তার কর্মের স্বাধীনতা আছে— এ বিষয়টি নিয়ে আলেমগণ বহু কিছু বলেছেন। কিন্তু আমার অন্তর এখনও শান্তি পায়নি। কেনোনা ধর্মীয় এমন কিছু বিষয়াদি আছে, যা বুঝবার জন্য কেবল আকল যথেষ্ট নয়। যদি তাই হতো তাহলে বান্দাদের সংশোধনের জন্য ওহী প্রেরণ করার প্রয়োজন পড়তো না।

জেনে রাখা উচিত, মানুষের স্বতন্ত্র কর্মস্বাধীনতা এবং নিছক মজবুর হওয়ার দাবী কিতাব ও সুন্নতকে অস্বীকার করাকে অবধারিত করে। বান্দার সত্তার মতো তার আমলও কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ্‌তায়ালার মাখলুক (সৃষ্ট)। সুতরাং পরিপূর্ণ কর্মস্বাধীনতা কোথায়? আর বান্দা যদি মজবুর হয়, তবে তাকে তার কাজের জন্য ধরপাকড় করা নিছক জুলুম। আকল ও শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্‌তায়ালা থেকে জুলুম প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং বান্দা মজবুরই বা হবে কেনো? এটা প্রকাশ্য কথা যে, আমাদের কার্যাবলী বস্তুর হারাকাত (গতিবিধি) এর মতো করে প্রকম্পিত হয় না। বরং কাজগুলো এলেম ও এরাদা (জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির) মাধ্যমে চলে। সুতরাং বান্দার ইচ্ছা এবং শক্তি প্রয়োগ করাকেই বান্দার এখতিয়ার বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এ তিনটি জিনিস প্রকাশ পাওয়া আমাদের এখতিয়ারভুক্ত নয়। আল্লাহতায়ালা যখনই চান তা বান্দাদেরকে দান করেন। আর এটিই হচ্ছে জবর এবং বাধ্যতামূলক কাজের মর্মার্থ। পূর্ণ স্বাধীনতা

এবং নিছক বাধ্যবাধকতা এক সাথে বাস্তবায়ন অসম্ভব। তাই বিষয়টি হবে মধ্যবর্তী পর্যায়ের— যেমন ইমাম জয়নুল আবেদীন র. ইমাম হাসান বসরী র. এর প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন— 'লা জাবরা ওয়ালা তাফবীযা ওয়ালা কিন আমরুন বাইনাল আমরাইনি' (মানুষ মজবুরে মহয (নিছক বাধ্য)ও নয় আবার তাকে পূর্ণ স্বাধীনতাও দেয়া হয়নি। বরং বিষয়টি এই দু' এর মধ্যবর্তী অবস্থানে অবস্থিত)। শরীয়ত এ মধ্যবর্তী অবস্থাকে বলেছে কছব (অর্জন)। বান্দার কাজ ছাড়া আর অন্য কোনো ক্ষেত্রে এ শব্দ ব্যবহার করা হয় না। সুতরাং বুঝা গেলো, আমাদের কাজ জবর ও এখতিয়ারের সমন্বয়ে হয়ে থাকে। বান্দার দুর্বল এখতিয়ার (কর্মের স্বাধীনতা) এর উপর তকলীফ সীমাবদ্ধ। বান্দার উক্ত দুর্বল এখতিয়ারের কারণে রহমতকে গজবের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়। অথচ আল্লাহ্তায়ালার সিফতসমূহ কোনোটিই একে অপরের উপর প্রাধান্য লাভ করে না। আল্লাহ্তায়ালার যাবতীয় কার্যাবলী সব সময় এলেম, এরাদা ও কুদরতের (জ্ঞান, অভিপ্রায় ও ক্ষমতার) কারণে হয়। বান্দার কার্যাবলীতে আল্লাহ্তায়ালার উক্ত তিন সিফত অগ্রগামী হওয়ার কারণে আফআলে খোদাওয়ান্দির সাথে এক ধরনের সাদৃশ্য থাকে। বাধ্য হয়ে নড়াচড়া যা নিছক মজবুরী, তার সাথে বান্দার কোনো সম্পর্ক নেই। মোহাসাবা (আত্মিক পর্যালোচনা)কে ওই সকল ফেলের (কাজের) দিকে ধাবিত করলে তা ইনসাফের পরিপন্থী হবে না। [৩৩]

সুফীগণের তরিকা মোতাবেক এখতিয়ার (বান্দার কর্মের স্বাধীনতা)কে এ ভাবে সাব্যস্ত করা যেতে পারে যে, কায়েনাত (সৃষ্টিজগত) এর যাররা (অণু পরমাণু) এর প্রত্যেকটির মধ্যে কুল (সমগ্র) এর বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে। আল্লাহ্তায়ালার ওজুদ হচ্ছে বাস্তব অবিভাজ্য। এতে কোনো বিভাজন হতে পারে না। এজন্যই বলা হয় 'কুল্লু ফীহি কুল্লু শায়ইন' (সব বস্তুর মধ্যেই সব কিছু আছে)।

এখতিয়ার (কর্মের স্বাধীনতা) আল্লাহ্তায়ালার অন্যতম শান ও সিফত। আর সৃষ্টিজগতের প্রত্যেক প্রকাশস্থলে বিশেষ করে মানুষের মধ্যে খেলাফতের দায়িত্বের অনুকূল এখতিয়ারের কিছু হিস্সা অবশ্যই বাস্তবায়িত আছে, যদিও তা দুর্বল। উক্ত এখতিয়ারের ভিত্তিতেই বান্দাকে তকলীফ (দায়ভার) গ্রহণ করতে হয়। অর্থাৎ তাকে আসতে হয় আদেশ ও নিষেধের আওতায়। যে হেদায়েতের উপর চলে তার উপর শান্তি বার্ষিত হোক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সৃষ্টিকুল শিরোমনির উপর। আমিন।

মকতুব—১৪

ভারতের হিন্দু ধর্মের বিষয়ে

আপনি প্রশ্ন করেছেন, ভারতের হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা আরবের মুশরিকদের মতো মূলহীন ধর্মের অনুসারী, নাকি তাদের ধর্মের কোনো মৌলিকতা ছিলো, যা পরবর্তীতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। এ ধর্মের অনুসারীদের সম্পর্কে কীরূপ ধারণা রাখা উচিত।

যথার্থতা ও ন্যায়নিষ্ঠার সাথে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে লেখা হচ্ছে[৩৪]। জেনে রাখা উচিত যে, হিন্দু ধর্মের প্রাচীন গ্রন্থাবলী থেকে যা জানা যায়[৩৫] তা হচ্ছে— মানব জাতি সৃষ্টির প্রথম লগ্নে রহমতে এলাহি মানুষের দুনিয়া ও পরবর্তী জগতের সংশোধনের জন্য বেদ নামক একটি কিতাব বারহামা নামক এক ফেরেশতার মাধ্যমে প্রেরণ করে, যা দুনিয়ার সবকিছু সৃষ্টির ওসিলা। এ কিতাবটি চার দফতরে সন্নিবেশিত ছিলো। তার মূলে ছিলো আদেশ নিষেধের বিধান এবং অতীত ও ভবিষ্যতের সংবাদ। এজতেহাদকারীগণ ওই কিতাব থেকে দু'টি মাযহাব বের করেছিলেন। গ্রন্থখানি ছিলো আকায়েদ সংক্রান্ত উসুলের ভিত্তি। তাঁরা পুস্তকটির নাম দিয়েছিলেন ধর্মশাস্ত্র যা ঈমান সংক্রান্ত বিষয়। মূলতঃ এলমে কালামের বিষয়ে পুস্তকটিতে আলোচনা করা হয়েছে। মানব জাতিকে তাঁরা চার ভাগে বিভক্ত করেছিলেন এবং চার শ্রেণীর জন্য বরাদ্দ করেছিলেন চারটি মাসলাক (মূলনীতি)। শাখা-প্রশাখার আমলও তাঁরা নির্ধারণ করে দেন। গ্রন্থটির নাম দেন কর্মশাস্ত্র। অর্থাৎ আমল বিষয়ক গ্রন্থ, যাকে এলমে ফেকাহ্ বলা হয়। হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা যেহেতু ধর্মীয় বিধান পরিবর্তনের বিষয় অস্বীকার করে, অথচ প্রত্যেক যুগের জ্ঞানীগণের স্বভাবের মধ্যে পরিবর্তন অপরিহার্য, তাই তারা দুনিয়ার দীর্ঘ আয়ুকে চার ভাগে বিভক্ত করে এবং প্রত্যেক ভাগের নামকরণ করে যুগ। প্রত্যেক যুগের জন্য চার দফতর থেকে আমল নির্ধারণ করে। শেষ যুগের হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা ধর্মে যে পরিবর্তন সাধন করে, তা অগ্রহণযোগ্য। এক সময় এ হিন্দু ধর্মের চার শ্রেণীই আল্লাহ্তায়ালার তওহীদের উপর একমত ছিলো। তারা দুনিয়াকে আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্টি বলে জানতো। দুনিয়া ধ্বংস হওয়া, ভালো ও মন্দ আমলের প্রতিদান, হাশর ও হিসাব নিকাশকে স্বীকার করতো। আকলী ও নকলী এলেম, রিয়াজত ও সাধনা, কাশফ ও মারেফত প্রভৃতি বিষয়ে তাদের যথেষ্ট দখল ছিলো। তাদের পণ্ডিতগণ মানব জীবনকে চার ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। প্রথমভাগে রয়েছে এলেম শিক্ষা, দ্বিতীয় ভাগে জীবিকা উপার্জন ও সন্তান উৎপাদন, তৃতীয় ভাগে আমল সংশোধন এবং নফসের বিশুদ্ধতা অর্জন, আর চতুর্থভাগে নির্লিপ্তি অর্জন, যা মানবীয় পূর্ণতার চূড়ান্ত পর্যায়। বৃহৎ মুক্তি তার উপরই নির্ভর করে,

তাদের ভাষায় যাকে বলা হয় মহামুক্তি। বহু পূর্বে এ ধর্মের বিধি বিধানের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ জীবনশৃংখলা ছিলো। এটি ছিলো একটি গ্রহণযোগ্য ধর্মমত, যা বর্তমানে রহিত হয়ে গিয়েছে। শরীয়তে অবশ্য ইহুদি ও নাসারা ধর্ম রহিত হওয়া ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম রহিত হওয়ার বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। অথচ এই দু'টি ধর্ম ছাড়া আরও অনেক ধর্ম রহিত হয়েছে। অনেক ধর্ম জন্ম নিয়েছে এবং শেষও হয়ে গিয়েছে। কোরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে 'ওয়া ইম্মিন উম্মাতিন ইল্লা খালাফীহা নাযীর' [৩৬] (এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি) এবং 'ওয়ালিকুল্লি উম্বমাতির রসূল' [৩৭] (প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রসুল)। রসুল প্রেরণের বিষয়ে আরও আয়াত আছে। এ সকল আয়াতের আলোকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবর্ষেও নবী রসুলগণের আগমন ঘটেছিলো। তাঁদের সম্পর্কে তাঁদের আপন আপন গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের ধর্মে বিদ্যমান আমলসমূহ থেকেও প্রকাশ পায় যে, ওই সকল ধর্মের অনুসারীরা পূর্ণতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছিলো। এ বিশাল দেশ থেকে ধর্মের রীতি নীতি ও মানবীয় [৩৮] বিষয়াবলীর কথা মানুষ ভুলে যায়নি। একটি বিখ্যাত উক্তি [৩৯] রসুলেপাক স. এর আর্বিভাবের পূর্বে প্রত্যেক কাওমের জন্য পয়গম্বর প্রেরণ করা হয়েছিলো এবং প্রত্যেক কাওমের জন্য কেবল তাদের পয়গম্বরের আনুগত্য করা ওয়াজিব ছিলো। অন্য কাওমের পয়গম্বরের নয়।

আমাদের নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স. যিনি খাতেমুল মুরসালীন এবং সকল মানুষের নবী, তাঁর আবির্ভাবের পর সকল মাযহাব এবং পূর্ব পশ্চিমের সকল ধর্ম রহিত হয়ে গিয়েছে। দুনিয়া যতদিন বিদ্যমান থাকবে, ততদিন তাঁর নাফরমানী করার কোনো সুযোগ কারো নেই। রসুলেপাক স. এর মহাআবির্ভাবের পর আজ পর্যন্ত একহাজার একশ (কিতাব রচনার কালে) আশি বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। এ সময়ের মধ্যে যে এ ধর্ম গ্রহণ করেনি, সে কাফের। কিন্তু ইসলাম আত্মপ্রকাশ করার পূর্বের লোকদের অবস্থা এরকম নয়। 'মিনহুম মান কাসাসনা আ'লাইকা ওয়া মিনহুম মাললাম মাক্বসুস আ'লাইকা' (আমি তাদের কারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করেছি এবং কারও কারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করিনি)— এই আয়াতের আলোকে দেখা যায়, শরীয়ত অধিকাংশ নবীর বিষয়ে বর্ণনা করা থেকে নিরবতা অবলম্বন করেছে। সুতরাং ভারতবর্ষে নবী রসুল আগমনের বিষয়ে চুপ থাকাই শ্রেয়। কোনো নবী যদি আগমন করেও থাকেন, এখন আমাদের সে নবীর অনুসরণ না করাতে কুফুরীর ও ধ্বংসের একীন করা লাজেম নয় এবং তাঁর অনুসরণ করলে নাজাত পাওয়া যাবে— এমন একীন করাও ওয়াজিব নয়। এ বিষয়ে কেবল ভালো ধারণা পোষণ করতে হবে। কোনোক্রমেই বাড়াবাড়ি করা যাবে না। [৪১]

শুধুমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে নয়, পারস্য দেশ এমনকি সকল দেশের মানুষের জন্যই— যারা রসুলে পাক স. এর মহাআবির্ভাবের পূর্বে গত হয়ে গিয়েছে, শরীয়ত তাদের বিষয়ে নীরব। তাদের বিধি-বিধান ও জীবনধারা ভারসাম্যপূর্ণ জীবনপ্রণালীর অনুকূলে ছিলো— এরকম আকীদা রাখাই উত্তম। আর অকাট্য দলিল ছাড়া কাউকে কাফের বলা উচিতও নয়।

ভারতবর্ষের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মূর্তিপূজার প্রকৃত তত্ত্ব হচ্ছে— তারা মনে করে কতিপয় ফেরেশতা (দেবতা) আছে, যারা আল্লাহ্তায়ালার হুকুমে পৃথিবীতে সৃষ্টি ও ধ্বংসের ক্ষমতা রাখে। অথবা তারা মনে করে, কিছু কিছু কামেল লোকের আত্মা দেহ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরও পৃথিবীতে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম। আবার কিছু কিছু লোক এমন আছেন, যাঁরা খিজির আ. এর মতো জীবিত আছেন। তারা তাঁদের প্রতিকৃতি বানিয়ে সে গুলোর দিকে আত্মিক মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে। এমনি আত্মিক মনযোগের মাধ্যমে কিছুদিন পর মূল ব্যক্তিটির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে নেয় এবং উক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। তাদের এই আমলটি জিকিরে রাবেতার সাথে বাহ্যতঃ সাদৃশপূর্ণ যা মুসলমানদের সুফী সম্প্রদায় করে থাকেন। যেমন তাঁরা নীরবে সুরত খেয়াল করে তা থেকে ফয়েজ লাভ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের সঙ্গে এই জিকিরে রাবেতার কোন মিল নেই। কারণ তাঁরা পীরের মুর্তি তৈরী করেন না।

ভারতের হিন্দু ধর্মবলম্বীদের সঙ্গে আরবের মুশরিকদের কোনো সম্পর্ক নেই। আরবীয়রা তাদের প্রতিমাগুলোকে স্বয়ং ক্ষমতাবান ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী মনে করতো। আল্লাহ্কে তারা কুদরত বা ক্ষমতার মালিক মনে করতো না। তারা প্রতিমাসমূহকে জমিনের খোদা আর আল্লাহ্তায়ালাকে আসমানের খোদা মনে করতো— যা সুস্পষ্ট শিরিক।

হিন্দুরা যে সেজদা করে তা সম্মানের সেজদা, ইবাদতের সেজদা নয়। তাদের ধর্মে পিতা-মাতা, পীর ও উস্তাদকে সালামের স্থলে এ রকম সেজদা (প্রণাম) করতে হয়। তাদের ধর্মীয় পরিভাষায় একে ভনভুত বলা হয়। আর শুধু তানাসুখ (পুনর্জন্ম)[৪২] বাদে বিশ্বাস রাখাতে কুফরী লাজেম হয় না। ওয়াস্ সালাম।

মকতুব–১৫

শাহাদত অঙ্গুলি উত্তোলন প্রসঙ্গে

আপনি লিখেছিলেন যে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. তাঁর মকতুবাত শরীফের কোনো এক মাকতুবে[৪৪] শাহাদত অঙ্গুলি উত্তোলনের বিষয়ে নিষেধ

করেছেন। আপনি (মির্জা মাযহার) হজরত মোজাদ্দেদ র.কে ভালোবাসেন বলে দাবী করে থাকেন, অথচ আপনি শাহাদত অঙ্গুলি উঠানোকে জায়েয বলে মনে করেন। মোহেবের জন্য তো মাহবুবের এত্তেবা করা অপরিহার্য।

মান্যবরেষু! আল্লাহতায়ালা কিতাব ও সুন্নতের অনুসরণ করা বান্দার উপর ফরজ করেছেন। বলেছেন— 'ওয়ামা কানা লিমু'মিনিওঁ কাদ্বাল্লাহু ওয়া রসূলুহু আমরান আঁই ইয়াক্বুনা লাহুমুল মিন আমরিহিম' (আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না)। রসুলে করীম স. বলেছেন[৪৬] 'লা ইউ'মিনু আহাদুকুম হাত্তা ইয়াকূনা হাওয়াহু তাবআ'ন লিমা জি'তু বিহি' (তোমাদের মধ্যে কেউ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ তার প্রবৃত্তি আমার আনিত বিধানের অনুসারী না হবে)।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. রসুলে পাক স. এর পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। তিনি তাঁর তরিকার বুনিয়াদ রেখেছিলেন কিতাব ও সুন্নতের উপর। উলামা কেরাম শাহাদত অঙ্গুলি উত্তোলন করার বিষয়ে সহী হাদিস ও হানাফী মাযহাবের ফেকাহ্ শাস্ত্রের ভিত্তিতে অনেক পুস্তিকা রচনা করেছেন[৪৭]। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর ছোট সাহেবজাদার সন্তান হজরত শাহ ইয়াহ্ইয়া র.[৪৮] এ বিষয়ের উপর একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন[৪৯]। তাঁরা এমন একটি হাদিসও পাননি, যার দ্বারা শাহাদত অঙ্গুলি উত্তোলন করা নিষেধ প্রমাণিত হয়। হজরত মোজাদ্দেদ র. শাহাদত অঙ্গুলি উত্তোলন করা থেকে বিরত ছিলেন তাঁর এজতেহাদের ভিত্তিতে। যে হাদিস রহিত হয়নি, তা মুজতাহিদের এজতেহাদ অপেক্ষা অগ্রগামী। অঙ্গুলি উত্তোলন করা হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে যাওয়ার পরও তরক করা কেবল এই মনে করে যে, হজরত মোজাদ্দেদ র. তরক করেছিলেন– এটা কোনো বিবেকসম্মত কথা নয়। স্বয়ং হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. সুন্নত তরক করার বিষয়ে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতেন। তিনি হানাফী মাযহাব পালন করতেন। ইমাম আবু হানিফা র. বলেছেন, 'ইযা আছবাতা হাদীসু ফাহুয়া মাযহাবী ওয়াত্রুকূ ক্বওলী বিক্বওলি রসূলিল্লাহি সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম'(যখন হাদিস সাব্যস্ত হয়ে যাবে তখন তাই হবে আমার মাযহাব)। রসুলে পাক স. এর উক্তির মাধ্যমে আমার উক্তিকে তোমরা ছেড়ে দিয়ো।

সুতরাং আমি আশাবাদী যে, হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর এই এজতেহাদ বিষয়টি তরক করে সহী হাদিসের উপর আমল করলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন না। আর যদি একথা বলা হয় যে, হজরত মোজাদ্দেদ সাহেবের এলেমের প্রশস্ততা থাকা সত্ত্বেও বিষয়টি তাঁর জানা ছিলো না, তবে তদুত্তোরে আমি বলবো,

তাঁর জামানা পর্যন্ত ভারতবর্ষে ওই সকল কিতাব মশহুর ছিলো না। তাই বিষয়টি তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়নি এবং তিনি এই আমলটি ছেড়ে দিয়েছিলেন। অন্যথায় তিনি কখনও আমলটি তরক করতেন না। কারণ তিনি ছিলেন এই উম্মতের আকাবেরগণের মধ্যে সর্বাধিক সুন্নতের অনুসারী। যদি এ কথা বলা হয় যে, কাশফের মাধ্যমে রসুল স. এর রেজামন্দী দেখতে না পেয়ে তিনি এ আমল তরক করেছিলেন, তাহলে আমি বলবো, কাশফ তরিকতের বিষয়ে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, কিন্তু শরীয়তের আহকামের ক্ষেত্রে তা দলিল হয় না। তাছাড়া উল্লেখিত মকতুবে তিনি কাশফের কোনো দাবীও করেননি[৫০]। এরকম আনুষঙ্গিক মতভেদ হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর মূলনীতি অর্থাৎ এত্তেবায়ে সুন্নতকেই উৎসাহিত করে। ওয়াস্ সালাম।

মকতুব–১৬

হাদিস মোতাবেক আমল করা প্রসঙ্গে

আপনি প্রশ্ন করেছেন হাদিস মোতাবেক আমল করা এবং এক মাযহাব থেকে অন্য মাযহাবে চলে যাওয়া প্রসঙ্গে।

মান্যবরেষু! হাদিস মোতাবেক আমল করার বিষয়ে শায়েখ মোহাম্মদ হায়াত মোহাদ্দেছে মাদানী[৫১] একটি পুস্তিকা লিখেছেন, যার সারাংশ ফার্সী ভাষায়ও লিপিবদ্ধ হয়েছে[৫২]। আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কালামে এরশাদ করেছেন— 'ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনী ইউহ্বিবকুমুল্লাহ' (তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ করো)। হজরত রসুলে পাক স. বলেছেন, 'লা ইউ'মিনু আহাদুকুম হাত্তা ইয়্যাকুনা হাওয়াহু তাবআল্লিমা জি'তু বিহি'' (তোমাদের মধ্যে কেউ কখনও পূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ সে আমার আনিত জীবনবিধানের অনুসারী না হবে)। হাদিসটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত। আবুল কাসেম ইবনে ইসমাঈল ইবনে ফযল ইসপাহানী তাঁর কিতাবুল হুজ্জাতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। 'রওজাতুল উলামা'[৫৩] নামক পুস্তকে এসেছে, ইমাম আবু হানিফা র. বলেছেন— 'উতরুকু ক্বওলী বিখবরী রসূলিল্লাহি সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামা ওয়া ক্বওলীস্ সাহাবাতি রদ্বিআল্লাহু তায়া'লা আনহুম' (রসুলে পাক স. এর হাদিস ও সাহাবা কেরামের বাণীর মাধ্যমে আমার বক্তব্য পরিত্যাগ করো)। ইমাম আবু হানিফার আর একটি বিখ্যাত উক্তি— 'ইযা সাহহাল হাদীসু ফাহুয়া মাযহাবী' (হাদিস সহী সাব্যস্ত হবে যখন, তখন তাই-ই হবে আমার মাযহাব)। সুতরাং কোনো ব্যক্তির যদি হাদিস শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়, নাসেখ মনসুখ ক্বাবী ও যয়ীফ হাদিসের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেন, তখন তিনি যদি ওই হাদিসের উপর

আমল করেন, তাহলে তিনি ইমাম আবু হানিফার মাযহাব থেকে বের হয়ে যাবেন— এমন নয়। কেনোনা তাঁর উক্তি 'ইযা সাহহাল হাদীসু ফাহুয়া মাযহাবী' এর পরিপ্রেক্ষিতে কেউ যদি জানার পরেও সহী হাদিসের উপর আমল না করে, তাহলে ইমাম সাহেবের উক্তি 'উতরুকু কৃওলী বিখবরী রসূলিল্লাহি' (রসুলে পাক স. এর হাদিসের মাধ্যমে আমার উক্তি বর্জন করো) এর বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। একথা অস্পষ্ট নয় যে, এই উম্মতের কোনো আলেমই সকল হাদিস অর্জন করতে সক্ষম হননি। ইমামে আজমের উক্তির (রসুলেপাক স. এর হাদিসের মাধ্যমে আমার উক্তি বর্জন করো) মাধ্যমে একথা সাব্যস্ত হয় যে, তাঁর কাছেও রসুলেপাক স. এর সকল হাদিস পৌঁছেনি। আর তা হবেই বা না কেনো? খোলাফায়ে রাশেদীন, যাঁরা এই উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন, রসুলেপাক স. এর সোহবতে যাঁরা সব সময়ই ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকেও তো কোনো কোনো হাদিস বাদ পড়ে গিয়েছিলো। বিষয়টি হাদিসবেত্তাগণ ভালোভাবেই জানেন। এ কথা সুস্পষ্ট যে, উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর রসুলেপাক স. এর এত্তেবা (আনুগত্য) করা ওয়াজিব। কিন্তু মাযহাবের ইমামগণের মধ্য থেকে সুনির্দিষ্ট কারও এত্তেবা করা ওয়াজিব নয়। উম্মতের এখতিয়ার আছে, তারা যে মুজতাহিদের মাযহাব গ্রহণ করতে চাইবে, করতে পারবে। কেউ যদি বলে হাদিসের উপর আমল করলে ইমাম আবু হানিফার অনুসরণ থেকে বেরিয়ে যাবে, তার কাছে যদি এর কোনো দলিল থাকে, তাহলে সে তা উপস্থাপন করতে পারে। অবশ্য মশহুর মাযহাবগুলোর মধ্য থেকে কেউ যদি কোনো এক মাযহাব ত্যাগ করে অন্য মাযহাব গ্রহণ করে, তাহলে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

আল্লামা ইমাম সুয়ূতী 'জাযীলুল মাওয়াহেব ফী ইনতিকালিল মাযাহিব' নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন, যার সারমর্ম এই— এক মাযহাব থেকে অন্য মাযহাবে যাওয়া জায়েয। ইমাম রাফেয়ী একথা সমর্থন করেছেন। ইমাম নববীও এর অনুসরণ করেছেন এবং 'রওজা' নামক কিতাবে[৫৫] লিখেছেন, মাযহাবসমূহ কায়েম হওয়ার পর কোনো মাযহাবপন্থী অপর কোনো মাযহাবে চলে যেতে পারবে কি? এ পর্যায়ে মাযহাবের অনুসারীর উপর অপরিহার্য হচ্ছে, তাঁকে উভয় মাযহাবের মুজতাহিদদের মতো এলেম অর্জন করতে হবে। তারপর যদি একীন হয় যে, অপর মাযহাবের মুজতাহিদ বেশী এলেমের অধিকারী, তা হলে স্বীয় মাযহাব ত্যাগ করে অপর মাযহাব গ্রহণ করা যাবে, বরং ওয়াজিব হবে। আর যদি তাকে এখতিয়ারও দেয়া হয়, তবু জায়েয হবে।

মাযহাব অনুসরণকারীদের কয়েকটি অবস্থা হয়ে থাকে। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাও চারটি বিষয় থেকে মুক্ত নয়। মাযহাব অনুসরণকারী সাধারণ মুসলমান হতে পারে, অথবা হতে পারে আলেম। তাঁদের মাযহাব পরিবর্তন আবার দীনি কারণে হতে

পারে, আবার হতে পারে জাগতিক কারণেও। মাযহাব অনুসরণকারী যদি অজ্ঞ হয় এবং ফেকাহ্ শাস্ত্র সম্পর্কে সে কিছুই না জানে, স্বীয় মাযহাব সম্পর্কে জানে নামমাত্র, আর সে যদি মাল ও সম্পদের কারণে মাযহাব পরিবর্তন করে, তাহলে এটি তার ক্ষতিকর তৎপরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর তার পরিবর্তিত মাযহাব তার জন্য শুধুই ক্ষতির কারণ হবে। আর সে যদি আলেম ও ফকীহ্ হয় এবং দুনিয়াবী কারণে মাযহাব পরিবর্তন করে, তাহলে তা হবে অধিকতর জঘন্য। সে যেনো মাযহাবের সাথে উপহাস করছে। শুধু দুনিয়ার কারণে এরকম করা সম্পূর্ণ নাজায়েয।

ওই ব্যক্তি যদি তাঁর নিজের মাযহাবের ফকীহ হয়ে থাকে, আর মাযহাব পরিবর্তনের কারণটি যদি ধর্মসম্মত হয়, অপর মাযহাব তার কাছে শক্ত দলিলের মাধ্যমে হয় প্রাধান্যপ্রাপ্ত, তবে তার মাযহাব পরিবর্তন করা হবে ওয়াজিব। আরেক বর্ণনা অনুসারে জায়েয। ওই ব্যক্তি যদি এলমে ফেকাহ্ সম্পর্কে অবগত না থাকে, নিজের মাযহাব বুঝবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞ থাকে, অন্য মাযহাবকে অধিকতর সহজ এবং বোধগম্য মনে করে অন্য মাযহাবের ফেকাহ্ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে চায়, তাহলে তার জন্যও মাযহাব পরিবর্তন করা ওয়াজিব। কারণ মাযহাব সম্পর্কে জ্ঞান-বুঝ অর্জন করা মূর্খ থাকার চেয়ে উত্তম। বিভিন্ন মাযহাব সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যে কোনো একটি মাযহাব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা উত্তম। তার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাহেল লোকের ইবাদত বিশুদ্ধ হয় না। মাযহাব পরিবর্তন কোনো ধর্মীয় বা দুনিয়াবী কারণে নয় বরং শুধু আমলের জন্য যদি করে, তাহলে তা সাধারণ লোকদের জন্যও জায়েয। তবে ফকীহ'র জন্য নিষিদ্ধ। কেনোনা একজন ফকীহ সুদীর্ঘকাল ব্যাপী সাধনা করে ফেকাহ বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করেছেন। তিনি যদি অপর একটি মাযহাব গ্রহণ করেন, তাহলে সেই মাযহাবের ফেকাহ অর্জন করার জন্য আরেকটি জীবনকালের প্রয়োজন। আর সে পরিপ্রেক্ষিতে আমল, যা মুখ্য, তা আর সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। সুতরাং তার মাযহাব পরিবর্তন না করাই উত্তম।

সাধারণত যা বলা হয়ে থাকে, কোনো অহানাফী ব্যক্তি যদি হানাফী মাযহাবে আসে, তাহলে জায়েয হবে। আর কোনো হানাফী যদি অন্য মাযহাবে যায়, তাহলে জায়েয হবে না। কথাটি শুধু হঠকারিতামূলক। এর কোনো দলিল নেই। প্রকৃতপক্ষে সকল ইমামই সমান। হানাফী মাযহাব বা অন্য কোনো মাযহাবের অগ্রগণ্যতার ব্যাপারে যদি কোনো আয়াত বা হাদিস থাকতো, তাহলে সে মাযহাবের অনুসরণ করা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হতো। অন্য মাযহাবের অনুসরণ করা নাজায়েয হতো। তাই এ কথাটি এজমার পরিপন্থী।

'জামেউল ফতওয়ার' লেখক[৫৬] যিনি একজন হানাফী, তিনি বলেছেন, কোনো পুরুষ বা নারী শাফেয়ী মাযহাব থেকে হানাফী মাযহাবে আসতে পারবে। তবে এ মাযহাব পরিবর্তন সমস্ত মাসআলার পরিপ্রেক্ষিতেই হতে হবে। গুটি কতক মাসআলার পরিপ্রেক্ষিতে তা জায়েয হবে না। অতীত ও বর্তমান কালের (কিতাব রচনা কালে) অনেক বুজুর্গই মাযহাব পরিবর্তন করেছেন। যদি বিষয়টি নাজায়েয হতো, তবে তাঁরা তা করতেন না।

এমতো অভিমতের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে তা হবে দলিলবিহীন, অগ্রহণযোগ্য এবং অসঙ্গত। হেদায়েতের অনুসারীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

মকতুব— ১৭

সাহাবা কেরাম সম্পর্কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকীদা

আপনি লিখেছেন আমীর মুযাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান সাহাবী, তাঁর সাথে শত্রুতা পোষণকারী এবং তাঁর সমর্থনকারীদের বিষয়ে কীরকম আকীদা পোষণ করা উচিত।

জেনে রাখা উচিত যে, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আলেমগণ সাহাবা কেরামের মধ্যে সংঘটিত মতানৈক্যের ব্যাপারে সুধারণার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করে থাকেন, যা খাইরুল কুরুনগণের বেলায় অপরিহার্য। কোনো বিষয় যদি ব্যাখ্যাযোগ্য না হয়, তবে তাঁরা তা আল্লাহ্তায়ালার নিকট সোপর্দ করেন। তাঁদেরকে দোষারোপ ও সমালোচনা করা নিষিদ্ধ মনে করেন। কেনোনা তিন কালের আলেম, মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিসগণ নিকটবর্তী জামানা হওয়ার কারণে তাঁদের সম্পর্কে পুরোপুরি জানতেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আলেমগণ হজরত আলী রা. এর বিরোধিতাকারীদের ভুল স্বীকার করার পর এই জামাতের উপর কোনোরূপ দোষারোপ করেন না[৫৭]। যদিও সৈন্যবাহিনী শাম (সিরিয়া) ও কুফার মধ্যে কিছুদিন অবস্থান করেছিলো এবং ঘটেছিলো কিছু আক্রমণ করার ঘটনাও— কিন্তু তা ছিলো কেবল বাড়াবাড়ি করার কারণে। তা এজন্য হয়নি যে, তাঁরা একে অপরকে কাফের মনে করেছিলেন[৫৮]। এ বাড়াবাড়ি সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রহণযোগ্য কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ওই ফেতনার সূত্রপাত হয়েছিলো আমীরুল মুমিনীন হজরত ওছমান রা. এর শাহাদতের ঘটনা থেকে। এ বিষয়ে সবচেয়ে নিরাপদ পন্থা হচ্ছে এ রকম মনে করা যে, ওই কলহের সময় সেখানে সাহাবা কেরাম তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। একদল ছিলেন খলীফা বরহক হজরত আলী ইবনে আবী তালেবের সমর্থনে। আরেকদল ছিলেন সিরিয়ার

আমীরের সমর্থনে। আর তৃতীয় দল ছিলেন নিরপেক্ষ। কোনো পক্ষকে সমর্থন না করে তাঁরা নিরবতা অবলম্বন করেছিলেন।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ জামানার মুহাদ্দিস এবং মুজতাহিদগণ ওই তিন দলের সাহাবীগণ থেকে হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে সমান নির্ভরশীল ছিলেন। ওই তিন দলের কাউকে তাঁরা কাফের বা ফাসেক মনে করলে নিশ্চয় তাঁরা তাদের কাছ থেকে রেওয়ায়েত গ্রহণ করতেন না এবং সে রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে মাসআলা উদ্ধার করতেন না। এখন এ ধরনের সাহাবীগণের উপর দোষারোপ করলে দীন ও ইসলামের মিল্লাত ধ্বংস হয়ে যাবে[৫৯]। সে জন্যই তাঁদের প্রতি দোষারোপ উত্থাপন করা থেকে রসনাকে সংযত রাখতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে দীনি হেকমত[৬০]। আর রসুলেপাক স. এর নিকটজনদের সম্ভ্রম পৃথক একটি বিষয়। কোনো বিরুদ্ধবাদী যদি এরকম বলে যে, রসুলেপাক স. এর নিকটতম সাহাবীগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা তো আরও অধিক অপরিহার্য। তাহলে একথাও গ্রহণযোগ্য। তবে নিকটজনেরা তাঁদের বিরোধীদেরকে তো পরিষ্কারভাবে কাফের সাব্যস্ত করেননি, প্রচণ্ড ঝগড়া ও বর্বরতার ক্ষেত্রে যা সাধারণত প্রয়োগ করা হয়। তাছাড়া খাইরুল কুরুনের ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে এরকম ভুল সংঘটিত হওয়া সুদূর পরাহত বিষয়। যদিও তা এজতেহাদী ভুল হয়[৬১]। কারণ রসুলেপাক স. এর নিকটজনদের প্রতি মহব্বত রাখা সমস্ত উম্মতের উপর ওয়াজিব। রসুলেপাক স. এর নিকটজনদেরকে কষ্ট দেয়ার মধ্যে যদি বল প্রয়োগের বিষয় না থাকে, তাহলে তাতে সন্তুষ্টি লাজেম (আবশ্যক) হয় (যা সম্পূর্ণ নাজায়েয)। এ বিষয়ে এর চেয়ে অধিক আলোচনা সঙ্গত হবে না। সুতরাং এ বিষয়ে পূর্ণ আফসোস সহকারে নিরবতা অবলম্বন করাই শ্রেয়।

শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা ভারসাম্য পন্থা থেকে বিচ্যুত। তারা ভিত্তিহীন বর্ণনাসমূহের আশ্রয় নিয়ে পবিত্র ব্যক্তিগণকে তাদের নিজেদের খবীছ ব্যক্তিদের মতো ধারণা করে পর্যায়ক্রমে সাহাবা কেরামকে কাফের সাব্যস্ত করা শুরু করে দেয়[৬২], যাঁরা ছিলেন সত্যিকার অর্থে মোতাওয়াতির হাদিসের উৎস এবং কিতাব ও সুন্নতের সংকলনকারী। সাহাবীগণ মনে করতেন, এই রসুলের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালা নবুওয়াত সমাপ্ত করেছেন। তাঁকে সকল মানুষের অধিনায়ক বানিয়েছেন। তাঁর দীনকে বানিয়েছেন অন্যান্য সকল দীনের রহিতকারী। আর এই দীনকে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখবেন। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা নাজিল করেছেন এই আয়াত— 'ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রহমাতাল লিল আলামীন' (আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি)[৬৩]।

যে জামাত রসুলেপাক স. এর নবুওয়াতের কালে তাঁর সংসর্গে ছিলেন এবং যাঁরা তাঁর জীবদ্দশায় আপন আপন জান ও মাল খরচ করে খেদমত করেছেন। তাঁর মহাতিরোধানের পর দীন ও শরীয়ত প্রচলনের কাজে এক মুহূর্তের জন্যও অবহেলা করেননি, তাঁরা রসুলেপাক স. এর মহাপ্রস্থানের পর কুফুরীর ধূম্রজাল থেকে বেরিয়ে নাজাতের দোর গোড়ায় পৌঁছতে সক্ষম হবেন না— তাকি কখনও হতে পারে? সত্য কথা এই যে, ওই সকল সাহাবী আল্লাহ্তায়ালা ও তাঁর রসুলের ব্যাপারে বিস্ময়কর ধরনের সুধারণা পোষণ করতেন। বিরূপ মনোভাব প্রদর্শনকারীরা সাহাবীগণ সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করে, আল্লাহ্ না করুন— এমনই যদি হতো, তাহলে এমন আল্লাহ্র কাছ থেকে পরবর্তী লোকেরা কি রহমতের আশা করতে পারতো? আর এমন পয়গম্বরের কাছ থেকে তারা কীভাবে শাফাআতের আশা করতে পারে।

পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের এবং তাঁদের উম্মতদের অবস্থা তো গোপন নয় এবং ওই সকল সম্প্রদায়ের ওলীগণের অবস্থাও গোপন নয়। এরকম কখনও দেখা বা শোনা যায়নি যে, ওই বুজুর্গগণের মধ্য থেকে কারও ইনতেকাল হয়ে যাওয়ার পর তাঁদের মুখলিস লোকগুলো মুরতাদ হয়ে গিয়েছেন এবং তাঁদের বংশধরগণের শত্রুতে পরিণত হয়েছেন। এমতাবস্থায় রসুল প্রেরণের যে উদ্দেশ্য কওমের এসলাহ – তার সার্থকতা কোথায়। অবস্থা যদি তাই হতো, তাহলে তো খাইরুল কুরুন (উত্তম যুগ) শাররুল কুরুন (মন্দ যুগ) এ পরিণত হয়ে যেতো। উত্তম উম্মত পরিণত হতো মন্দ উম্মতে। আল্লাহ্তায়ালা ইনসাফ নসীব করুন। ওয়াস্ সালাম।

মকতুব—১৮

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকীদার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

হামদ ও সালাতের পর আপনি লিখেছেন, সাহাবা কেরাম ও আহলে বাইতগণের বিষয় নিয়ে শিয়া ও সুন্নীগণের যে মতভেদ, তাতে অন্তরে প্রশান্তি থাকে না। মিল্লাতের আকীদার ভিত্তিমূল হচ্ছে হাদিস শরীফ। হাদিসের মধ্যে মিথ্যা ও সঠিক দুই-ই আছে। কিন্তু মোতাওয়াতির হাদিস, যার দ্বারা বিশ্বাসের দৃঢ়তা লাভ হয়, তার সংখ্যা খুবই কম। সুতরাং প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা লাভের উপায় কী?

মান্যবরেষু! এই মাসআলাটি দ্বীন ইসলামের জরুরী কোনো বিষয় নয়। আল্লাহ্তায়ালার এককত্বে ও নবুওয়াতে বিশ্বাসই নাজাতের জন্য যথেষ্ট। ঈমানে মুজমাল, অর্থাৎ সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান আনা এমনভাবে যে, আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ

থেকে নবী করীম স. যা নিয়ে এসেছেন, তা সত্য— এমতো বিশ্বাসই নাজাতদানকারী। আর কলেমা তাইয়্যেবার বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতির মাধ্যমে মানুষ মুসলমান হয়— এইই যথেষ্ট। সাহাবা কেরাম এবং আহলে বাইতগণের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করা উচিত। কেনোনা ওই হজরতগণ রসুলেপাক স. এর সোহবতে ছিলেন। তাঁরা তাঁর খেদমতে ছিলেন ও তাঁর নৈকট্য পেয়েছিলেন। তাই তাঁদেরকে মহব্বত করতে হবে। এতটুকুই যথেষ্ট। ওই হজরতগণের জীবনের বিস্তারিত বিষয়ের জন্য ইতিহাসের পুস্তকাদি অধ্যয়ন করা ফেতনায় নিপতিত হওয়ার কারণ হতে পারে[৬৪]। মনে রাখতে হবে ইসমত (নিষ্পাপ) হওয়ার পদ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মাযহাব অনুসারে নবীগণের জন্য খাস। তাঁদেরকে ছাড়া অন্য কারও জন্য এ আকীদা পোষণ করা জায়েয নয়। তাঁরা সিদ্দীক বা ওলী হলেও নয়। তাঁদের মধ্যে কখনও কখনও বিরোধিতা হতে পারে, কিন্তু অতিসত্বর তা দূর হয়ে যায়। তাঁদের বাতেন জগত চূড়ান্ত পর্যায়ে পরিচ্ছন্ন হওয়ার কারণে তাসকিয়া অর্জিত হয়ে যায়। কিন্তু যাদের নফস খাবাছাতপূর্ণ, তারা ওই আকাবেরগণের বিষয়ে অনুমান করে তাঁদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রতিহিংসা এবং শত্রুতার বিষয়টিকে সাব্যস্ত করে থাকে। এ সবের আনুষঙ্গিক বিষয় তালাশ করে সরিষাকে পাহাড় বানিয়ে ফ্যালে, যা মূলতঃ অনর্থক। ধর্তব্য কিছু নয়।

জেনে রাখা উচিত, সাহাবীগণের জামাত এনকার করার অর্থ— রসুলেপাক স. এর ওজুদ মোবারকের তাছীরকে এনকার করা। এরকম করলে পয়গম্বরগণকে পৃথিবীতে প্রেরণ করার সার্থকতাকেই প্রত্যাখ্যান করা হয়। একদিন আমি এ বিষয় নিয়ে গভীর ভাবনায় নিমগ্ন হলাম। আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলাম এই মর্মে যে, এই ধ্বংসাত্মক সন্দেহ থেকে উদ্ধারের কোনো রাস্তা যেনো পেয়ে যাই। তখন আমার অন্তর্দেশে প্রতিভাত হলো এই বাক্যটি 'কুল আমানতু বিল্লাহি কামাহুয়া ইন্দা নাফসিহি ওয়া বিরসূলিল্লাহি কামা হুয়া ইন্দা রব্বিহি ওয়া বি আলিহি ওয়া আসহাবিহি কামাহুয়া ইন্দা নাবিয়্যিহিম' (তুমি বলো, আমি আল্লাহর উপর ইমান এনেছি, তিনি যেমন তাঁর নিকট, রসুলুল্লাহর উপর ইমান এনেছি, তিনি যেমন তাঁর রবের নিকট। রসুলের আল ও আসহাবগণকে বিশ্বাস করেছি, তাঁরা যেমন ছিলেন তাঁদের রসুলের নিকট)।

প্রকাশ থাকে যে, এই উচ্চস্তরের বিষয়টি যাবতীয় মতভেদের ঊর্ধ্বে। বিষয়টি আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সোপর্দ করা উচিত। এ প্রসঙ্গে কোনো ফেরকার সমালোচনা করার কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহ্‌তায়ালার শুকরিয়া তাঁর নেয়ামতসমূহের উপর। তাঁর রসুল এবং রসুলের বংশধরগণের উপর সালাত ও সালাম। আমিন।

মকতুব—১৯

বারো খলীফা কুরাইশের মধ্য থেকে হবেন— এই হাদিসের বর্ণনা প্রসঙ্গে

আপনি লিখেছেন, হাদিস শরীফে এসেছে— রসুল স. বলেছেন, আমার পর কুরাইশদের মধ্য থেকে বারোজন খলীফা হবে[৬৫]। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের নিকট উক্ত বারোজন খলীফার মধ্য থেকে তো চারজন বিশেষ খেলাফত (খেলাফতে রাশেদা) লাভ করেছিলেন[৬৬]। বাকী আট জনও খেলাফতে আসীন হয়েছিলেন। কাফেরদের সঙ্গে জেহাদ করেছেন এবং দীনের তবলীগ করেছেন। শিয়া মতাবলম্বীরা বারো ইমামের কথা বলে। আপনার মতে কোনটি সত্য।

মান্যবরেষু! আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সত্যের দিকেই। জেনে রাখা উচিত যে, খেলাফত শব্দটির মধ্যে ব্যাপকতা রয়েছে। তার মধ্যে জাহেরী এবং বাতেনী উভয় প্রকার খেলাফতই শামিল আছে। রসুলেপাক স. এর খলীফাগণের জন্য জাহেরী ও বাতেনী উভয় খেলাফতই অপরিহার্য। খলীফা তিনিই হতে পারেন, যিনি খেলাফত (প্রশাসন) এর কার্য পরিচালনা করতে সক্ষম। জাহেরী খেলাফত পরিচালনা শক্তি ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ হুকুম বাস্তবায়নের জন্য কোষাগার ও সৈন্য বাহিনীর ব্যবস্থাপনা করতে হবে। প্রকাশ থাকে যে, চারজন খলীফা তিরিশ বছর শাসন কার্য পরিচালনা করেছিলেন। তাঁদের পর হজরত ইমাম হাসান রা. ছ'মাস খেলাফতের পদে আসীন ছিলেন। এ পাঁচজনের পর অন্য কেউই জাহেরী খেলাফত প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হতে পারেননি। এটাই রসুলেপাক স. এর উক্তি 'খলীফা কুরাইশদের মধ্য থেকে হবে' কথাটির তাৎপর্য। ব্যাখ্যা যদি এরকম না হতো, তবে রসুলে পাক স. 'কুরাইশ' শব্দের স্থলে 'আহলে বাইত' বা ' বনী হাশেম' বলতেন। দু'মাযহাব (জাহেরী শরীয়ত পন্থী এবং সুফী সম্প্রদায়) এর মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে যে, দ্বীনের প্রচলন জাহেরী উপকরণের উপর নির্ভরশীল। জাহেরী আচার অনুষ্ঠান দ্বীনের কালেব বা অবয়ব স্বরূপ, যা উল্লেখিত ইমামগণের রক্তের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর দীনের বাতেন, যা ইসলামের হাকীকত, তা উক্ত দ্বীনের রূহ স্বরূপ, যা ইমামগণের পবিত্র নফসসমূহের ওসিলায় অর্জিত হয়েছে।

সুতরাং আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সুফী সম্প্রদায় বারো ইমামকে কুতুবের স্বীকৃতি প্রদানে একমত। চারজন খোলাফায়ে রাশেদীন এবং ইমাম হাসান রা. এর মধ্যে উক্ত জাহেরী এবং বাতেনী বৈশিষ্ট্যসমূহ সমন্বিত ছিলো।

সিরিয়ার গভর্ণর হজরত আমীর মুয়াবিয়া এবং হজরত ইমাম হাসানের মধ্যে সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার পর থেকে তাঁদের মধ্যে এবং ইমাম মাহদী আলাইহি রেদওয়ানের মধ্যে বাতেনী খেলাফতের সম্বন্ধ আছে। তাছাড়া ইমাম মাহদীর

সত্তায় জাহেরী ও বাতেনী খেলাফতও সুসাব্যস্ত। এছাড়া অন্য খলীফাগণের মধ্যে পর্যায়ক্রমে জাহেরী খেলাফত ছিলো। অবশ্য আমার মতে বারো সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ততা করা হয়েছে। ওয়াস্ সালাম।

মকতুব—২০

আমীরুল মুমিনীন হজরত আলী রা. এর প্রতি হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর অসন্তুষ্টি কারণ

আপনি লিখেছেন, সহী হাদিসসমূহের দ্বারা সাব্যস্ত যে, রসুলেপাক স. এর জীবদ্দশায় হজরত আয়েশা সিদ্দীকা হজরত আলীর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন[৬৭]। পরবর্তীতে উটের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়াতেও উক্ত অসন্তুষ্টি আরও অধিক স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বিষয়টি বেশ জটিল। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর হজরত আলী রা. থেকে বিমুখতার বিষয়টি সুদূরপরাহত বলেই মনে হয়। অথচ জননী আয়েশা থেকে রেওয়ায়েত আছে, হজরত আলী এবং হজরত ফাতেমা যাহরা রা. রসুলে পাক স. এর সবচেয়ে প্রিয়ভাজন ছিলেন।

মান্যবরেষু! কখনও কখনও এমন হয় যে, ঝগড়ার ক্ষেত্রে দু'পক্ষই মাযুর (নিরুপায়) হয়ে যায়, যদি তারা উভয়েই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকে। এখানেও সে রকমই হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, ইফকের ঘটনায় হজরত আলী যখন বুঝতে পারলেন রসুল স. দ্বিধা দ্বন্দ্বে আছেন, তখন তিনি মহব্বতের প্রাবল্যে এবং সময়ের চাহিদার কারণে রসুল স.কে সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যে এরকম কথা বলেছিলেন যেনো রসুল স. এর অন্তকরণ হজরত আয়েশার দিক থেকে অন্যমুখী হয়ে যায়। হজরত আয়েশা এরকম কথা শুনে অত্যন্ত পেরেশান হয়ে যান[৬৯]। পেরেশান হবেন না কেনো? এমতো পরিস্থিতিতে এ রকম আলোচনায় প্রেমিকা তার প্রেমিকের নজর থেকে দূরে সরে যায়। এটাই স্বাভাবিক। এর চেয়ে অধিকতর কষ্টকর কিছু আর হতে পারে না। কাজেই হজরত আলীর প্রতি হজরত আয়েশা সিদ্দীকার বিমুখতা ভালোবাসার অভিমান এবং মানবীয় চাহিদা অনুসারেই হয়েছিলো। এ ছাড়া কোনো উপায়ও ছিলো না। এই বিমুখতা অন্য কোনো কারণে ছিলো না। যতক্ষণ ভালোবাসা বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ অভিমান থাকে। হজরত আলীও একথা কোনোরূপ দুশমনির কারণে বলেননি। কেনোনা প্রিয়জনের প্রিয়জনও প্রিয় হয়ে থাকে। বরং তা হয়েছিলো রসুলেপাক স. এর প্রতি হজরত আলীর ভালোবাসার কারণে। এ বিষয়ে তিনি উদাসীন থাকতে পারেননি। তাঁরা উভয় পক্ষই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁরা মাযুর ছিলেন। বরং তাঁরা উভয় পক্ষই সওয়াবের অধিকারী হবেন। কেনোনা উভয়েরই ভিত্তি ছিলো রসুল পাক স. এর প্রতি ভালোবাসা।

তাছাড়া হজরত আবু বকর সিদ্দীকের প্রতি হজরত ফাতেমাও অসন্তুষ্ট ছিলেন– একথা সহী হাদিস দ্বারা প্রমাণিত[৭০]। এ প্রসঙ্গে দু'টি সন্দেহের সূত্রপাত হয়। প্রথমতঃ হজরত ফাতেমা রা. এর মধ্যে তরকে দুনিয়ার স্বভাব থাকা এবং হজরত আবু বকর সিদ্দীকের পক্ষ থেকে যুক্তিসঙ্গত জবাব পাওয়া সত্ত্বেও তিনি অসন্তুষ্ট রইলেন কেমন করে[৭১]। দ্বিতীয়তঃ হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এমন একটি মামুলী বিষয়ে রসুল স. এর আওলাদের উপর কল্যাণকর ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না কেনো[৭২]? এর উত্তরে বলা যায়, দুনিয়াতে উত্তরাধিকারের মালের চেয়ে অধিকতর হালাল কোনো মাল নেই। এ মাল অন্বেষণ করা তরকে দুনিয়া এবং তাকওয়ার পরিপন্থী নয়। বরং মুত্তাকী ব্যক্তি হালাল মালের বেশী কদর করে থাকেন। মানুষের মধ্যে যতক্ষণ বাশারিয়াত (মানবীয় বৈশিষ্ট্য) বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পদগত প্রয়োজন থেকে উদাসীন হওয়া যায় না। আর হজরত সিদ্দীক আকবর রা. যে অস্বীকার করেছিলেন, তার ভিত্তি হচ্ছে হাদিস। রসুল পাক স. বলেছেন, 'নাহনু মাআ'শিরুল আম্বিয়াই লা নূরিছু' (আমরা নবী সম্প্রদায়। আমাদের কোনো ওয়ারিশ হয় না)[৭৩]। হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. নবী করীম স. এর জবান মোবারক থেকে এই হাদিস শুনেছিলেন। তাই এ হাদিসখানি এ বিষয়ে নস্‌সে কেতয়ী বা অকাট্য দলিল ছিলো। শরীয়তের অকাট্য দলিল যেখানে উপস্থিত, সেখানে মোসলেহাতের দিকে লক্ষ্য করা জায়েয নেই। এই হাদিস শুনে হজরত ফাতেমা রা. সান্ত্বনা পাননি। তার কারণ, উত্তরাধিকারের সম্পত্তির হুকুম তো সাব্যস্ত হয়েছে আয়াতে মীরাছের মাধ্যমে। তাছাড়া এই হাদিস ওই সময় পর্যন্ত এতো মশহুর হয়নি, যা হজরত ফাতেমার জন্য দলিল হতে পারে[৭৪]। অথবা এ অসন্তুষ্টি হজরত ফাতেমার নাজুক (স্পর্শকাতর) স্বভাবের কারণেও হয়ে থাকতে পারে, যা রসুলেপাক স. এর সাহেবজাদী হওয়ার কারণে তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। আল্লাহ্‌তায়ালার বাণী— 'লা তাবদীলা লিখলক্বিল্লাহ্‌' (আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন সাধিত হয় না)। এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো পূর্ণ বিশেষত্ব আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্টি করা স্বভাবকে পরিবর্তন করতে পারে না। যেমন হজরত মুসা আ. এর রোষতপ্ত স্বভাব ছিলো। ওই রোষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। তিনি যে মালাকুল মউত ফেরেশতাকে চপেটাঘাত করেছিলেন, তাতো অতি বিখ্যাত একটি ঘটনা[৭৫]।

কাজেই তাঁরা উভয় পক্ষই মাযুর ছিলেন এবং উভয়েই হকের উপর ছিলেন বলে প্রমাণিত হয়। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের জন্য উভয় পক্ষ হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন– এরূপ সুধারণা পোষণ করা ওয়াজিব। যারা হেদায়েতের উপর তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

মকতুব–২১

উজ্জ্বল সুন্নতের অনুসরণ অপরিহার্য, চৈতন্য ও খাতিরজমা অর্জন ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা

মান্যবরেষু! এই জামানার দুর্বল আকীদার তালেবদের বিষয়ে আপনি যা লিখেছেন, যারা শুধু দরবেশগণের কাশ্ফ্ কারামত প্রত্যাশা করে তাদের তো প্রথম যুগ (কারণে আউয়াল) এর সাথে কোনো নেসবত নেই বলে মনে হয়।

যে সকল নির্বোধ অন্য শায়েখের প্রতি আগ্রহ পোষণ করে তাদেরকে মুরিদ করার কী প্রয়োজন[৭৬]। বুদ্ধিমান মুখলিস ব্যক্তিগণের মধ্য থেকে কেউ যদি উল্লেখিত বিষয়ের প্রত্যাশী হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে এভাবে সান্ত্বনা পাওয়া উচিত যে, আল্লাহ্তায়ালা প্রকৃত হাকিম এ আয়াতের দৃষ্টিতে 'কুল ইনকুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনী ইউহবিব কুমুল্লাহ' (হে রসুল! আপনি বলে দিন তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ করো। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন)[৭৭]।

আল্লাহ্তায়ালা তাঁর মহব্বতের ভিত্তি রেখেছেন পয়গম্বরে খোদা স. এর এত্তেবার উপর, যা সকল তরিকার সুফীগণের আসল মকসুদ। আল্লাহ্তায়ালা এ অভিজ্ঞ মহান চিকিৎসককে কতিপয় আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন, বর্জনীয় খাবার তুল্য গাফলত ও নাফরমানীতে লিপ্ত উম্মতের সংশোধনের জন্য। যারা এ ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করেছে, তারাই শেফা লাভ করেছে। আর যে তা অস্বীকার করেছে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ব্যবস্থাপত্রের সুরত (বাহ্যিক আকৃতি) আছে এবং তার হাকীকতও (বাস্তবসত্তা) আছে। এর সুরত তো সর্বসাধারণ মুসলমানের জন্য। তারা যেনো ইমান বিশুদ্ধ করার পর কিতাব ও সুন্নাহ মোতাবেক আকীদাসমূহ সংশোধন করে নেয়। তৎপরবর্তী কাজ হচ্ছে আদেশ নিষেধসমূহ বাস্তবায়নে অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমূহকে ব্যবহার করা। এ সকল আমলের প্রতিদান হচ্ছে অনুভবগত নেয়ামতসমূহ। নাজাত এর মধ্যেই নিহিত।

এই ব্যবস্থাপত্রের হাকীকতে খাস লোকদের হিসসা রয়েছে। আর তা অর্জিত হয় উপরে বর্ণিত সুরত মোতাবেক অনুশীলন ও সাধনার মাধ্যমে কলবকে পরিচ্ছন্ন এবং নফসকে বিশুদ্ধ করার মাধ্যমে। এ অবস্থা অর্জিত হলে তাজাল্লী এবং কাশ্ফের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সুরত দ্বারা ইমান ও ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। আর হাকীকত মানে এহসান অর্জন করা। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে— 'আন তা'বুদাল্লাহা কাআন্নাকা তারাহু' (তুমি আল্লাহ্র ইবাদত এমনভাবে করো, যেনো তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো)[৭৮]।

হাকীকতবিহীন সুরত হচ্ছে ওই ঔষধের মতো, যা বাহ্যিক চামড়ার উপর প্রয়োগ করা হয়। যেমন ফোঁড়ার উপর প্রলেপ, মালিশ বা মলম জাতীয় ঔষধ। অবশ্য এ জাতীয় ঔষধেরও ক্ষণিক উপকারিতা থাকে। তবে হাকীকতের প্রতি বা রোগের নিগুঢ়তার প্রতি লক্ষ্য না করে শুধু সুরতের গুরুত্ব দিলে প্রকৃত ফল লাভ হয় না। এরূপ রোগমুক্তি আসলে হাকীকত নয়। এটি হচ্ছে ধোকা। আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে আমরা এ থেকে পরিত্রাণ চাই।

হাকীকত হচ্ছে তানকিয়াহ (রোগের মূলোৎপাটন) তুল্য, যা দ্বারা রোগের মূল বের করে আনা হয়। তাতে পুনরায় রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ রোগমুক্তি ঘটবে না, যতক্ষণ হাকীকত ও সুরতের সমন্বয়ে চিকিৎসা না করা হবে। উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, রসুলেপাক স. এর চিকিৎসা দ্বারা সাহাবা কেরামের মধ্যে সুস্থতা ও রোগমুক্তির প্রতিফলন কী পরিমাণ হয়েছিলো।

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্‌র মহব্বতের প্রাবল্য, তাঁর হুকুম প্রতিপালন, রসুলে খোদা স. এর সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর আনুগত্য করা এবং গোনাহ্ থেকে তওবা করা ছাড়া সাহাবা কেরামের জীবনে আর অন্য কিছু প্রকাশ পায়নি। ওই সমস্ত আমলের প্রতিফলন ঘটাতে তাঁদের জীবনে সার্বক্ষণিক কলবের হুজুরী, নফসের মার্জিত অবস্থা প্রকাশ পেয়েছিলো, যা রসুলেপাক স. এর বরকতময় সোহবত এবং শরীয়তের বিশুদ্ধ মান্যতার মাধ্যমে হাসিল হয়েছিলো।

সুরত ও হাকীকত পূর্ণরূপে হাসিল করার পর এর চেয়ে বেশী কিছু হাসিল করার ব্যাপারে কল্পনাই করা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ বিষয়ের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সুরতকে সুরক্ষিত রাখতে হবে, যা হাকীকতের পাহারাদার। তাহলে আম খাস সকলেই ফায়দা লাভ করতে পারবে।

সাহাবা কেরাম কাশ্‌ফ্ ও কারামাতের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেননি। তাঁরা এ সকল বিষয়কে কামালাতের উপকরণ ও শর্ত মনে করেননি। সুতরাং যে রোগী (তালেব) পূর্ণ সুস্থতা অর্থাৎ নেসবতে মোহাম্মদী চায়, তার জন্য অপরিহার্য হচ্ছে সকল রিয়াজত ও মোজাহাদার চেয়ে সুন্নতের অনুসরণকে উত্তম মনে করা[৭৯]। সুন্নত প্রতিপালনের মাধ্যমে যে নূর ও বরকত প্রকাশ পায়, তাকে যাবতীয় ফয়েজ থেকে উত্তম মনে করতে হবে। দায়েমী হুজুরীর মোকাবেলায় সাধারনভাবে খ্যাত যওক শওক– এসব কোনো হাকীকতই নয়। যে প্রিয়জনের সোহবতের ফলে এ সমস্ত বিষয় হাসিল হয়, তাঁকে রসুলুল্লাহ স. এর নায়েব মনে করে তাঁর খেদমতকে অপরিহার্য মনে করতে হবে। এ পথের ফল ভক্ষণ করে কেউ যেনো ধোকায় পতিত না হয়, সে ফল যতো সুস্বাদুই হোক না কেনো[৮০]।

মকতুব—২২

মোজাদ্দেদিয়া তরিকার কতিপয় মর্যাদার বিষয়ে শাহ্ আবুল ফাতাহ্'র নিকট লিখিত

মান্যবর পুত্র ! আপনার মূল্যবান পত্র হস্তগত হয়েছে । এতে করে আমার মধ্যে নবজীবন ফিরে এসেছে এবং খুলুসিয়াতের নেসবতে নবায়ন ও দৃঢ়তা সাধিত হয়েছে । আপনি সুলুকের আরম্ভ এবং পরিণাম সম্পর্কে যা লিখেছেন, তা পাঠ করেছি । যে সকল নমুনা আপনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তা খুবই আশাপ্রদ । বিশেষ করে ওই বিষয়গুলো জেনে রাখতে হবে, যা অর্জিত হলে অধিকাংশ লোকের মধ্যে অহংকারের সূত্রপাত হয় । তরিকার কদর ও কিমত মনে করা, আল্লাহ্র অন্বেষণে আমাদের মতো ব্যর্থ ফকীরদের নিকট আশাবাদী হওয়া, দোয়ার জন্য হস্ত প্রসারিত করা, ওয়াহদাতুল ওজুদের সমুদ্রের তুফান থেকে কিনারায় ফিরে আসা, আমাদের হজরতগণ যাঁদের রিয়াজত হচ্ছে সুন্নতের এত্তেবা— যাঁরা শরীয়তের হাকীকতের আসরার (রহস্য) সম্বন্ধে অবগত আছেন, তাঁদের নেসবতের প্রতি আরজু রাখা ইত্যাদি হচ্ছে আত্মিক পবিত্রতা, আত্মিক অন্বেষণ এবং উচ্চ হিম্মতের দলিল । আল্লাহ্তায়ালা আপনার বরকত বৃদ্ধি করুন এবং আপনার মর্যাদা সমুন্নত করে দিন ।

মান্যবরেষু! আপনি আমার বুজুর্গ পিতা এবং মিঞা হিম্মত খান সাহেবের কাছ থেকে যে উপকার লাভ করেছেন— সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ওয়ারেদাত (আত্মিক প্রাপ্তি), বিস্ময়কর হালসমূহ, গায়েরের মূলোৎপাটন এবং ওয়াহ্দাতের বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কে যা লিখেছেন, এ সবই কলব লতিফার নমুনা । এ হচ্ছে স্থিরতার মাকাম । এ লতিফার শেষ সীমা হচ্ছে দায়েরায়ে এমকান (সম্ভাব্য জগতের বেষ্টনী) এর বাইরে আসা এবং ওজুবের ভূমিকার প্রান্তরে এসে আসমা ও সিফত (নাম ও গুণাবলী) এর প্রতিবিম্বে সায়ের করা— যা সৃষ্টিজগতের মাবদায়ে তাআইয়্যুন (নির্ধারণের মূল) । এখানে এসে বিশেষ প্রতিবিম্বে তাআইয়্যুনে আমরের যে মাবদা তা ফানা হয়ে যায় । এ প্রতিবিম্ব থেকেই বাকা হাসিল হয় । সুফী সম্প্রদায়ের পরিভাষায় এ অবস্থাকে বলা হয় কলবের ফানা এবং এর মাধ্যমে হাসিল হয় বেলায়েতে সোগরা— যা ওলীগণের বেলায়েত । বেলায়েতে যিল্লী (প্রতিবিম্বজাত বেলায়েত) যা সোকর (মওতা) এর মহল, তা থেকে ওয়াহদাতুল ওজুদের মারেফতের উৎপত্তি হয় । এ মাকামে আসার পর কলবের অধীন হয়ে নফসেরও ফানা হাসিল হয় এবং উভয়েই সম রঙে রঞ্জিত হয়ে যায় । এই বেলায়েত হাসিল হওয়ার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার দায়েমী হুজুরী (সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণ) যার মধ্যে কখনও গাফলত আসে না এবং অন্য কারও সাথে সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকে না । এ মাকামের

উপরে আরেকটি মাকাম আছে, যেখানে সালেকের সায়ের (আত্মিক ভ্রমণ) হয় প্রতিবিম্বের মূলে— যার নাম আসমা ও সিফত। এ সায়েরটি নফস লতিফার সাথে সম্পৃক্ত— যা আলমে খালকের বস্তু। ইতোপূর্বে কলব ও তার সাথে আরও চারটি (রূহ, সের, খফী ও আখফা) লতিফার মধ্যে সায়ের হয়েছিলো— যা আলমে আমরের বস্তু। সে সায়েরের উরুজ হয়েছিলো প্রতিবিম্বের মারকায (কেন্দ্র) পর্যন্ত। এই সায়েরে এসে নফসের প্রকৃত ফানা হাসিল হয়। নফসে আম্মারা নফসে মুত্মায়িন্নায় পরিণত হয়। মোখালেফ দুশমন (নফস) মোয়াফেক বন্ধুতে পরিণত হয়ে যায়। তখনই সালেক দাওয়াত ও এরশাদের অধিকার প্রাপ্ত হয়। এ মাকাম হচ্ছে ফরক বাদাল জমা'র শেষ সীমা। এ মাকামে বিশুদ্ধ তমিজ হাসিল হওয়ার কারণে সালেক ওয়াহদাতুল ওজুদ থেকে ধারণাকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়। তখন সে মাখলুককে হক তায়ালা থেকে অপর বলে বুঝতে পারে। এ মাকামে পৌঁছার পর সালেক ওই সকল বিষয়ের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়, আল্লাহ্তায়ালা যা পছন্দ করেন। আর বর্জন করতে সক্ষম হয় ওই সকল বিষয়, আল্লাহ্তায়ালা যেগুলোর প্রতি অসন্তুষ্ট। সালেকের অবস্থা তখন এমন হয় যে, কোনো আমল করার ক্ষেত্রে কায়ক্লেশের প্রয়োজন হয় না। শরীয়ত মোতাবেক আমল করা তার স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়ে যায়। তখন কিতাব ও সুন্নতের আকীদা ও আমল তার চিন্তা–ফিকির ব্যতিরেকেই হতে থাকে। সালেক তখন শরীয়ত প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এহতিয়াত (সতর্কতা) প্রাপ্ত হয়। এই মাকামকে নফসের ফানা এবং বেলায়েতে কোবরা বলা হয়— যা আম্বিয়া কেরামের বেলায়েত। রসুলেপাক স. এর অনুসরণের বরকতে উম্মতের বিশেষ ও সাধারণ ব্যক্তিবর্গ এই মাকাম হাসিল করতে পারেন। এখানে এসে সালেকের আসমা ও সিফতের পূর্ণতার মধ্যে সায়ের হতে থাকে, যা ইসিম আয্যাহেরের সাথে সম্পর্ক রাখে। এই বেলায়েতের ঊর্ধ্বে ফেরেশতাদের বেলায়েত। একে বেলায়েতে উলিয়া বলা হয়। এখানে ইসিম আল বাতেনের পূর্ণতার মধ্যে সায়ের হয়। বেলায়েত অর্জন করার ফায়দা হচ্ছে সালেকের মধ্যে জাতের তাজাল্লি ধারণের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। এর চেয়ে উচ্চতর মাকাম হচ্ছে নবুওয়াত ও রেসালতের কামালাতের মাকাম। এ মাকামে আল্লাহ্তায়ালার যাত থেকে ইসিম ও সিফতসমূহ পৃথক হওয়া অসঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও শুধু যাত পাকের তাজাল্লী আরেফের নিকট প্রকাশ পায়। এখানে চার আনাসের (মৌলিক বস্তু) আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস– যা নফস লতিফার মূল, তার সাথে ওয়াসেতা (মাধ্যম) সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ বেলায়েতে উলিয়াতে মাটি ছাড়া অন্য তিনটির সাথে এবং কামালাতে নবুওয়াতে শুধু মাটির সাথে ওয়াসেতা (মাধ্যম) সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ উচ্চতর যাত পাকের শান ও এতেবার (অবস্থা ও ধার্যকরণ) সমূহের সাথে ওয়াসেতা সৃষ্টি হয়। এই কামালতসমূহের উপরেও বিভিন্ন

মাকাম আছে। যথাস্থানে সে সম্পর্কে আলোচিত হবে। এ পথে সবচেয়ে কঠিন কাজ কলব ও নফসের ফানা হাসিল করা। অন্যান্য স্তরসমূহে উপনীত হওয়া নির্ভর করে এই দুই প্রকারের ফানা লাভের উপর। উল্লেখিত মাকামসমূহের প্রত্যেক মাকামেই উরুজ (ঊর্ধ্বারোহণ) যাওয়াল (অবতরণ) ফানা (লয়) ও বাকা (স্থিতি) আছে। আমার এই নিবন্ধ মোজাদ্দেদিয়া তরিকার বুজুর্গগণের তাহ্কীক এবং পূর্ববর্তী আকাবেরগণের পছন্দ ও রুচি মোতাবেক লেখা হলো[৮১]। তবে অন্যান্য তরিকার মাশায়েখগণও এ সম্পর্কে সম্ভাবনার মত পোষণ করেন, যা সালেকগণের আত্মিক আস্বাদ গ্রহণে সহায়ক হতে পারে। এই পদ্ধতিতে সুলুকের পূর্বে জযবা হয়ে থাকে। যাই হোক, এ পদ্ধতিতে শায়েখের উপকার প্রদানকারী নফসের তাছীর মুরিদের বাতেন জগতে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে পারে। অবশ্য যোগ্যতার তারতম্য অনুসারে উপকার প্রদানকারী নফসেরও প্রকার ভেদ হয়ে থাকে।

আপনার সাথে মোলাকাতের খুবই বাসনা আছে। আল্লাহ্তায়ালা আমাকে এবং আপনাকে ক্ষমা করুন। ওযাস্ সালাম।

শাহ্ আবুল ফাতাহ্ এর নিবেদন

মকতুবটি যাঁর কাছে প্রেরণ করা হয়েছিলো, তাঁর লিখিত পত্রের সারমর্ম এখানে তুলে ধরা হচ্ছে, যার মধ্যে চিশ্তিয়া তরিকার কতিপয় উপকারের বিষয় সন্নিবেশিত আছে। তন্মধ্যে চিশ্তিয়া তরিকার শোগল সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, এ শোগলের মধ্যে অধিক পরিমাণে অনুশীলনের কারণে সীনার গভীরে মৌমাছির গুঞ্জরণের মতো অবিভাজ্য একটি আওয়াজ অনুভূত হয়— যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি সে আওয়াজ সনুবর বৃক্ষ সদৃশ কলবের হরকতের মধ্যে গালেব (প্রবল) হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ্ জাল্লাজালালুহুর ইসমে জাত বিশুদ্ধভাবে উক্ত আওয়াজের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। ক্রমান্বয়ে সে আওয়াজ অধিক অবিভাজ্য হয়ে গিয়েছে। আওয়াজটি কলব থেকে শুরু করে রূহ এর মাকাম পর্যন্ত একাধারে দীর্ঘ আওয়াজের সৃষ্টি করেছে। এমনকি আওয়াজটি সম্পূর্ণ সীনাকে অধিকার করে নিয়েছে। কিছু দিন যেতে না যেতেই সে আওয়াজ প্রবল হয়ে সমস্ত শরীরে বিস্তৃত হয়ে গিয়েছে। এমন কি তাওয়াজ্জোহের সময়ও এক চুল পরিমাণ তা থেকে মুক্ত থাকে না। সে আওয়াজ আমাকে এমন পরাভূত করে দিয়েছে যে, সৃষ্টিগত কার্যাবলীতেও বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় কোনো কিছুর কল্পনাও চলে গিয়েছে। যাতে পাকের সায়ের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জাগতিক চোখে দৃশ্যমান থাকে। যখন এমন হাল থেকে সামান্য সময়ের জন্য

স্বস্তি ফিরে আসে, তখন বিস্ময়কর অবস্থা এবং নতুন নতুন কাশফ জাহের হতে থাকে। এমতাবস্থায় কোনো কবরের প্রতি তাওয়াজ্জোহ প্রদান করলে ওই কবরবাসীর অবস্থা উন্মোচিত হয়ে যায়। ভবিষ্যতের কোনো বিষয় নিয়ে যদি চিন্তা করি তাহলে হুবহু তা জ্ঞাত হয়ে যাই। যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির প্রতি তাওয়াজ্জোহ প্রদান করলে সে তার অন্তরে তার প্রতিক্রিয়া এবং উত্তাপ অনুভব করে। ইতোপূর্বে রূহ এর জিকির আমার সামান্য লাভ হয়েছিলো। এখন সেই জিকিরও উক্ত আওয়াজের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এখন কলব এবং রূহ এর জিকিরের মধ্যে পার্থক্য করা মুশকিল হয়ে গিয়েছে। যেমন আল্লাহ্পাক বলেছেন— 'মারাজাল বাহরাইনে ইয়ালতাক্বিয়ান' (তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া যারা পরস্পর মিলিত হয়)[৮২]।

মকতুব—২৩

তওহীদে ওজুদীর মাসআলার বর্ণনা

জেনে রাখা উচিত, মারাতেবে সেত্তা কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থে[৮৩] বলা হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর কাদীম এলম দ্বারা সবকিছুর হাকীকত সামগ্রিক এবং আংশিক দু'ভাবেই জানেন। কোনো জিনিসের এলেম দ্বারা একথা সাব্যস্ত হয় যে, উক্ত জিনিসের মধ্যে এলেমের বিষয় বিদ্যমান আছে। সুতরাং সাব্যস্ত হয়, বিদ্যমান সকল বস্তু আল্লাহ্তায়ালার এলমে আযলীতে বিদ্যমান। এ কারণেই বলা হয় 'সকল বস্তুর অস্তিত্ব এলেমের মধ্যে সুসাব্যস্ত'। এই এলেমের স্তর সুফীগণের পরিভাষায় যাকে বলা হয় বাতেনে ওজুদ— এখানে বস্তুসমূহের অস্তিত্বের মধ্যে কালের অগ্র-পশ্চাৎ নেই। এর বিপরীত হচ্ছে ওজুদে খারেজী, যাতে অগ্র-পশ্চাৎ হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট। কারণ ওজুদে এলমী ওজুদে খারেজী থেকে ভিন্ন এবং ওজুদে এলমী ওজুদে খারেজীর পূর্বে। যেমন মূল, শাখার উপর এবং বস্তু, প্রতিবিম্বের উপর অগ্রগণ্য। কোনো বস্তু ওজুদে এলমী থেকে ওজুদে খারেজীতে আসার অবস্থা হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালা যখন ইচ্ছা করেন, তাঁর এলমে থাকা কোনো বস্তুর আকৃতিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, যাকে ওজুদে মুম্বাসাত (বিস্তৃতিমূলক অস্তিত্ব) বলা হয়। সুফীগণের পরিভাষায় একে বলা হয় জাহেরী ওজুদ। তখন আল্লাহ্তায়ালা সুরতটির আছারে মাতলুক (বঞ্চিত প্রতিক্রিয়া)কে আকৃতি দ্বারা প্রকাশ করেন। আর উক্ত সুরত এবং ওজুদের নূরের মধ্যে এমন একটি সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেন, যা স্মৃতিতে স্থিত হয়, কিন্তু তার ধরন-ধারণ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায় না। ওজুদে মুম্বাসাতের দর্পনটি সুরতের প্রতিবিম্ব দ্বারা নকশা করে দেয়। নকশাটি ওজুদবিহীন হয় না। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'ওয়া লিল্লাহিল মাছালুল

আ'লা' (আর আল্লাহ্ তো মহত্তম প্রকৃতির)[৮৪] । যেমন আয়না দর্শনকারীর প্রতিবিম্ব আয়নার সামনে আসার পর তাতে প্রতিবিম্বিত হয় এবং তাতে আয়নার নূর দূরীভূত হয় না । একজন জ্ঞানবান ব্যক্তি চিন্তা ভাবনার পর দৃশ্যমান আকৃতি যা পরস্পরে মিলিত অর্থাৎ অবয়ব, বর্ণ, আকার ও আয়তন ইত্যাদি দেখার পরে একথা বলতে পারে না যে, আকৃতির মধ্যে বস্তুটির উপস্থিতি নেই । সর্বসাধারণ মনে করে, দৃশ্যমান বস্তুর সুরত এবং তার সিফত একই । বস্তুতঃপক্ষে দৃশ্যমান সুরত যা আয়নার মধ্যে দেখা যায় এবং আয়না প্রত্যেকটি একে অপরের পরিপূরক । অর্থাৎ সুরত না থাকলে আয়নায় ছবি দেখা যায় না এবং আয়না না থাকলে সুরতের ছবিও দেখা যায় না । মাওলানা জামী তাঁর মারাতেবে সেত্তা কিতাবে বলেছেন, ওজুদকে যদি দৃশ্য মনে করা হয়, তাহলে তার মধ্যে সুরতে এলমিয়ার (আল্লাহ্র জ্ঞানের মধ্যে যে সুরত) নমুনা এবং বিধান পাওয়া যাবে । হুবহু সেই সুরতটি পাওয়া যাবে না । কেনোনা আইনে ছাবেতা (নির্ধারিত মূল) যা আল্লাহ্পাকের এলমে বিদ্যমান, তা খারেজে (সৃষ্টিজগতে) বিদ্যমান হওয়া তো দূরের কথা, তার গন্ধও পাওয়া যাবে না । সুরতে এলমিয়াকে যদি দৃশ্য সাব্যস্ত করা হয়, তবে তার মধ্যে আছে আসমা ও সিফতের তাজাল্লী— এবং আল্লাহ্পাকের ওজুদের শুয়ুনাত— হুবহু ওজুদ নয় । সুতরাং দৃশ্য হচ্ছে এলেমের ভাণ্ডারের ন্যায়— যা মুদ্রিত পৃষ্ঠার মতো । তারই মোকাবেলায় ওজুদে মুম্বাসাত (বিস্তৃত ওজুদ) হচ্ছে পরিষ্কার আয়নার মতো । উক্ত পৃষ্ঠা থেকে কোনো মুদ্রণ বাইরে যেতে পারে না এবং কোনো দৃশ্যের ছবিও তার বাইরে দেখা যাবে না । কেনোনা মর্তবায়ে এলেম এলেমের সুরতে বেরিয়ে আসা দ্বারা জাহালত অবধারিত হয় । আর ওজুদের দৃশ্যে সুরত প্রবেশ করা দ্বারা কাদীম (অনাদী) রূপান্তরিত হয় হাদেছে (ধ্বংসশীলতায়) । এ দুটি অবস্থাই অসম্ভব । এ জন্য বাতেনের ওজুদ ও জাহেরে ওজুদের মধ্যে আছার (নমুনা) ও আহকাম (বিধান) এর একটি প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় । সুফীগণের পরিভাষায় তাকেও হাম (ধারণা) এবং দায়রায়ে ইমকান (সম্ভাব্যের বৃত্ত) বলা হয় । এর মধ্যে পাঁচটি বিখ্যাত তানাজ্জুল (অবতরণ) থেকে তিনটি তানাজ্জুলে এমকানী (সম্ভাব্য অবতরণ) পাওয়া যায় । সে তিনটি তানাজ্জুল হচ্ছে ১. তানাজ্জুলে রূহী (আত্মার অবতরণ) ২. তানাজ্জুলে মিছালী (উদাহরণগত অবতরণ) এবং ৩. তানাজ্জুলে জাসাদী (দেহগত অবতরণ) । মর্তবায়ে এলেমে ওয়াজেবী (অপরিহার্য এলেমের স্তর) এর মধ্যে দু'টি ওজুবী তানাজ্জুল (অপরিহার্য অবতরণ) রয়েছে । অর্থাৎ ওয়াহদাত (একক ও অবিভক্ত হওয়া) এবং ওয়াহেদিয়াত (একজন হওয়া) । মর্তবায়ে এলেমে আল্লাহ্র শান ও সিফতসমূহকে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে প্রত্যক্ষ করে । বলা হয়ে থাকে, খারেজে (বহির্জগতে) এক ওজুদ ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর বাস্তবতা নেই । দৃষ্টিগ্রাহ্য অনেক দৃশ্য মূলতঃ

কেবল ধারণায় বিদ্যমান। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর পরিপূর্ণ হেকমতে এই ধারণার স্তরটিকে শক্তিশালী করে দিয়েছেন এবং তার উপর চিরস্থায়ী ফলাফলের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এটি ওই প্রকারের ধারণা নয়, যা ধারণা উঠে যাওয়ার পর দূরীভূত হয়ে যায়। এ স্তরটির উপর ধারণা শব্দ ব্যবহার করার বিষয়ে সুফী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে এর কাছরতের (আধিক্যের) কোনো বাস্তবতা নেই। সমস্ত ওজুদই এক ওজুদে মুম্বাসাত (বিস্তৃত ওজুদ) এর দর্পণে তা তাজাল্লীপ্রাপ্ত হয়ে কাছরত (আধিক্য)রূপে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তাজাল্লীসমূহের আধিক্যের উদ্দেশ্য আল্লাহ্তায়ালার শানসমূহের অধিক্যের বহিঃপ্রকাশ হওয়া, যে শানসমূহ ওজুদের মধ্যে বিদ্যমান, তা এলেমের স্তরে উন্মোচিত হয়। যেমন বীজ থেকে অংকুরোদ্গম ঘটে বৃক্ষের, এমতো উন্মোচনের মাধ্যমেই মোমকেনাত (সম্ভাব্য বস্তুসমূহ) বাস্তবে পরিণত হয়। হাকীকতের প্রতিবিম্ব যখন ওজুদের দৃশ্যে বিস্তৃতি লাভ করে, তখন তাকে আলম বলা হয়। এছাড়া বস্তুসমূহে ধারণাগত ওজুদের কোনো বাস্তবতা নেই। বরং তা ওজুদে এলমীর প্রতিবিম্ব মাত্র। মূলের ক্ষেত্রে সব কিছুই ওজুদে এলমীর মধ্যে বিদ্যমান। এলেমের স্তর থেকে বের হয়নি— যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। আর এলেম আল্লাহ্র সিফতসমূহের মধ্যে একটি সিফত। সুফী সম্প্রদায়ের নিকট ওজুদ হচ্ছে স্বয়ং যাতে পাকের সিফত। এ পরিপ্রেক্ষিতে এই বর্ণনা অনুসারে বস্তুসমূহের ওজুদ হক তায়ালার আইনে ওজুদ। কাজেই হজরত শায়েখে আকবর ইবনে আরাবী র. বলেছেন, যদি চাও তাহলে সৃষ্টির অস্তিত্বকে হক তায়ালা বলতে পারো। আর যদি চাও, তাহলে তাকে বলতে পারো মাখলুক। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, খারেজে (বহির্জগতে) এক ওজুদ ছাড়া আর কিছুই নেই। এই হচ্ছে ওয়াহদাতুল ওজুদের তাৎপর্য। এই হচ্ছে উক্ত হজরতগণের কাশ্ফ্ এবং আত্মিক দর্শনের বিবরণ।

মকতুব—২৪

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর নাতী আবদুল আহাদ র. এর মুরিদানের নামে লিখিত

এ মকতুবে কাইয়্যুমে জামানী ইমামে রব্বানী হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর তরিকার সুলুক সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এ রকম— দশটি অংশের সম্মিলনে সৃষ্ট হয়েছে মানুষ। এগুলোর নাম দেয়া হয়েছে দশ লতিফা। পাঁচটি আলমে খালকের (স্থূলজগতের)– নফস এবং আরবায়ে আলমের আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস। আর পাঁচটি আলমে আমরের (সূক্ষ্ম জগতের)। ওই জগত দৈহিক বৈশিষ্ট্য এবং উপাদানসমূহ থেকে পবিত্র। আর ওই পাঁচটি লতিফা

হচ্ছে— কলব, রূহ, সের, খফী ও আখফা। আল্লাহ্‌তায়ালা আলমে খালকের অংশগুলো দ্বারা মানুষের অবয়ব সৃষ্টি করার পর আলমে আমরের পাঁচটি লতিফা মানব দেহে যথাস্থানে স্থাপন করে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। এই পাঁচটি লতিফার প্রতিটি আরশের উপর লামাকানীর গুণে গুণান্বিত। এতে করে মানব দেহ আলমে খালক এবং আলমে আমরের সমন্বয়কারী এবং আলমে সগীরে পরিণত হয়েছে।

এই তরিকায় প্রথমে ওই লতিফার আমলে নিযুক্ত করা হয়, যা বাম স্তনের মাংসের একটি টুকরা। এর নাম কলব সনুবরী। এ লতিফায় জিকির শোগল করার নিয়ম হচ্ছে— সালেক কলব সনুবরীর প্রতি মনোনিবেশ করবে। গোশতের এ টুকরাটিকে সালেক হুজরার ন্যায় মনে করবে, যার সাথে এ লতিফা সম্পর্কযুক্ত। আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র নাম 'আল্লাহ্' তার মধ্যে জারী হবে। তখন সালেক তার শ্বাস নাভির নিচে থামিয়ে জিহবাকে তালুর সঙ্গে স্থাপন করে সমস্ত অনুভূতিকে একত্র করে মনোনিবেশ করবে কলব সনুববীর দিকে। জিকিরের সময় ইসমে জাতকে বেচুঁ (আনুরূপ্যহীন) এবং বেচুগুনী (রকমবিহীন) গুণে খেয়াল করবে। শুধু 'আল্লাহ্' খেয়াল করবে। তাঁর কোনো সিফত যেমন সামী, বাসীর, হাজের, নাজের ইত্যাদির প্রতি খেয়াল করবে না। শ্বাসকে ওই সময় পর্যন্ত আবদ্ধ রাখবে, যতক্ষণ না হুজুরীর মধ্যে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। এভাবে সব সময় আমল করতে থাকবে, যেনো ওঠা-বসা, পানাহার, কথা বলা এবং নিদ্রা অবস্থায়ও তাঁর খেয়াল বিদ্যমান থাকে। ধেয়ান ও খেয়ালের সাথে এ আমল করার উপর যদি চেষ্টা করা হয়, তাহলে আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে উত্তাপ ও আগ্রহ-উদ্দীপনা অর্জিত হবে। আমলের প্রতিফল ও নূরসমূহ আরোপিত হতে শুরু করবে। কলবের নূরের বর্ণ হলুদ নির্ধারণ করা হয়েছে। এই আমলের দ্বারা ফানা, আত্মবিস্মৃতি এবং অদৃশ্য বিষয় হাসিল হয়। অদৃশ্য সম্বন্ধীয় হালের মধ্যে সালেকের যোগ্যতা অনুসারে যৎসামান্য কাশ্‌ফ্‌ও (আত্মিক দর্শন) হয়ে থাকে। এ লতিফায় সাধনার পূর্ণতা হচ্ছে সালেক আল্লাহ্‌তায়ালার ফেলের (কার্যাবলীর) মধ্যে ফানা হয়ে যায় এবং তাঁর ফেলের মধ্যেই বাকা (স্থিতি) লাভ করে। তখন সালেক কর্মতৎপরতা থেকে নিজেকে মুক্ত মনে করে। তার জ্ঞান ও দর্শনে থাকে কেবলই আল্লাহ্‌তায়ালা। সে তখন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব কিছু ভুলে যায়। এ বিস্মৃতি কারও মধ্যে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত বিরাজ করে। আবার কারও সারাজীবনই বিদ্যমান থাকে। এমনকি তাকে যদি স্মরণ করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়, তবুও স্মরণে আসে না। সালেক তখন বেলায়েতের দায়েরায় (বলয়ে) প্রবেশ করে। এ স্তরকে তাজাল্লিয়ে ফেলী বা ফানায়ে কলব বলা হয়। এ লতিফার বেলায়েত হজরত আদম আ. এর পদতলে অবস্থিত। আদমিউল মাশরাব ব্যক্তি এই লতিফার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করে। এই লতিফায় সুলুককারীর সুলুক সমস্ত লতিফায় হয় না। তবে কামেল হিম্মত থাকলে তা সম্ভব হতে পারে।

তারপর রূহ লতিফার উপর আমল করা হয়। ডান পাশের স্তনের নিচে এ লতিফার স্থান। এ লতিফায় আল্লাহ্তায়ালার সিফতসমূহের মধ্যে ফানা এবং বাকা হাসিল হয়। এ মাকামের সুলুকের সময় সালেক তার নিজের মধ্যে কোনো গুণাবলী দেখতে পায় না। যাবতীয় গুণাবলী আল্লাহ্র দিকে সম্বন্ধিত দেখতে পায়। শ্রবণশক্তি বা দৃষ্টিশক্তি প্রভৃতি গুণাবলী সম্পর্কে সে মনে করে যে, আল্লাহ্তায়ালাই দেখেন, তিনিই শুনেন। তার নিজের শ্রবণ করার বা দর্শন করার কোনো ক্ষমতা নেই। উক্ত হাল অর্জন করাকে তাজাল্লিয়ে সিফত বলা হয়। এ লতিফার নূরের রঙ লাল। এ লতিফার বেলায়েত হজরত ইব্রাহীম আ. এর পদতলে অবস্থিত। সুতরাং যে ইব্রাহীমি মাশরাব, সে কলব লতিফা অতিক্রম করার পর রূহ লতিফার মধ্যে এসে আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে মিলন লাভ করে। তারপর সের লতিফার আমল শুরু হয়। এ লতিফার স্থান বাম স্তনের উপরে। এ লতিফায় শুয়ুনাতে যাতিয়ার (আল্লাহ্র জাত পাকের শানসমূহের) মধ্যে ফানা ও বাকা হাসিল হয়। এ লতিফার নূর শ্বেত-শুভ্র হয়ে থাকে। এ লতিফার বেলায়েত হজরত মুসা আ. এর পদতলে অবস্থিত। মুসাবিউল মাশরাবগণ এই লতিফায় এসে আল্লাহ্তায়ালার মিলন লাভ করে।

তারপর খফী লতিফার আমল শুরু হয়। এ লতিফার স্থান ডান স্তনের উপরে। সিফতে সালবিয়ার (অধিকৃত গুণাবলীর) মধ্যে এই লতিফার ফানা হাসিল হয়। এ লতিফার নূর কৃষ্ণবর্ণের হয়ে থাকে। এ লতিফার বেলায়েত হজরত ঈসা আ. এর পদতলে অবস্থিত। যে সকল সালেক ঈসাবিউল মাশরাব তারা পূর্ববর্তী মাকামসমূহ অতিক্রম করার পর এই লতিফার মাধ্যমে বারেগাহে এলাহীতে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

এরপর লতিফায়ে আখফার আমল শুরু হয়। এই লতিফার স্থান বুকের মাঝখানে। বরযখী স্তরে তানযিয়াহ্ (পবিত্রকরণ) এবং খালেস আহাদিয়াতের স্তরে এই লতিফার ফানা হাসিল হয়। এই লতিফার নূর সবুজ বর্ণের। এই লতিফার বেলায়েত সাইয়্যেদুল মুরসালিন স. এর কদমপাকের নিম্নে অবস্থিত। মোহাম্মদিউল মাশরাবগণ এই লতিফার উসিলায় বারেগাহে এলাহিতে উপনীত হতে পারেন।

পূর্ববর্তী স্তরসমূহ অতিক্রম করার পর কলব লতিফা সিফতের প্রতিবিম্বের তাজাল্লীর অংশ পেয়ে থাকে। তখন বেলায়েতে সোগরা, যা আওলিয়া কেরামের বেলায়েত তার প্রতিবিম্বের মধ্যে সালেকের সায়ের সুলুক হয়ে থাকে। আর নফস লতিফা, যা সিফতের তাজাল্লীপ্রাপ্ত হয়েছিলো, তা তখন বেলায়েতে কোবরা, যা নবীগণের বেলায়েত— তার মধ্যে সায়ের করতে থাকে। আনাসেরে আরবাআ (চার মৌলিক পদার্থ— আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস) এর মধ্য থেকে মাটি

ব্যতীত অন্য তিনটিতে সিফতের তাজাল্লী হিসাবে ইসমে বাতেনের অংশ প্রতিফলিত হয়। আর নফসের মধ্যে ইসমে জাহের হিসাবে সিফতের তাজাল্লী প্রতিফলিত হয়। এখানে এসে সালেক ফেরেশতাগণের বেলায়েত বেলায়েতে উলিয়ার সায়ের শুরু করে। তখন সালেকের মাটির অংশের মধ্যে জাতের তাজাল্লী প্রতিফলিত হয়। কেনোনা এই মাকাম কামালতে নবুওয়াতের মাকাম।

দশ লতিফার পূর্ণতা হাসিল এবং ফানা লাভের পর সালেকের পথচলা শুরু হয় হায়াতে ওয়াহ্দানী (জাত ও সিফতের সম্মিলিত একক অবস্থা) এর উপর। পাঁচটি লতিফা যখন আলমে আমর থেকে পৃথক হয়ে আলমে খালকের লতিফার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়— আর আলমে খালকের লতিফা হচ্ছে নফস এবং চারটি মৌলিক পদার্থ— তখন প্রথমেই নফসে মুতমায়িন্না হাসিল হয়। অতঃপর রেজা (সন্তুষ্টি) হাসিল হয়। তারপর হাসিল হয় প্রকৃত ইসলাম। তারপর সালেকের সায়ের শুরু হয় চার মৌলিক পদার্থের মূলে। তারপর কামালাতে নবুওয়াতে কোরআনে করীমের হরুফে মোকাত্তাআতের কাশফ ও মোতাশাবেহ্ আয়াতসমূহের মারেফত হাসিল হয়। তারপর হাসিল হয় কামালাতে রেসালত এবং কামালাতে উলুল আজম।

জেনে রাখতে হবে যে, লতিফাসমূহের ফানার জন্য নফী ইসবাতের জিকির করতে হবে। জিকির করতে হবে এভাবে— পূর্বের নিয়ম অনুসারে নিঃশ্বাস বন্ধ করে 'লা' শব্দটি নাভী মূল থেকে টেনে নফসের মাকাম মস্তক পর্যন্ত পৌঁছাবে। তারপর 'ইলাহা' শব্দ ডান দিকে এনে 'ইল্লাল্লহ' এর জবর দিবে কলবের উপর। তা এমনভাবে করতে হবে যেনো তার প্রবাহ সীনায় অবস্থিত সমস্ত লতিফার উপর দিয়ে চলে যায়। জিকির করার সময় প্রত্যক্ষ করতে হবে যে— অতুলনীয় সত্তা ব্যতীত আর কোনো কিছুই তার মকসুদ এবং মাবুদ নেই। এ পদ্ধতিতে জিকির করাকে 'বাজেগাশত্' বলা হয়। এক নিঃশ্বাসে জিকিরের সংখ্যা যখন একুশ হবে, তখন থেকে প্রত্যেক দিন এভাবেই জিকির করে যাবে। এভাবে দৈনিক এক হাজার জরব দিতে হবে। তবে তা নির্দিষ্ট শর্ত অনুসারে করতে হবে। তবেই ফানার ফল লাভ করা সম্ভব হবে।

দাদীমতর আজ গঞ্জে মকসুদ নিশা
মাগের নারাসীদম তু শায়েদ বরসী

(আমি তোমাকে আকাংক্ষিত গঞ্জের সন্ধান দিয়েছি। আমি যদি সে পর্যন্ত পৌঁছতে নাও পারি। আশা করা যায় তুমি তা লাভ করতে সক্ষম হবে)।

এই কিতাবের লেখক ফকীর (শাহ গোলাম আলী) বলেন, এই তরিকার শেষ যুগের সালেকগণের ফেরাসাত না থাকার কারণে জিকিরের নড়াচড়া বিষয়ে অনুভব

করার পর দশলতিফা মূলতঃ যা সাত লতিফায় সাজানো হয়েছে, এখানে কলব লতিফাকে সুসজ্জিত ও সুমার্জিত করার পর নফস লতিফাকে সুসজ্জিত ও সুমার্জিত করার বিধান গ্রহণ করা হয়েছে। কেনোনা এই দুই লতিফার সায়ের করার মাধ্যমে আলমে আমরের চার লতিফা— রূহ, সের, খফী ও আখফা এর ফানা, বাকা এবং উরুজ তার মূল থেকে হাসিল হয়ে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে তার পূর্ণতার দিকে পৌঁছে যায়। ইসমে জাতের জিকিরে নিঃশ্বাস বন্ধ করা হজরত মাযহার র. এবং তাঁর অনুসারীগণের মধ্যে ছিলো বলে আমি শুনিনি। এক্ষেত্রে কলবের নড়াচড়া করাও অপরিহার্য কোনো বিষয় নয়। জিকিরের মকসুদ তো কেবল আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে পূর্ণ মনযোগ স্থাপন করা। এই মকতুবের মধ্যে যেহেতু অনেক উপকারিতা ছিলো, তাই তা লিপিবদ্ধ করা হলো। আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য সমস্ত প্রশংসা, তিনি যে রকম ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন। দরূদ ও সালাম সাইয়্যেদেনা মোহাম্মদ স. ও তাঁর আল ও আসহাবের উপর। আমিন।

তথ্যপঞ্জি

১। হজরত শায়েখ আবদুল আহাদ, তাঁর লকব ছিলো শাহ্‌গুল। তিনি মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর পুত্র হজরত খাজা মোহাম্মদ সাঈদের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

২। আল কোরআন (আলে ইমরান, ৩/৬০)

৩। মাসুম হওয়া কেবল আম্বিয়া কেরামের বৈশিষ্ট্য। আম্বিয়া কেরাম মাসুম— এ বিষয়ে উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন পুস্তিকায় লিখেছেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. বলেছেন, আম্বিয়া কেরাম, যাঁরা গোনাহ্‌সমূহ থেকে মাসুম ও পবিত্র ছিলেন, তাঁদের থেকে গোনাহ্ প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাব্যতাও ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিলো। মকতুব ২/৪৪।

৪। তওহীদে শুহুদী মতবাদের সুফিগণ এ বিষয়ে যা আলোচনা করেছেন, তা বিস্তারিত জানার জন্য তাঁদের রচনাবলী পাঠ করা যেতে পারে।

ক) খাজা মোহাম্মদ পারছা র. এর রচিত রেসালাতে কুদ্দুসিয়া— প্রকাশকঃ আহমদ তাহেরী ইরাকী, ছাপা তেহরান এবং প্রকাশকঃ মালিক মোহাম্মদ ইকবাল, ছাপা রাওয়ালপিণ্ডি।

খ) তাহকীকাত এস্তেলাহাতে সুফিয়া, ফকীরুল্লাহ উলুববী শিকারপুরী।

গ) মকতুবাত শরীফ— হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানির মকতুব নং ১৬৭/১।

ঘ) শেফাউল আলীল— শাহ ওলিউল্লাহ্। অনুবাদঃ কওলুল জামীল ছাপা, আহমদী ছাপাখানা ৭ম অনুচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ৬৮।

ঙ) এরশাদুত্তলেবীন– কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী। পৃষ্ঠা ১২।

চ) ইজাহুত্তরিকা, শাহ্‌গোলাম আলী দেহলভী, পৃষ্ঠা ৬১।

৫। সুফিয়ানে কেরাম পরিভাষা হিসেবে এলেমের বর্ণনা দিয়ে তার কয়েকটি প্রকার উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে জানতে হলে পাঠ করা যেতে পারে—

ক) আবু বকর মোহাম্মদ কেল্লাবাজী রচিত আত্তাআরুফু লিমাযহাবে আহলেত্তাসাউফ। কায়রো– রচনা কাল ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ পৃষ্ঠা ৮৬–৮৯।

খ) খাজা আবদুল্লাহ হারবী আনসারী রচিত মানাযেরুস্ সায়েরীন, প্রকাশক রওয়ান ফরহাদী, কাবুল পৃষ্ঠা ১৩০, ৩৯৪, ৩৯৫।

গ) সোহরাওয়ার্দী রচিত মেসবাহুল হেদায়া ওয়া মেফতাহুল কেফায়া পৃষ্ঠা ৩৪, ৫৩।

ঘ) ইমাম আবুল কাসেম কুশায়রী রচিত রেসালায়ে কুশায়রিয়া, পৃষ্ঠা ৩৭১।

ঙ) গঞ্জে বখশ লাহোরী রচিত কাশফুল হুজুব, পৃষ্ঠা ১৯।

চ) ফকীরুল্লাহ উলুব্বী শিকারপুরী এর মকতুব ৭/৭৬।

৬। মুফতী মোহাম্মদ বাকের কানযুল হেদায়াত কিতাবে, মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. তাঁর মকতুবাত ও অন্যান্য পুস্তিকায়, খাজা মোহাম্মদ মাসুম তাঁর মকতুবাতে মাসুমিয়ায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাছাড়া নজমুল গনী রামপুরী এলমে হুজুরী ও হুসুলী প্রসঙ্গে সুফিয়ানে কেরামের বিভিন্ন উক্তি একত্র করেছেন। এ বিষয়ে পাঠ করা যেতে পারে কানজুল হেদায়াত এবং তাযকেরাতুস্ সুলুক। প্রকাশকাল ১৩১৮ হিজরী, পৃষ্ঠা ৭৯-৮০।

৭। ইমামে রব্বানী হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর মকতুবাত শরীফ প্রথম খণ্ড (মূল) মকতুব নং ২০৯, তৃতীয় খণ্ড (মূল) মকতুব নং ৮৮, ৯২ এবং ১২১।

৮। শায়েখ মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়ার এই পুস্তিকার নাম রদ্দে শুবহাত। পুস্তকটির একটি খণ্ড আছে রেজা লাইব্রেরী, রামপুরে।

৯। আতিয়াতুল ওহ্হাব ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দ, ছাপা হয় স্বতন্ত্র পুস্তক আকারে। অতঃপর হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর মকতুবাত শরীফ আরবী অনুবাদের পাদটীকায় দু'বার ছাপা হয়।

১০। 'মৌলভী সাহেব মেহেরবান সাল্লামাহুল্লাহ' দ্বারা হজরত মাযহার র. এর খলীফা কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথীকে বুঝানো হয়েছে। হজরত মাযহার র. এর মকতুবসমূহ একত্রিত করে জনাব আবদুর রাজ্জাক কুরাইশী যা প্রকাশ করেছিলেন, তার অধিকাংশ মকতুবে তাঁকে এভাবে সম্বোধন করা হয়েছে।

১১। এক বস্তুর জন্য অন্য বস্তুর হুকুম বা হুকুমের মকসুদ যদি শব্দের সাথে 'যু', 'লাহু' বা 'নী' ব্যবহার দ্বারা বুঝানো হয়, তবে তাকে হামলে এশতেকাকী বলা হয়। আর যদি কোনো মাধ্যম ছাড়া বুঝানো হয়, তবে তাকে বলা হয় হামলে মুওয়াতাত। দস্তুরুল উলামা, মোস্তালাহাতে উলুম ওয়াফুনুনে আরাবিয়া পৃষ্ঠা ১৩৮।

১২। ক. হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর মকতুব ১২৪/৩।

খ. মাবদা ওয়া মাআদ নং ৪৮।

গ. হাযিরাতুল কুদস্– বদরুদ্দীন সেরহিন্দী ১২৬/২।

ঘ. রাসাইলে সাবআ সাইয়ারা– গোলাম আলী দেহলভী– পৃষ্ঠা ৫০।

ঙ. আল মুফাযেলা বাইনাল ইনসান ওয়াল কাবা, মোহাম্মদ আমীন বদখশী ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১০৬৮ হিজরীতে প্রকাশিত। প্রকাশক মুখযুনা কুতুবখানা, ইসলামিয়া কলেজ, পেশোয়ার।

১৩। তিরমিযী শরীফ, কিতাবুল আমছাল।

১৪। সুফিয়ানে কেরাম সুফী সম্প্রদায়ের ইমামগণকে একে অপরের উপর প্রাধান্য দিতে নিষেধ করেছেন। মাশায়েখে কেরামের অধিকাংশ আলোচনায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রত্যেক জায়গায়ই প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টি নিষেধ করা হয়েছে। বড় পীর আবদুল কাদের জ্বিলানী র. এবং হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর মধ্যে একে অপরের উপর প্রাধান্য লাভের অনুমানটি তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিলো ওই সময়, যখন হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. তাঁর বিভিন্ন মকতুবে শায়েখ আবদুল কাদের জ্বিলানী র. সম্পর্কে কিছু সূক্ষ্ম বিষয়ে নিজের খেয়াল প্রকাশ করেছিলেন। যেমন গাউছুল আজম আবদুল কাদের জ্বিলানী র. এর উক্তি 'কাদামী হাজিহী আলা রাকাবাতে কুল্লি ওলিয়াল্লাহ' (আমার এ কদম সকল ওলীগণের স্কন্ধের উপর)। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. কথাটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে— জেনে রাখা উচিত যে, উক্ত বিশেষত্ব কেবল ওই সময়ের আউলিয়া কেরামের জন্য। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ উক্ত বিশেষত্বের বাইরে। মকতুব নং ১৯৩/১, গভীরভাবে চিন্তা করলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, একথার দ্বারা কোনোরূপ বেআদবী প্রকাশ পায় না। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. ছাড়াও এ মত পোষণ করেছেন শায়েখুল ইসলাম ইজদুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম (সীরাতে গাওছুল আজম পৃষ্ঠা ১০০–১০২)। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. কয়েকটি নিবন্ধে বড় পীর সাহেবের মহিমা ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বলেছেন, আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলন লাভকারী ইমামগণ তাঁর মাধ্যমে ফয়েজ পেয়ে থাকেন। আর শায়েখ মোজাদ্দেদ হচ্ছেন তাঁর একজন প্রতিনিধি (মকতুব নং ১২৩/৩)। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর তিরোধান দিবস পর্যন্ত হজরত গাউছেপাকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে গিয়েছেন। তিনি যখন দুর্বলতায় এবং রোগে আক্রান্ত ছিলেন তখন স্বপ্নজগতে গাওছে পাকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিলো। তিনি তাঁকে বলেছিলেন, আপনি আমার কবিতা 'আফালাত শুমুসুন' এবং আমার বাণী 'কদমী হাজিহী' এর ব্যাখ্যা লিখেন ইনশাআল্লাহ্ তাতে আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন (বদরুদ্দীন সেরহিন্দী রচিত বেসালে আহমদী পৃষ্ঠা ১২ ও ১৩)। এ বিষয়ে আরও অধিক জানার জন্য পাঠ করা যেতে পারে হজরত মাযহার র. এর সমসাময়িক বুজুর্গ শাহ ফকীরুল্লাহ উলুব্বী শিকারপুরী কর্তৃক লিখিত মকতুব ৪৯, ২০২ ও ২২১।

১৫। হজরত মোজদ্দেদে আলফেসানি র. লিখেছেন, উদাহরণরহিত পার্থক্য ও অবস্থারহিত প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাঁর ইসিম ও সিফতসমূহ এলমে ওয়াজেবীর গৃহে বিস্তারিত ও পার্থক্য সৃষ্টি করে প্রতিবিম্বত হয়েছে। পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক ইসিম ও সিফত এর স্তর আদমে (নিস্তিতে) এক বিপরীত অবস্থানে রয়েছে। যেমন এলেমের বিপরীতে জাহালত (অজ্ঞতা)। কুদরতের বিপরীতে অক্ষমতা। আল্লাহ্‌তায়ালার যাবতীয় সিফতের অবস্থা এরকম। তার বিপরীতে হীনতা ওয়াজেবুল ওজুদের ক্ষেত্রে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। আর এ আদমই ইসিম ও সিফতসমূহের দর্পন হয়েছে। এ দর্পনে ওয়াজেবুল ওজুদের ইসিম ও সিফতসমূহ প্রতিবিম্বত হয়েছে। এ ফকীরের দৃষ্টিতে আদমী দর্পনে যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তা হচ্ছে মুমকিনাতের হাকীকত (মকতুবাত শরীফ ১২২/৩, রেসালায়ে ওয়াহদাতুল ওজুদ, হাশিয়াকার মাওলানা শাহ আবুল হাসান জায়েদ)।

১৬। এ উক্তিটি হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর। একদিন তাঁর এক মহফিলে বোরহানপুর থেকে এক পুণ্যবান ব্যক্তি এসে বললেন, শায়েখ মোহাম্মদ ফজলুল্লাহ প্রশ্ন করেছেন, আপনি মকতুব নং ১১/১ এ লিখেছেন 'আমার মরতবা হজরত সিদ্দীক আকবর রা. এর মরতবার উপরে'। উত্তরে হজরত মোজাদ্দেদ র. বলেন, হজরত আলী সমস্ত মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে পূর্বের তিন খলীফার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান বলে দাবী করেননি। তাহলে আমি হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর উপর মর্যাদাবান বলে কেমন করে লিখতে পারি? বরং হক তায়ালার মারেফত ওই ব্যক্তির জন্য হারাম, যে নিজেকে ফিরিঙ্গি কাফেরের চেয়ে উত্তম মনে করে।

হাজিরাতুল কুদস, ৮৮/২

১৭। আল কোরআন (আম্বিয়া ২১/৮৩)।

১৮। আল কোরআন (সোয়াদ ৩৮/৪১)।

১৯। হজরত মাওলানা গোলাম নবী লালহী খলীফা হজরত গোলাম মহিউদ্দীন কাসুরী, তিনি খলীফা ছিলেন হজরত শাহ গোলাম আলী দেহলভী র. এর। আর তিনি খলীফা ছিলেন হজরত মির্জা মাযহার র. এর। তিনি এই মকতুবের একটি ব্যাখ্যা পুস্তিকা লিখেছেন। তার নাম 'আল কওলুল কবী ফী জিকরিল খফী ওয়াল জলী'। মোহাম্মদী ছাপাখানা লাহোর থেকে ১৩০১ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

২০। আল কোরআন (আ'রাফ, ৭/২০৫)।

২১। আল কোরআন (আ'রাফ, ৭/৫৫)।

২২। বোখারী (মাগাযী–৩৭), মুসলিম (জিকির–৪৪) দারেমী, (বিতর ২৬), তিরমিযী (দাওয়াত-৫৭)।

২৩। অর্থাৎ হুজুরী ও মা'ইয়াতের মোরাকাবা— কোরবত ও মহব্বতের মোরাকাবা।

২৪। অর্থাৎ দুনিয়া থেকে শীতল অন্তকরণ, আল্লাহ্তায়ালার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ এবং শরীরের মধ্যে লজ্জত অনুভব করা।

২৫। এ বিষয়ে বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থসমূহে হাদিস পাওয়া যায়। তবে দরজা বন্ধ করার বিষয়ে আমি কোনো রেওয়ায়েত পাইনি।

২৬। এ মকতুবের ব্যাখ্যাকার ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, তিরমিযী ও ইবনে মাজার সনদসমূহের আলোকে এর ব্যাখ্যা করেছেন। তাছাড়া হজরত ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. জিকিরে জহর নিষেধ করে তাকে বেদাত বলেছেন (মকতুবাত শরীফ ১/২৩১)।

২৭। সেমার মাসআলা নিয়ে ফকীহ এবং সুফীগণের মধ্যে মতভেদ সম্পর্কে অনেক কিতাব লিখিত হয়েছে। যেমন—

ক. রেসালায়ে সেমা ওয়াররুকস– ইবনে জওযী।

খ. কালবিসে ইবলিস– ইবনে জওযী।

গ. করউল আসমা বি এখতেলাফে আহওয়ালিল মাশায়েখ ওয়া আকওয়ালিহিম ফিস্সেমা– শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী।

ঘ. ইজাহুদ্দালালাত ফী জাওয়ায়েযে সেমায়েল আলাত– আবদুল গণী নাবলুসী।

২৮। সেমার শর্তসমূহ ক্রমান্বয়ে উঠে যেতে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে সেমার রূহ খতম হয়ে যায়। হজরত মাযহার র. এর সমকালীন চিশতী বুজুর্গ শাহ কলীমুল্লাহ জাহানাবাদী তাঁর সময়ের সেমা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছিলেন, এখনকার সেমা হাই হুই সেমাতে রূপান্তরিত হয়েছে। এ জন্য তিনি সেমার অনুষ্ঠান খুব কম করার জন্য শিক্ষা দিতেন। এ জন্য পাঠ করা যেতে পারে খালীক আহমদ নেজামী রচিত কিতাব তারিখে মাশায়েখে চিশ্‌ত– পৃষ্ঠা ৩০৬, ৪১৭ ও ৪১৯।

২৯। চিশতিয়া তরিকার সুফীগণের মধ্যে হজরত খাজা গেছুদরাজ সেমা সম্পর্কিত অনুসন্ধানমূলক আলোচনা করেছেন। এর জন্য পাঠ করা যেতে পারে শরহে আদাবুল মুরিদীন, পৃষ্ঠা ২০-৪৭।

৩০। ইমাম গাজ্জালী র. এহ্ইয়ায়ে উলুমিদ্দীন কিতাবে সেমা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

৩১। শায়েখ শিহাব উদ্দীন সোহরাওয়ার্দী 'আওয়ারেফুল মাআরেফ' কিতাবে সেমা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তার জন্য পাঠ করা যেতে পারে 'আওয়ারেফ' (হাশিয়া এহ্ইয়ায়ে উলুমিদ্দীন ২/২২২)। ' আওয়ারেফ' ফার্সি তরজমা (মেসহাবুল হেদায়া পৃষ্ঠা ১৪১) তাছাড়া শায়েখ আবু নজীব সোহরাওয়ার্দী ও আদাবুল মুরিদীন কিতাবে সেমার মাসআলা নিয়ে আলোচনা করেছেন। পৃষ্ঠা ২০-৪৭।

৩২। সুফী সম্প্রদায়ের আলেমগণ সেমা বিষয়ে অনেক কিতাব রচনা করেছেন। এলমে তাসাউফের সকল নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত পাদটীকায় ওগুলোর সংকুলান সম্ভব নয়। পূর্বে উল্লেখিত কিতাবসমূহ ছাড়া অন্যান্য যে সকল কিতাবের প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত পতিত হয়, সেগুলো হচ্ছে—

ক. কাশফুল হুজুব (বাবে আহকামে সেমা)।

খ. রেসালায়ে কুশাইরিয়া।

গ. শায়েখ আবদুর রহমান সুলামী রচিত রেসালায়ে সেমা।

ঘ. কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী রচিত রেসালায়ে সেমা।

ঙ. মাওলানা ফখরুদ্দীন যরাভী রচিত রেসালায়ে উসুলুস সেমা। তাছাড়া জালালুদ্দীন হামায়ী র. সেমা বিষয়ে সুফী সম্প্রদায়ের আলেমগণের বিভিন্ন মত ও উক্তিসমূহ 'মেসবাহুল হেদায়া' কিতাবের হাশিয়ায় একত্রিত করেছেন। এ বিষয়ে পাঠ করা যেতে পারে 'মেসবাহুল হেদায়া', তেহরান ছাপা– পৃষ্ঠা ১৭৯-১৮৬।

৩৩। কাযা ও কদর (ফায়ালা ও তকদীর) এর বিষয়ে হজরত মোজাদ্দেদ র. কিছু সূক্ষ্ম কথা বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে পাঠ করা যেতে পারে মকতুবাত শরীফ ১/২৮৯, ২/৬৭ নং মকতুব।

৩৪। আধুনিক যুগে হিন্দু ধর্মমতের উপর অনেক পুস্তক রচনা করা হয়েছে। এর জন্য পাঠ করা যেতে পারে – Radha Krishnan Hinduism, Cultural History of India, Edited by Basham. Oxford. 1975. pp 60-82.

৩৫। ভারত বর্ষের বিভিন্ন ধর্মের আকায়েদ সম্পর্কে প্রাচীন পুস্তকাদির বিস্তারিত ও সারসংক্ষেপ জানার জন্য পাঠ করা যেতে পারে আলবিরুনী রচিত কিতাবুল হিন্দ, প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ১৬৩–১৭৮। ইংরেজী ভাষায়ও এ সম্পর্কিত পুস্তক রয়েছে যেমন– Radha Krishnan- The philosophy of the Upanisads, London-1935.

৩৬। আল কোরআন (ফাতির ৩৫/২৪)।

৩৭। আল কোরআন (ইউনুস ১০/৪৭)।

৩৮। হজরত মোজাদ্দেদ র. এ বিষয়ে স্বীয় কাশফ বর্ণনা করেছেন এভাবে— ভারতবর্ষের মাটি, যাতে নবী আগমনের বিষয়ে দূরবর্তী বলে দেখানো হয়, আমার মনে হয়, ভারতবর্ষেও নবী প্রেরিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা স্রষ্টার প্রতি মানুষকে আহবান জানিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের কোনো কোনো শহরে তো শিরকের অমানিশার মধ্যে আম্বিয়া কেরামের প্রজ্জ্বলিত মশালের আলোর বিচ্ছুরণ প্রতীয়মান হয়। ওই শহরগুলোকে কেউ যদি নির্ণয় করতে চায়, তাহলে নির্ণয় করতে পারবে ......। কিন্তু তাঁদের উপর ইমান গ্রহণকারীর সংখ্যা খুবই কম ছিলো। মকতুবাত শরীফ–১/২৫৯।

৩৯। কাওছাইন এর বাক্য, কলেমাতু তাইয়্যেবাত, পৃষ্ঠা ২৭।

৪০। আল কোরআন (মুমিন ৪০/৭৮)।

৪১। হজরত মোজাদ্দেদ র. বলেছেন–

ভারতের মাটিতে অনেক গ্রাম ও শহর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার নমুনা পাওয়া যায়। এখানকার অধিবাসীরা যদিও (পয়গম্বরগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে; কিন্তু তাঁদের দাওয়াতের কলেমা সমসাময়িকদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিলো (মকতুব নং ১/২৫৯)।

৪২। তানাসুখ অর্থ জন্মান্তরবাদ। রূহের দৈহিক কাঠামো পরিবর্তন হওয়া। আত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহের মধ্যে প্রবেশ করা। আত্মা ও দেহ একে অপরের জন্য আমানত স্বরূপ। সে কারণে পরস্পরের মধ্যে যে এশক পয়দা হয়, সে পরিপ্রেক্ষিতে দেহের মধ্যে আত্মার অনুপ্রেবেশকে তানাসুখ (জন্মান্তর) বাদ বলে। হিন্দু ধর্মবিশ্বাস অনুসারে যে নফস নাকেস (অপূর্ণ) থাকে, তা এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু যে নফস কামেল (পূর্ণতাপ্রাপ্ত) হয়, তার যাবতীয় পূর্ণতা শক্তির মাধ্যমে কাজের মধ্যে প্রকাশ পায়। সে নফসের অন্য দেহে স্থানান্তরিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। বরং সে তখন দৈহিক সম্পর্ক থেকে মুক্তি লাভ করে পবিত্র জগতে যেয়ে মিলিত হয়ে যায়। যে নফস পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়নি, তা অবশিষ্ট পূর্ণতা অর্জনের জন্য মানুষের এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হতে থাকে। এ স্থানান্তরপ্রক্রিয়া মানুষ, প্রাণী এবং উদ্ভিদের বেলায়ও হয়ে থাকে (দস্তরুল উলামা ১/৩৫৪, মোস্তালাহাতে উলুম ও ফুনুন আরাবিয়া পৃষ্ঠা ১০৩, ১০৪)।

৪৩। এখানে হজরত মাযহার র. এর কথার ভাবার্থ হচ্ছে, কেবল পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করার কারণেই হিন্দুদেরকে কাফের বলা যায় না। বরং কুফুরীর বিষয়ে অন্যান্য দলিল প্রমাণের দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। হজরত মোজাদ্দেদ র. তানাসুখ

(জন্মান্তরবাদ) সম্পর্কে লিখেছেন— তানাসুখ (জন্মান্তর) মতবাদ কুফুরী। কেনোনা এ মতবাদের মাধ্যমে দীনের ওই সকল বিষয়কে অস্বীকার করা হয়, যা বর্ণনাপরম্পরা দ্বারা সাব্যস্ত। সমস্ত নফস যদি পূর্ণতার সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাহলে দোযখ কার জন্য? আর শাস্তিই বা কে ভোগ করবে? দোযখ ও আখেরাতে আযাবসমূহ অস্বীকার করা দার্শর্নিকদের আকীদার চেয়েও অধিকতর মন্দ। কেনোনা দার্শনিকেরা জন্মান্তরবাদকে প্রত্যাখ্যান করে। এ ফকীরের মতে রূহ স্থানান্তরিত হওয়ার মতটি তানাসুখের মতবাদের চেয়ে জঘন্য। কেনোনা রূহ স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বে শরীরের মৃত্যু এবং তার সাথে অন্য দেহের জীবন লাভ অপরিহার্য হয়ে যায়। এমতাবস্থায় প্রথমে দেহের বরযখী বিধান গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। কবরের আযাব ও সওয়াব থেকেও সে পলায়ন করতে পারবে না। দ্বিতীয় দেহকে যখন দ্বিতীয় জীবন দেয়া হবে, তখন তার জন্য হাশর তো দুনিয়াতেই সাব্যস্ত হয়। আফসোস! হাজার আফসোস যে, এ ধরনের মিথ্যুক লোক নিজেদেরকে শায়েখের আসনের উপযোগী মনে করে এবং মুসলমানদের অনুসরণীয় ব্যক্তি বলে ধারণা করে (মতুবাত শরীফ ২/৫৮)।

৪৪। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর মকতুবাত ১/৩১২।

৪৫। আল কোরআন। সুরা আল আহযাব, ৩৩/৩৬।

৪৬। মেশকাত শরীফের তরজমা ‘আশ আতুল লুমআত’ কৃত শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী ১/১৪১।

৪৭। উলামা কেরাম শাহাদত অঙ্গুলি উত্তোলন করা ও না করার বিষয়ে অনেক পুস্তিকা রচনা করেছেন । যেমন–

ক. মোল্লা আলী ক্বারী– তাযইনুল এবারত ফী তাহসীনিল ইশারা।

খ. সাইয়্যেদ বরজঞ্জী— আল এমারাতুল মুসবেহা আলী মানেঈল ইশারা বিল মুসাবেবহা।

গ. রেসালা শায়েখ ইবনে আবেদীন (আল্লামা শামী)।

ঘ. মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর সমসাময়িক বুজুর্গ শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভীও শাহাদত অঙ্গুলি উত্তোলন করার বিষয়ে তাঁর রচনাবলীর মধ্যে আলোচনা করেছেন। এ জন্য পাঠ করা যেতে পারে শরহে সফরুস সাআদাত এবং শরহে মেশকাত। হজরত মাযহার র. এর সমসাময়িক আলেম হজরত শাহ ফকীরুল্লাহ শিকারপুরীও এ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ মকতুব লিখেছেন।

৪৮। হজরত শায়েখ মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া তাঁর বুজুর্গ ভাইয়ের কাছ থেকে এলেম লাভ করেন। তিনি হজরত শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভীর ছাত্র ছিলেন। হাদিসের সনদ লাভ করেছিলেন আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী র. এর কাছ থেকে (রওজাতুল কাইয়্যুমিয়া ১/৩১১)। তিনি পীর মুরিদীর কাজ ছাড়া অধ্যাপনার কাজেও নিয়োজিত ছিলেন। তিনি সেরহিন্দ শরীফের মাদ্রাসার প্রাণপুরুষ ছিলেন। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করা যেতে পারে ‘যুবদাতুল মাকামাত’, পৃষ্ঠ ৩২৪, উমদাতুল মাক্বামাত পৃষ্ঠা ২৪২, ‘আনযাবুল আহ্জাব’ পৃষ্ঠা ১০৫ ও ‘হাদিয়াতু আসদিয়া পৃষ্ঠা ৮২।

৪৯। শাহাদত অঙ্গুলি উত্তোলন করার বিষয়ে হজরত মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়ার লিখিত কিতাবের মধ্যে বিষয়টির ব্যাপারে কাতিবগণ উল্লেখ করেননি। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর লিখিত মকতুবের আরবী অনুবাদক শায়েখ মোহাম্মদ মক্কী তাঁর রেসালার মধ্যে শায়েখ মোহাম্মদ সাঈদের রেসালা সম্পর্কে লিখেছেন, আমাদের মাশায়েখগণ এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তবে আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। শায়েখ মোহসেন তিরহটিও এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন যে, শাহ মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া এই পুস্তিকায় তাঁর পিতা ও ভাইয়ের সঙ্গে মতভেদ করেছেন। হজরত সিরাজ আহমদ মোজাদ্দেদী রামপুরী তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

মোজাদ্দেদী হজরতগণের মধ্যে শাহাদত অঙ্গুলি উত্তোলন করার বিষয় নিয়ে মতভেদ ছিলো। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. থেকে নিয়ে মাওলানা মোহাম্মদ হাসানজান পর্যন্ত হজরতগণ এ বিষয়ের উপর পুস্তিকা লিখেছেন। সর্বপ্রথম হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সাহেবজাদা হজরত খাজা মোহাম্মদ সাঈদ মোজাদ্দেদ সাহেবের জীবদ্দশায় শাহাদত অঙ্গুলি উত্তোলন করা নিষেধ প্রসঙ্গে পুস্তিকা লিখেছিলেন। তারপর হজরত শাহ মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া ওই পুস্তিকার জবাবে অঙ্গুলি উত্তোলন সাব্যস্ত করার বিষয়ে পুস্তিকা রচনা করেন। তারপর খাজা মোহাম্মদ সাঈদের সাহেবজাদা শাহ মোহাম্মদ ফরখ অঙ্গুলি না উঠানো প্রসঙ্গে পুস্তিকা রচনা করেন। বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়া দরকার যে, মহান বুজুর্গগণের মধ্যে এ মতভেদ ছিলো কেবল এলেম ও ফেকাহ্ ভিত্তিক। বিষয়টি সাধারণ বিরুদ্ধবাদিতার বর্ণ ধারণ করেনি।

৫০। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এক চুল পরিমাণ শরীয়তের বরখেলাফ কাজকেও অপছন্দ করতেন। তিনি এ প্রসঙ্গে একটি মকতুবে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, শরীয়তের বরখেলাফ কাশ্ফ প্রত্যাখ্যানযোগ্য। মকতুব নং ১/৪৩।

৫১। শায়েখ মোহাম্মদ হায়াত সিন্ধী মোল্লা ভালারিয়ার পুত্র ছিলেন। প্রখ্যাত আলেম, মোহাদ্দেছ এবং নাম করা আলেমগণের উস্তাদ ছিলেন। তিনি বেশ কতিপয় কিতাবের লেখক ছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিতাব ছিলো তোহফাতুল আনাম ফিল আমাল বিহাদীছিন্নবী এবং আল ইকাফ আলা ছববিল ইখতিলাফ।

৫২। এই পুস্তিকার নাম ছিলো তোহফাতুল আনাম ফিল আমাল বিহাদীসিন্নবী স.। এর লিখিত কপি মাদ্রাসা মোহাম্মদিয়া জামে মসজিদ বোম্বাইয়ের কুতুবখানায় রক্ষিত আছে।

৫৩। 'রওজাতুল উলামা' নামক কিতাবের রচয়িতা আবু আলী হুসাইন ইবনে ইয়াহ্ইয়া বোখারী। 'রওজাতুল উলামা' কিতাবের লিখিত কপি সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় হায়দরাবাদের কুতুবখানায় রক্ষিত আছে।

৫৪। আল্লামা শামী ইবনে আবেদীন এর কিতাব 'রদ্দুল মোহতার আলাদ্দুররিল মুখতার' তুর্কী ছাপা- ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩।

৫৫। রওজাতুত্বলেবীন ওয়া ওমদাদুল মুফতীঈন, রচয়িতা ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুররী, আন নববী, দামেশকী শাফেয়ী। এটি শাফেয়ী মাযহাবের একটি বিখ্যাত ফেকাহ গ্রন্থ।

৫৬। একে সাধারণভাবে 'জামেউল ফতওয়া' বলা হয়। এটির রচয়িতা ইমাম নাসের উদ্দীন আবুল কাসেম মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সমরখন্দী হানাফী।

৫৭। সাহাবায়ে কেরামের উপর দোষারোপ করা বাতেল– এ বিষয়ে উত্তম দলিলসমূহ পেশ করেছেন হজরত কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী র. তাঁর 'সাইফূল মাসলুল' নামক পুস্তকে (পৃষ্ঠা ২৭২-৪৮৭)। তাছাড়া পাঠ করা যেতে পারে শাহ মঈনুদ্দীন নদভী রচিত 'তারিখুল ইসলাম' প্রথম খণ্ড (পৃষ্ঠা ৩২৫–৩৪১)।

৫৮। হজরত মোজাদ্দেদ র. বলেছেন, কমপক্ষে অর্ধেক সাহাবী এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে শরীক ছিলেন। এখন তাঁরা যদি হজরত আমীর আলীর সাথে লড়াই করার কারণে কাফের বা ফাসেক হয়ে যান, তাহলে তো দীনের অর্ধেকের উপর থেকে নির্ভরতা উঠে যায়, যে দীন তাঁদের তবলীগের ওসিলায় আমাদের নিকটে পৌঁছেছে (মকতুবাত শরীফ ১/২৫১)।

৫৯। সাহাবা কেরামের মধ্যে পারস্পরিক যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিলো তা সততার সঙ্গে হয়েছিলো— এমতো ধারণা রাখতে হবে। বাড়াবাড়ি থেকে দূরে থাকতে হবে। কেনোনা ওই সকল মতভেদ ব্যাখ্যা ও এজতেহাদের ভিত্তিতে হয়েছিলো। এটাই আহলে সুন্নত জামাতের আকীদা (মকতুবাত শরীফ ১/২৫১)।

৬০। হজরত মোজাদ্দেদ র. এ বিষয়ে আহলে সুন্নত জামাতের আকীদা বর্ণনা করে লিখেছেন, হজরত আলী রা. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীগণ ভুলের মধ্যে ছিলেন। আর সত্য ছিলো হজরত আলীর দিকে। কিন্তু যেহেতু বিষয়টি এজতেহাদী ভুল ছিলো, তাই তা তিরস্কার থেকে দূরে এবং এর জন্য তাঁদেরকে পাকড়াও করা হবে না। হজরত আলীর খেলাফত কালে হজরত মুয়াবিয়া খেলাফতের দাবীদার হতে পারেন না (মকতুবাত শরীফ ১/২৫১)।

৬১। এজতেহাদী ভুলের অর্থ হচ্ছে— একজন আলেম, নেককার ও পরহেজগার ব্যক্তি তাঁর সামগ্রিক প্রচেষ্টা সত্যের অন্বেষণে পরিচালিত করেন। কিন্তু সবাই সত্য পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হন না, কখনো কখনো ভুল পরিণামে উপনীত হন ।

৬২। বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করতে হবে কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী র. রচিত 'সাইফুল মাসলুল' এবং শাহ আবদুল আজিজ রচিত 'তোহফায়ে এছনা আশারিয়া'।

৬৩। আল কোরআন (সূরা আল আম্বিয়া ২১/১০৭)।

৬৪। এটি একটি স্বীকৃত বিষয় যে, দীনী আকায়েদের উপর দুনিয়াবী কোনো এলেম বা দৃষ্টিভঙ্গির অগ্রগণ্যতা নেই। লক্ষণীয় বিষয় যে, অধিকাংশ ইতিহাস গ্রন্থ আব্বাসিয়া শাসনামলে লেখা হয়েছে। এগুলির মধ্যে পরস্পরবিরোধী অনেক ঘটনা শামিল করে দেয়া হয়েছে। তাই ইসলামের ইতিহাস শুধুমাত্র যুদ্ধবিগ্রহ ও ধ্বংসযজ্ঞের কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। এসব গ্রন্থ অধ্যয়নে সন্দেহে পতিত হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার।

৬৫। ইমাম সুয়ূতী নির্ভরযোগ্য হাদিসগ্রন্থের আলোকে খেলাফত কুরায়েশদের সাথে সম্পৃক্ত— এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন (তারিখুল খোলাফা পৃ: ১৪,১৫)।

৬৬। ইমাম সুয়ূতি হাসান হাদিসসমূহের ভিত্তিতে কুরায়েশদের খলীফা ১২ নির্ধারণ করেছেন। তারিখুল খোলাফা পৃষ্ঠা ১৫-১৬।

৬৭। আল্লামা সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী 'সীরাতে আয়েশা' নামক একটি উঁচুমানের গবেষণাগ্রন্থ রচনা করেছেন (পাঠ করা যেতে পারে পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৭)।

৬৮। ইফকের শাব্দিক অর্থ অপবাদ দেয়া। মূলতঃ হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর প্রতি যে অপবাদ রটানো হয়েছিলো, তাকেই বুঝানো হয়েছে। মুনাফিকেরা এরকম অপপ্রচার চালিয়েছিলো। রসুলেপাক স. এর নিয়ম ছিলো, তিনি যখন কোনো সফরে যাওয়ার মনস্থ করতেন, তখন তাঁর বিবিগণের যে কোনো একজনকে সফরসঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করতেন। মোরাইসি অভিযানে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে ছিলেন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.। সফরে যাওয়ার সময় তিনি তাঁর ভগ্নি হজরত আসমা রা. এর গলার হার ধার নিয়ে পরিধান করেছিলেন। রাতে কাফেলা এক জায়গায় তাঁবু ফেলেছিলো বিশ্রাম নেয়ার জন্য। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে বেরিয়েছিলেন। তখন তাঁর গলা থেকে হার পড়ে যায়। অল্প বয়স এবং সফরের অনভিজ্ঞতার কারণে কাউকে না জানিয়ে তিনি হার অন্বেষণ করার জন্য বেরিয়ে পড়েন। হারটি পাওয়ার পর তিনি ফিরে আসেন। ততক্ষণে কাফেলা সেস্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। বাধ্য হয়ে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তাঁকে আনার জন্য যাঁদেরকে পাঠানো হয়েছিলো, তিনি তাঁদের সঙ্গে ফিরে আসেন। মুনাফিকেরা ঘটনাটিকে নানা রঙ দিয়ে প্রচার করে। অপপ্রচার বেশ দানা বেঁধে ওঠে। রসুলেপাক স. এর সত্যতা যাচাই করেন। তখন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. নির্দোষ প্রমাণিত হন (সিরাতে আয়েশা, পৃষ্ঠা ৭৩-৮৫)।

৬৯। রসুলে পাক স. এ বিষয়ে হজরত আলী রা. এর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। হজরত আলী বললেন, দুনিয়াতে মেয়ের অভাব তো নেই (অর্থাৎ মানুষের কথার যদি পরোয়া করেন, তাহলে তাঁকে তালাক দিয়ে দেন। আর খাদেমার কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। সে তো সত্য বলবে) (সীরাতে আয়েশা লেখক সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী, পৃষ্ঠা ৭৮)।

৭০। মকতুবের এ অংশটুকু ফিদকের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। খয়বর বিজয়ের পর রসুলেপাক স. বিজিত ভূখণ্ডটি ৩৬ ভাগে বিভক্ত করে ১৮ ভাগ নিজের জন্য নির্ধারণ করলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি স. তবলীগের কাজের জন্য মোহায়যা ইবনে মাসউদ আনসারীকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। ফিদকবাসীরা সন্ধি করলো এবং অর্ধেক জমি সন্ধির চুক্তি অনুসারে দিয়ে দিতে অস্বীকার করলো। রসুলেপাক স. তা কবুল করলেন। তখন থেকে ওই জমি তাঁর জন্য নির্ধারিত হয়ে গেলো। তাঁর ইনতেকালের পর হজরত ফাতেমা রা. ও হজরত আব্বাস রা. হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর নিকটে গিয়ে খয়বর ও ফিদকের ভূখণ্ডের যে অংশ রসুল স. এর জন্য নির্ধারিত ছিলো, তার ওয়ারিস দাবী করলেন। উত্তরে হজরত আবু বকর সিদ্দীক বললেন, আমি রসুলেপাক স. কে বলতে শুনেছি— আমাদের কোনো ওয়ারিস হয় না, আমরা যা কিছু রেখে যাই তা

সদকা। তিনি আরো বলেন, এই সম্পত্তির বিষয়ে রসুলেপাক স. যেমন করতেন, আমি সে রকমই করবো। হজরত ফাতেমা রা. এ কথা শুনে ভগ্নমনে ফিরে আসেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন হজরত আবু বকরের সাথে এ বিষয়ে তিনি আর কোনো কথা বলেননি (সহী বোখারী, কিতাবুল ফারায়েয)।

৭১। 'মসনদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল' কিতাবে সুস্পষ্ট রেওয়ায়েত আছে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর জবানে এই হাদিস শোনার পর হজরত ফাতেমা রা. বলেছিলেন, আপনি যা রসুলুল্লাহ্র কাছ থেকে শুনেছেন, আপনি কি তা বেশী জানেন? (সিদ্দীকে আকবর। লেখক সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী, পৃষ্ঠা ৪১৫)।

৭২। 'মসনদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. ফিদকের সম্পত্তি পূর্বের অবস্থায় রেখে দেয়ার সিদ্ধান্ত দেয়ার পর বলেছিলেন, যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, রসুলেপাক স. এর নিকটজনগণ আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। আমি তাঁদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবো। তিনি আরও বলেন, আমি শুনেছি, নবীগণের কোনো ওয়ারিস হয় না। তৎসত্ত্বেও আমি তাঁদের অভিভাবকত্ব করবো, যাঁদের অভিভাবক করে গেছেন রসুলেপাক স.। আমি তাদের জন্য খরচ করবো, যাদের জন্য খরচ করেছেন রসুল স. (পৃষ্ঠা ৪১৩)।

৭৩। হাদিসটি মেশকাত শরীফ, মুসলিম শরীফ ২/৯১ এবং মসনদে হাম্বল ৩/৪৬৩ তে এরকম উল্লেখ আছে 'লা নূরাছু মা তারাকনা সাদাকাতুন'। আমাদের (সম্পদের) কোনো ওয়ারিস হয় না। আমরা যা কিছু রেখে যাই তা সদ্কা।

৭৪। প্রথমতঃ হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর রেওয়ায়েত তো বিশুদ্ধতার সবচেয়ে বড় দলিল। তাছাড়া এই রেওয়ায়েতে হজরত আবু বকর একা ছিলেন না। আযওয়াজে মোতাহ্হারাত, হজরত আলী, হজরত আব্বাস, হজরত ওছমান, হজরত ওমর ফারুক, হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ, হজরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ, হজরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম, হজরত সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, হজরত আবু হুরায়রা এবং হজরত আয়েশা— তাঁরা সকলেই এই হাদিসের বিশুদ্ধতার সাক্ষী ছিলেন (সিদ্দীকে আকবর পৃষ্ঠা ৪১৫), সুতরাং হজরত ফাতেমা রা. এই হাদিস অস্বীকার করেছিলেন— এরকম কল্পনাই করা যায় না।

৭৫। আশআতুল লুমআত ৪/২৫২, ২৫৩ (কিতাবুল ফেতান, বদউল খালক ওয়া জিকরুল আম্বিয়া)।

৭৬। হজরত মোজাদ্দেদ র. লিখেছেন, অলৌকিক ঘটনার (কারামতের) প্রতি নজর রাখা দৃষ্টির সংকীর্ণতা এবং তাকলীদের যোগ্যতার মধ্যে অভাব থাকার আলামত (মকতুবাত শরীফ ১/১০৭)। অলৌকিকতা এবং কারামত প্রকাশ পাওয়া বেলায়েতের জন্য শর্ত নয় (মকতুবাত শরীফ ২/৯২)।

৭৭। আল কোরআন (সুরা আলে ইমরান, ৩/৩১)।

৭৮। ফতহুল বারী, শরহে বোখারী, ইবনে হাজার আসকালানী (১/১১৪)।

৭৯। হজরত মোজাদ্দেদ র. সুন্নত অনুসরণের গুরুত্ব বর্ণনা করে লিখেছেন, শরীয়তের একটি হুকুম পালন করা নফসানী খাহেশাত দূর করার জন্য হাজার বছর রিয়াজত ও মোজাহাদা করার চেয়েও কয়েকগুণ শ্রেষ্ঠ (মকতুবাত শরীফ ১/৫২)।

৮০। সুফীগণের সকল সিলসিলার ভিত্তি সুন্নতের অনুসরণের উপর। তাঁরা সুন্নত অনুসরণকে নৈকট্য লাভের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলে তাঁদের রচনাবলীর মধ্যে স্বীকৃতি দিয়েছেন। হজরত মাযহার র. এর সম্পর্ক যে সিলসিলার সাথে অর্থাৎ নকশ্বন্দিয়া তরিকা, তা সুন্নত প্রতিপালনের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। এ প্রসঙ্গে হজরত মোজাদ্দেদ র. বলেছেন, এখন আমার এ ছাড়া আর কোনো আরজু বাকি নেই যে, রসুলেপাক স. এর সুন্নতকে পুনরুজ্জীবিত করি (মকতুবাত শরীফ ১/৩৭)। সবচেয়ে উন্নত ও উত্তম নসিহত যা সন্তানাদি ও বন্ধুবর্গকে করা যেতে পারে, তা হচ্ছে উজ্জ্বল সুন্নতের অনুসরণ যেনো করা হয়। (মকতুবাত শরীফ ২/২৩ এবং ১৯)। খাজা মোহাম্মদ মাসুম র.ও সুন্নতের অনুসরণের উপর জোর দিয়েছেন। মাওলানা মোহাম্মদ সিদ্দীক লিখেছেন, হাদিস শরীফে এসেছে, যে একটি মৃত সুন্নতকে উজ্জীবিত করে, সে একশ শহীদের সমান সওয়াব পায় (মকতুবাতে মাসুমিয়া ১/২২৮)।

৮১। মোজাদ্দেদিয়া হজরতগণের বর্ণনাসমূহের সংকলন করেছেন মাওলানা মোহাম্মদ বাকের লাহোরী 'কানযুল হেদায়াত' নামে। মাওলানা যায়েদ আবুল হাসান ফারুকী 'মানাহিজুস সায়ের ওয়া মাদারেজুল খায়ের' নামক গ্রন্থে তাঁদের মাকামসমূহের জ্ঞান দান করার জন্য চেষ্টা করেছেন।

৮২। আল কোরআন (সুরা আর রহমান ৫৫/১৯)।

৮৩। 'রেসালায়ে মারাতেবে সেত্তা' কিতাবটি মাওলানা জামীর দিকে সম্বন্ধ করা হয়। এই মকতুবে হজরত মাযহার র. লিখেছেন, ওই রেসালাটি মাওলানা জামী রচনা করেছেন। তবে ওই নামের যতগুলো রেসালা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে, কোনোটির মধ্যে লেখকের নাম যুক্ত হয়নি।

৮৪। আল কোরআন (সুরা আন্ নাহল ১৬/৬০)।

পরিশিষ্ট–১

'মাক্বামাতে মাযহারী'র লেখক হজরত শাহ গোলাম আলী দেহলভী র. এর জীবনচরিত নিয়ে লেখা হয়েছে এই পরিশিষ্টটি। এটি রচনা করেছেন হজরত শাহ আবদুল গনী র.। তাঁর পিতা হজরত শাহ আবু সাঈদ মোজাদ্দেদী র.। হজরত শাহ আবদুল গনী ১২৩৪ হিজরীর ২৫শে শাবান মোতাবেক ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ শে জুন দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৯৬ হিজরীর ৭ই মোহররম মোতাবেক ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১ শে ডিসেম্বর মদীনা মুনাওয়ারায় ইনতেকাল করেন।

হজরত শাহ গোলাম আলী দেহলভী

প্রথম অনুচ্ছেদ

জন্ম

হজরত শাহ গোলাম আলী দেহলভী র. এর জন্ম হয় ১১৫৮ হিজরীতে পাঞ্জাব জেলার বাটালা নামক এলাকায়। তাঁর বংশধারা হজরত আলী রা. পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাঁর পিতা শাহ আবদুল লতীফ একজন কঠোর সাধনাকারী বুজুর্গ ছিলেন [১]। তিনি প্রান্তরে গিয়ে অধোবদনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জিকরে জহর করতেন। তাঁর পীর ছিলেন শাহ নাসের উদ্দীন কাদেরী [২]। শাহ আবদুল লতীফ এবং তাঁর পীরের মাজার দিল্লীতে মোহাম্মদ শাহী ঈদগাহের পিছনে জেশ পুরা নামক স্থানে অবস্থিত। তিনি চিশ্‌তী ও শাতারী সিলসিলারও নেসবত পেয়েছিলেন। তিনি চল্লিশ দিন পর্যন্ত সাধারণতঃ নিদ্রা যেতেন না এবং রাত্রে খুব অল্প আহার করতেন। নফসের অহমিকার আশংকায় রোজার নিয়তও করতেন না।

হজরত শাহ গোলাম আলীর জন্মের পূর্বে তিনি স্বপ্নে হজরত আসাদুল্লাহিল গালিব হজরত আলী রা.কে স্বপ্নে দেখেন। তিনি বলছেন, তোমার পুত্রের নাম রেখো আমার নামে। সুতরাং সন্তান জন্মের পর তাঁর নাম রাখলেন আলী। যখন ভালো মন্দ বুঝবার বয়স হলো, তখন তিনি নিজেই তাঁর নামের সঙ্গে গোলাম শব্দ যোগ করে নিলেন। তারপর থেকে তাঁর নাম হলো গোলাম আলী। তাঁর মাতা এক রাতে কোনো এক বুজুর্গকে স্বপ্নে দেখেন। তিনি তাঁকে বলছেন, তোমার পুত্রের নাম আবদুল কাদের রাখো। লেখক (শাহ আবদুল গনী) বলেন, সম্ভবতঃ উক্ত বুজুর্গ গাওছুল আজম শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী ছিলেন। তাঁর চাচা একজন বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এক মাসে কোরআন মজীদ হেফজ করেছিলেন। তিনি রসুলে করীম স. এর হুকুমে তাঁর নাম রেখেছিলেন আবদুল্লাহ।

তাঁর পিতা আপন পীরের কাছে বায়াত করানোর জন্য, যিনি খিযির আ. এর সোহবত পেয়েছিলেন, তাঁকে মাতৃভূমি বাটালা থেকে দিল্লীতে ডেকে আনলেন।

কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস তিনি দিল্লীতে পৌঁছার পূর্বের রাতে ওই বুজুর্গ ইনতেকাল করেন। তাঁর পিতা তাঁকে বললেন, আমি তোমাকে তাঁর কাছে বায়াত করানোর উদ্দেশ্যে দিল্লীতে ডেকে এনেছিলাম। কিন্তু আল্লাহপাকের মর্জি ছিলো না। এখন তুমি যেখানে তোমার উপকার হবে বলে মনে করবে, সেখানেই তরিকা গ্রহণ করো। তখন দিল্লীতে যে সকল হজরত ছিলেন, তিনি তাঁদের সোহবত গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে হজরত জিয়াউল্লাহ এবং শাহ্ আবদুল আদল, এই দু'জন হজরত খাজা মোহাম্মদ যোবায়েরের খলীফা ছিলেন। তাছাড়া খাজা মীর দরদ ইবনে খাজা নাসের , শাহ্ নান্নু, শাহ্ গোলাম সাদত চিশতী প্রমুখ বুজুর্গগণের সোহবত গ্রহণ করেন।

১১৮০ হিজরীতে বাইশ বছর বয়সে তিনি হজরত মির্জা মাযহার জানে জানান শহীদ র. এর খানকায় এলেন এবং বায়াত গ্রহণ করার আরয করলেন। মির্জা মাযহার বললেন, যেখানে উৎসাহ ও প্রেরণা পাও সেখানেই বায়াত গ্রহণ করো। এখানে তো নিমক ছাড়া পাথর চাটতে হবে। তিনি বললেন, আমি তাই মনজুর করলাম। হজরত মাযহার বললেন, তাহলে তোমাকে মোবারকবাদ। তারপর তিনি তাঁকে বায়াত করে নিলেন। শাহ গোলাম আলী দেহলভী নিজে বর্ণনা করেছেন— যখন এলমে হাদিস ও তাফসীরের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে গেলো, তখন আমি হজরত মাযহারের হাতে কাদেরিয়া সিলসিলায় বায়াত গ্রহণ করলাম। কিন্তু তিনি আমাকে নকশ্বন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকা শিক্ষা দিতেন।

শাহ গোলাম আলী র. বলেছেন, পনেরো বছর পর্যন্ত আমি তাঁর জিকির ও মোরাকাবার হালকায় অংশগ্রহণ করেছি। তারপর তিনি আমাকে সাধারণ ইজাযত প্রদান করেন। প্রথম দিকে আমার একটি চিন্তা ছিলো, আমি নকশ্বন্দিয়া তরিকায় যে জিকির শোগল করি তার প্রতি হজরত বড় পীর সাহেবের সন্তুষ্টি আছে কিনা। তখন আমি স্বপ্নে দেখলাম, হজরত বড় পীর সাহেব কোনো এক জায়গায় তশরীফ নিয়েছেন। তারই পার্শ্ববর্তী কোনো এক জায়গায় হজরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দও তশরীফ আনলেন। আমি হজরত নকশবন্দের নিকটে হাজির হতে চাইলাম। বড়পীর সাহেব আমাকে বললেন, আল্লাহ্তায়ালার মর্জি এ রকমই। যাও, এতে কোনো অসুবিধা নেই।

প্রথম দিকে আমার অনেক অভাব অনটন ছিলো। যা কিছু ছিলো তাও ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করলাম। একটি পুরাতন বিছানা এবং একখণ্ড ইট আমার সম্বল ছিলো। একদিন অত্যন্ত দুর্বলতার কারণে পথ চলতে না পেরে কোনো এক কামরায় প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলাম। মনে মনে ভাবলাম হয়তো এটাই আমার কবর হবে। তখন আল্লাহ্তায়ালা কোনো এক ব্যক্তির মাধ্যমে কিছু নজর নেয়াজ পাঠিয়ে দিলেন। পঞ্চাশ বছর ধরে আমি সেই

কানাআতের (স্বল্পেতুষ্টি) পথেই বসে আছি। লোকটি বললো, দয়া করে দরজা খুলুন। আমি দরজা খুললাম না। সে আবার বললো, আপনার সাথে আমার কিছু কাজ আছে। অনুগ্রহ করে দরজা খুলুন। তারপরও আমি দরজা খুললাম না। লোকটি তখন কিছু মুদ্রা একটি থলের ভিতরে করে কামরার অভ্যন্তরে ছুঁড়ে মারলেন। সে দিন থেকে নজর নেয়াজের দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেলো।

তারপর থেকে শত শত আলেম উলামা বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল থেকে শাহ গোলাম আলী দেহলভী র. এর খেদমতে আসতে লাগলেন। তাঁদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তো এসেছিলেন স্বপ্নে রসুলেপাক স. এর নির্দেশ পেয়ে। যেমন মাওলানা খালেদ রুমী, শায়েখ আহমদ কুর্দি, সাইয়্যেদ ইসমাইল মাদানী। কেউ তাঁকে একাজে আগ্রহান্বিত করার জন্য তাঁর কাছে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। যেমন জান মোহাম্মদ। আবার কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে তাঁর কাছে এসে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে কমবেশী দু'শ' জন তাঁর খানকা শরীফে অবস্থান করতেন এবং তিনি উত্তমভাবেই তাদের জিম্মাদারী আদায় করতেন। এহেন পূর্ণ মর্যাদা সত্ত্বেও সর্বদাই তাঁর স্বভাবে সীমাহীন এনকেছারী (বিনয়) প্রকাশ পেতো। একদিন একটি কুকুর তাঁর ঘরে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, এলাহী! আমি কে, যে তোমার বন্ধুগণের ওসিলা হবো। তুমি তোমার এ মাখলুকটির সদকায় আমার উপর দয়া করো। এভাবে আমার কাছে কেউ হকের অন্বেষণে এলে আমি তাদের নৈকট্যের ওসিলা বানাই।

তাঁর আমল অধিকাংশ হতো হাদিস শরীফ মোতাবেক। তিনি হজরত শাহ ওলিউল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভীর ফরজন্দগণের মধ্য হতে কোনো একজনের কাছ থেকে হাদিসের সনদ গ্রহণ করেছিলেন [৩]। তাছাড়া স্বীয় মোর্শেদ মির্জা মাযহার র. এর কাছ থেকেও এলমে হাদিসের সনদ লাভ করেছিলেন। তাঁর কোরআন মজীদ হেফজ ছিলো। কিন্তু লোকেরা তা জানতো না। তিনি খুব অল্পসময় নিদ্রা যেতেন। তাহাজ্জুদের সময় তিনি নিদ্রামগ্নদেরকে ডাকিয়ে দিতেন। নিজে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তেন। তারপরে মোরাকাবা এবং কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল হয়ে যেতেন। দৈনিক দশ পারা কোরআন তেলাওয়াত করতেন তিনি। শারীরিক দুর্বলতা দেখা দিলে এর চেয়ে কম করতেন।

ফজরের নামাজ আউয়াল ওয়াক্তে জামাতের সাথে আদায় করতেন। তারপর এশরাক পর্যন্ত মোরাকাবার হালকা চলতো। অধিক লোকসমাগমের কারণে একাধিকবার মোরাকাবার হালকা চালাতেন। প্রথম বারের লোক চলে গেলে তাদের জায়গায় পরবর্তী জামাত বসে যেতো। তারপর মুরিদানকে হাদিস ও তাফসীরের দরস দিতেন। কেউ তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য এলে তাকে অল্প সময় দিয়ে বিদায় দিয়ে দিতেন এবং তাদের কাছে ওজরখাহী পেশ করে বলতেন,

ফকীর এ সময় কবরের চিন্তায় ব্যস্ত। তাদেরকে মিষ্টান্ন বা অন্য কিছু তোহফা দিয়ে বিদায় দিতেন।

একবার গাওছুল আযমের কোনো এক আওলাদ এবং হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ'র নাতি নবাব মোহাম্মদ মীর খান তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁর পিতামহের বুজুর্গীর কারণে তিনি তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করলেন। তাঁর সাথে সামান্য সময় বসার পর ওজর পেশ করে তাঁকে বিদায় দিয়ে দিলেন। কিন্তু মহব্বতের প্রাবল্যের কারণে সেখান থেকে উঠে যেতে নবাবের মন চাচ্ছিলো না। তিনি তখন তাঁর খাদেমকে বললেন, বাড়ির চাবি এনে নবাব সাহেবকে দিয়ে দাও। তিনি তো উঠতে চাচ্ছেন না। কাজেই বাড়িটি তাঁকে দিয়ে দাও। আমি বরং নিজেই বাড়ি ছেড়ে চলে যাই। একথা শুনে নবাব সাহেব সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন।

সূর্য ঢলে পড়ার কাছাকাছি সময়ে তিনি সামান্য খানা খেতেন। আমীর ওমরাগণের বড়লোকী খানা যা তাঁর জন্য পাঠানো হতো, তা তিনি নিজে আহার করতেন না। এমনকি মুরিদগণের জন্যও তা তিনি মাকরূহ মনে করতেন। তবে সে সমস্ত খাবার প্রতিবেশীদের মধ্যে অথবা কোনো আগন্তুক এলে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। কখনও কখনও পাতিল উন্মুক্ত করে রেখে দিতেন, কেউ ইচ্ছা করলে যেনো তা থেকে আহার করে নিতে পারে। কেউ যদি তাঁর কাছে নগদ কোনো অর্থ পাঠাতেন, আর সে অর্থের বিষয়ে কোনো রকমের সন্দেহ না হতো, তখন বছর অতিক্রম করার পূর্বেই তা থেকে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ পৃথক করে নিতেন— যা ইমাম আজম র.এর মতে জাকাতের নেসাব হওয়ার শর্ত। তিনি এরকম করতেন একারণে যে— নফল দান সদকার চেয়ে ফরজ সদকার (জাকাতের) সওয়াব অধিক। তারপর বাকী অর্থ দিয়ে পীরানে কেরাম, বিশেষ করে খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ র. এর নিয়াজের উদ্দেশ্যে হালুয়া তৈরী করে দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। নিজের ওয়ালেদ সাহেবের জন্যও নিয়াজ তৈরী করতেন। খানকার ফকীর দরবেশদের জন্য খরচ করতে গিয়ে যে ঋণ হতো এ সব অর্থ দিয়ে তিনি তাও পরিশোধ করতেন। কোনো অভাবী ব্যক্তি তাঁর কাছে এলে তিনি তাদেরকে অর্থ প্রদান করতেন। আবার কেউ তাঁকে না জানিয়ে সেখান থেকে কিছু নিয়ে গেলে তিনি সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতেন— দেখেও দেখতেন না।

কোনো কোনো লোক তাঁর খানকার কুতুবখানা থেকে কিতাব নিয়ে যেতো। ওই কিতাবই আবার তাঁর কাছে বিক্রি করার জন্য নিয়ে আসতো। তিনি কিতাবের প্রশংসা করতেন এবং তার মূল্য দিয়ে দিতেন। কেউ যদি বুঝিয়ে দিতো, হজরত এ কিতাবখানি তো আপনার কুতুবখানারই। আর এতে আপনার কুতুবখানার

সিলমোহর রয়েছে, তখন তিনি অতুষ্ট হতেন এবং এরকম করতে নিষেধ করতেন। বলতেন, একজন কাতেব তো অনেক কিতাবই লিখে থাকেন।

তিনি দুপুরের আহারের পর কায়লুলা করতেন। তারপর ধর্মীয় গ্রন্থ যেমন নফহাতুল উনস, আদাবুল মুরিদীন [৪] ইত্যাদি পাঠ করতেন এবং প্রয়োজনীয় লেখার কাজে মশগুল হতেন। নামাজ আদায় করার পর তাফসীর ও হাদিসের দরস দিতেন। তারপর আসরের নামাজ আদায় করতেন। আসরের পর আবার হাদিস ও তাসাউফের পুস্তকাদি যেমন মকতুবাতে ইমামে রব্বানী, আওয়ারেফুল মাআরেফ এবং রেসালায়ে কুশাইরিয়া ইত্যাদি পাঠ করতেন। তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত হালকায়ে জিকির ও তাওয়াজ্জোহ প্রদানে মশগুল থাকতেন। মাগরিবের নামাজের পর খাস খাস মুরিদানকে তাওয়াজ্জোহ দিতেন। রাতের আহারের পর এশার নামাজ পড়তেন। রাতের অধিকাংশ সময় বসে বসে জিকির ও মোরাকাবায় অতিবাহিত করতেন। নিদ্রা প্রবল হলে জায়নামাযেই ডান কাতে শুয়ে পড়তেন। কখনও কখনও চৌকিতেও শয়ন করতেন। তবে একথা জানা যায়নি যে, তিনি কখনও পা লম্বা করে শয়ন করেছেন কিনা। অধিকাংশ সময় সাবধানতার পরিপ্রেক্ষিতে যেমন রসুলেপাক স. থেকে বর্ণিত আছে এবং গাউছুল আজম থেকে সাব্যস্ত আছে, সেভাবে মোরাকাবায় বসতেন। চূড়ান্ত লজ্জাশীলতার কারণে শয়নকালে তিনি পা লম্বা করতেন না। এমনকি তাঁর ইনতেকালও হয়েছিলো এমন অবস্থায়। নজর ও নেওয়ায যা পেতেন, দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। তাঁর মোটা ও অমসৃণ পোশাক পরিধান করার অভ্যাস ছিলো। কেউ উৎকৃষ্টমানের পোশাক পাঠালে তিনি তা বিক্রয় করে দিতেন। ওই টাকায় ক্রয় করতেন কম দামের কয়েকটি কাপড়। সেগুলোও দান করে দিতেন। অন্যান্য জিনিসের বেলায়ও এরকম করতেন। এক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো, একজনের চেয়ে অধিক জন পরিধান করাই উত্তম। রসুলেপাক স. এরও অধিকাংশ সময়ের আমল এ রকম ছিলো। তিনিও মোটা কাপড় পরিধান করতেন। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. এর পবিত্র উত্তরীয় ছিলো মোটা কাপড়ের। আর লুঙ্গি ছিলো পুরানো। এ রকম পোশাক পরিহিত অবস্থায়ই তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যান।

হজরত শাহ গোলাম আলী দেহলভী ছিলেন উচ্চস্তরের দানশীল। গোপনীয় দানকে তিনি খুব পছন্দ করতেন। হালকার সময়ও লোকদেরকে দান করতেন। তাঁর মধ্যে লজ্জাশীলতা এতো প্রবল ছিলো যে, মানুষের শেকেলের দিকে নজর করা তো দূরের কথা, নিজের শেকেলও আয়নাতে দেখতেন না। তিনি মোমেনদের প্রতি এতোই দয়ার্দ্র ছিলেন যে, রাতের অধিকাংশ সময় তাদের জন্য দোয়া করতেন। হাকীম কুদরতুল্লাহ খান নামে এক ব্যক্তি তার প্রতিবেশী ছিলো। সে

অধিকাংশ সময় তাঁর গীবত করতো। একবার কোনো কারণে সে গ্রেফতার হয়েছিলো। তাকে মুক্ত করে আনার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

তাঁর মজলিশে দুনিয়াদারীর কোনো আলোচনা হতো না, কোনো আমীর বা ফকীরের আলোচনাও হতো না। এ যেনো সুফিয়ান সওরীর মজলিশেরই দৃশ্যান্তর। তাঁর সামনে কেউ কারও গীবত করলে তিনি বলতেন, প্রকৃতপক্ষে মন্দ আমার মধ্যেই রয়েছে। তাঁর সামনে কোন এক ব্যক্তি শাহ্ আলম বাদশাহ্র দুর্নাম করছিলো। তিনি তখন ছিলেন রোজা অবস্থায়। বললেন, আফসোস! আমার রোজা নষ্ট হয়ে গেলো। একথা শুনে একজন বললো, হজরত! আপনিতো কারও গীবত করেননি। তিনি বললেন যদিও আমি তা করিনি, তবে আমি শুনেছি যে, গীবতকারী এবং শ্রবণকারী উভয়ই সমান।

সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিলো। বাদশাহ্দেরকে তিনি কঠোরভাবে শাসাতেন এবং এ ব্যাপারে কাউকে কখনও ভয় করতেন না। এক মকতুবে উল্লেখ আছে, তিনি আকবর শাহকে কঠোরভাবে শাসিয়েছিলেন[৫]। সাইয়্যেদ ইসমাঈল মাদানী রসুলেপাক স. এর নির্দেশে তাঁর খেদমতে হাজির হয়েছিলেন। তাঁরই নির্দেশে তিনি দিল্লীর জামে মসজিদে রক্ষিত রসুলেপাক স. এর আছার (হজরতবাল) জিয়ারতের জন্য গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, সেখানে রসুলেপাক স. এর বরকতসমূহ অনুভূত হলেও কুফুরের জুলমতও সেখানে বিদ্যমান। অনুসন্ধান চালানো হলো। দেখা গেলো সেখানে কোনো কোনো আকাবেরের প্রতিকৃতি রাখা হয়েছে। তিনি বাদশাহ্কে লিখে জানালেন। তারপর সে সব সেখান থেকে বের করে আনা হলো।

বুন্দেলখণ্ডের রইস নবাব শমশের বাহাদুর একবার ইংরেজদের টুপী পরিধান করে তাঁর খেদমতে হাজির হলেন। তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে টুপী পরিধান করতে নিষেধ করলেন। নবাব সাহেব বললেন, যদি এরকমই শাসানো হয়, তাহলে আর আপনার এখানে আসবো না। তিনি বললেন, আল্লাহ্ যেনো আপনাকে আমার এখানে না আনেন। নবাব রেগে গেলেন এবং দালানের বারান্দায় সিঁড়ি পর্যন্ত গেলেন। তারপর টুপীটি খাদেমকে দিয়ে ফিরে এলেন এবং বায়াত গ্রহণ করলেন। কাউকে কাউকে তিনি নম্রতার সাথে শাসাতেন। কেনোনা শাসন প্রথম প্রথম নম্রতার সাথেই হওয়া উচিত।

মীর আকবর আলী বলেছেন, আমার চাচা দাড়ি রাখেননি। একবার তিনি হজরত শাহ গোলাম আলীর খেদমতে হাজির হলেন। তার এরকম অবস্থা দেখে তিনি নম্রতার সাথে বললেন, আশচর্যের বিষয়! পীর সাহেবের দাড়ি নেই। তারপর বিষণ্নভাবে বললেন, এদেশে ইসলামের যা কিছু হয়েছে তা আপনার খান্দানের

দ্বারাই হয়েছে। আমরা তো আপনাদের গোমস্তা মাত্র। এরপর থেকে তিনি আর কখনও দাড়ি মুণ্ডন করেননি।

দুনিয়ার প্রতি নির্লিপ্ততা এমন ছিলো যে, ওই সময়ের বাদশাহ্ এবং অন্যান্য আমীর শ্রেণীর লোকেরা আকাঙ্খা করতেন তাঁর খানকার খরচের জন্য কিছু অনুদান নির্দিষ্ট করতে। কিন্তু তাঁর জবানে শোনা যেতো এই পঙ্ক্তিগুলোর আবৃত্তি—

খাক নশিনী আস্ত সুলায়মানিম
নেক বুদ আফসর সুলতানিম
হাস্তে চেহেল ছাল কেমী পুশমাশ
কেহনা নাশাদ খিলআত উরইয়ানিম

অর্থ ঃ মাটিতে বসবাসই আমাদের জন্য বাদশাহী। আমাকে বাদশাহী যিনি দান করেছেন, তিনি ক্ষমতাবান ও দয়ালু। চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলো— তিনি আমাকে যে পোশাক পরিধান করিয়েছেন, তা এখনও পুরানো হয়নি।

টুঁক এর শাসনকর্তা নবাব আমীর খানও এরকম আরজু করেছিলেন। তখন তিনি শাহ রউফ আজম সাহেবেকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি যেনো এই পঙ্ক্তিগুলো আমীর খানের নিকটে লিখে পাঠান—

মা আবরায়ে ফেকের ও কেনাআত নবী করীম
বা মীর খান বগুই কে রুযি মোকাদ্দার আস্ত

অর্থ ঃ আমরা দারিদ্র ও অল্পে তুষ্টির আবরুকে নষ্ট হতে দিবো না। আমীর খানকে বলে দাও, রিযিক নির্ধারিতই থাকে।

তিনি অনেক সময় বলতেন, আমাদেরকে জায়গীর দেয়ার ওয়াদা তো আল্লাহ্তায়ালা করে রেখেছেন। যেমন বলেছেন 'ওয়াফিস্সামায়ি রিযকুকুম ওয়ামা তুআদূন' (এবং আসমানে তোমাদের জন্য রিযিক রয়েছে তোমাদেরকে যার অঙ্গীকার দেয়া হচ্ছে) [৬]।

আল্লাহ্তায়ালা তাঁর যাবতীয় ধর্মীয় ও জাগতিক প্রয়োজন মিটিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, খানকার খরচাদি গায়েব থেকে পুরা করে দেয়া হয়। তবে এর জন্য চারটি জিনিস অপরিহার্য— ভাঙা হাত, ভাঙা পা, বিশুদ্ধ দ্বীন ও সঠিক আকীদা।

জীবনের শেষ দিকে তাঁর শারীরিক দুর্বলতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিলো। কিন্তু তিনি যখন এই শের পাঠ করতেন, তখন শত দুর্বলতার মধ্যেও উঠে বসে যেতেন এবং দৃঢ়তার সাথে মুরিদানকে তাওয়াজ্জোহ প্রদান করতেন।

হারচান্দ পীর ও খাস্তা দেল ও নাতোয়াঁ শুদম
হার গাহ কে ইয়াদ রুয়ী কারদাম জওয়াঁ শুদম

অর্থঃ যদিও আমি বৃদ্ধ, হৃদয় আমার ভগ্ন ও শরীর দুর্বল, কিন্তু যখনই বন্ধুর চেহারার খেয়াল করি তখন আমি যুবক হয়ে যাই।

রসুলেপাক স. এর প্রতি তাঁর এশক-মহব্বত ছিলো প্রগাঢ়। তাঁর নাম উচ্চারণ করলে অস্থির হয়ে যেতেন। একবার তাঁর খাদেম কদম মোবারকের পানির তবাররুক নিয়ে বললো, হজরত! আপনার উপর রসুল পাক স. এর ছায়া হোক। একথা শোনা মাত্র তিনি অস্থির হয়ে উক্ত খাদেমের ললাটে চুম্বন করে বললেন, আমি কী এমন যে, আমার উপর হজরত রসুলেপাক স. এর পবিত্র ছায়া পতিত হবে?

যখন তিনি মৃত্যুব্যাধিতে আক্রান্ত, তখন তাঁর সীনার উপর তিরমিযী শরীফ ছিলো। হাদিসের মাধ্যমে যখন তিনি রসুলেপাক স. এর কোনো আমল জানতে পারতেন, তখনই সেই মোতাবেক আমল শুরু করে দিতেন। তিনি বকরীর রানের গোশত চেয়ে আনতেন এবং তা রান্না করতেন। কেনোনা বকরীর রানের গোশত খাওয়া সুন্নত। কোরআন তেলাওয়াতের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিলো। আউয়াবীন ও তাহাজ্জুদের নামাজে আমার (শাহ আবদুল গনী) পিতা হজরত শাহ আবু সাঈদ মোজাদ্দেদী আমার কাছ থেকে কোরআন মজীদের খতম শুনতেন। কখনও কখনও মহব্বতের প্রাবল্যে আরও বেশী শুনতেন এবং অস্থির হয়ে বলতেন, বন্ধ করো। এর চেয়ে বেশী শোনার শক্তি আমার নেই। অধিকাংশ সময় ওযিফামূলক শের শ্রবণ করতেন। এতে করে তাঁর মধ্যে ওজদ এসে যেতো। কিন্তু যেহেতু তিনি দৃঢ়তার পাহাড় ছিলেন, তাই নিজেকে সংবরণ করে নিতেন। যেমন ছিলেন হজরত জুনায়েদ বাগদাদী র.। একবার জুনায়েদ বাগদাদী কোনো এক মজলিশে উপস্থিত ছিলেন। আর আবুল হাসান নুরী ছিলেন নৃত্যের আবেশে আচ্ছন্ন। তিনি বলে উঠলেন— 'ইন্নামা ইয়াস্তাজীবুল লাজীনা ইয়াস্মাউন' (যারা শ্রবণ করে শুধু তারাই ডাকে সাড়া দেয়)। জুনায়েদ বাগদাদী বললেন— 'ওয়াতারল জিবালা তাহসাবুহা জামিদাতাওঁ ওয়াহিয়া তামুররু মাররাস্ সাহাব' (তুমি পর্বতমালা দেখছো, মনে করছো, উহা অচল, অথচ উহারা হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় সঞ্চরণমান)।

পরিশিষ্ট লেখক (শাহ আবদুল গনী) বলছেন, মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় কখনও কখনও চিশতিয়া তরিকার নেসবত প্রকাশ পায়, যা হজরত মোজাদ্দেদ র. এর পিতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আসে [৯]। তাছাড়া পূর্ণ স্থিরতা থাকা সত্ত্বেও অকস্মাৎ হজরত মোজাদ্দেদ র. থেকে যওক শওক পাওয়া যায়। যেমন কবি বলেছেন—

খুবী ও শেকেল ও শামায়েলে হারাকাত ও সাকানাত
আঁচে খুঁবা হামা দারান্দ তু তানহা দারী।

অর্থঃ খাসিয়াত, অভ্যাস, সুরত ও সীরতের সৌন্দর্য, যা অন্য প্রিয়জনদের মধ্যে পাওয়া যায়, তোমার মধ্যে তা সন্নিবেশিত হোক।

সুবহানাল্লাহ্! আলোচনা কোথা থেকে কোথায় চলে গিয়েছে। এখন মূল আলোচনায় ফিরে আসছি।

শাহ গোলাম আলী দেহলভীর তবীয়ত এতো নাজুক ছিলো যে, কেউ দূরে কোথাও তামাকের ধোঁয়া ছাড়লে তিনি নারাজ হয়ে যেতেন। ঘরের মধ্যে আগরের ধোঁয়া দিতেন এবং বলতেন, আফগাণীরা আমাদের মসজিদকে ছাইদানী বানিয়ে ফেলেছে।

আমি (আবদুল গনী) কোনো কোনো লোকের কাছ থেকে শুনেছি, তাঁর ঘর থেকে হঠাৎ কখনও কখনও খোশবু বের হতো। তিনি লোকদেরকে বাইরে বের করে দিতেন। কেনোনা তখন হজরত রসুল পাক স. এবং অন্যান্য পীরানে কেরামের রূহের আবির্ভাব ঘটতো।

একবার আমার এক পার্শ্ব বোধশক্তিহীন হয়ে গেলো। আমি হজরত মোজাদ্দেদ র.এর রূহের কাছে সাহায্য চাইলাম। দেখলাম তাঁর সুরত (পবিত্র চেহারা) শূন্যে ভাসছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত ব্যাধি দূর হয়ে গেলো।

তিনি (শাহ গোলাম আলী) বলতেন, চিশতিয়া তরিকার আকাবেরগণের হালকার মহব্বতের প্রেরণা ও সেমা দ্বারা সালেকের অন্তরে রঙ-বেরঙের শওক পয়দা হতো এবং সে শওক বন্ধুর চেহারা থেকে পর্দা উন্মোচিত করে দিতো। আমাদের নকশ্‌বন্দিয়া তরিকার হালকায়ও মহব্বতের জোশ পয়দা হয়। কিন্তু সালেকগণের কলবে হাদিস ও ওজীফার প্রেরণা দান করে।

হজরত গোলাম আলী যখন রসুলেপাক স. এর পবিত্র নাম মুখে উচ্চারণ করতেন তখন আহ্ উহ্ করতে করতে দুই হাত উপরে ওঠাতেন। আবার কখনও কখনও দু'হাত মেলে দিয়ে আবার একত্রে মিলাতেন। মনে হতো যেনো তিনি কাউকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিচ্ছেন।

যেমন মাওলানা রুমী বলেছেন−

মুসিয়া আদাব দানাঁ দীগারান্দ
সুখতায়ে জান ও রওয়ানাঁ দীগারান্দ

অর্থঃ হে মুসা! সালেকদের আদব এক রকম, আর মজযুবদের আদব অন্য রকম।

হজরত শাহ গোলাম আলী র. এর মলফুজাত

১। হজরত শাহ গোলাম আলী দেহলভী বলতেন, ফকীর শব্দের মধ্যে ফা বর্ণ দ্বারা ফানা (দীনতা) ক্বাফ বর্ণ দ্বারা কেনাআত (অল্পেতুষ্টি), ইয়া বর্ণ দ্বারা ইয়াদে ইলাহী এবং র বর্ণ দ্বারা রিয়াজত বুঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি এ চারটি গুণ অর্জন করতে পারবে, সে অর্জন করবে চারটি বৈশিষ্ট্য। যেমন ফা দ্বারা ফজলে খোদা (আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ), ক্বাফ দ্বারা কুরবে মাওলা (মাওলার নৈকট্য), ইয়া দ্বারা ইয়ারী (বন্ধুত্ব) এবং র দ্বারা রহমত। আর যদি চারটি গুণ অর্জন করতে না পারে, তা হলে তার জন্য লাভ হয় চারটি জিনিস। ফা দ্বারা ফযীহত (লজ্জিত হওয়া), ক্বাফ দ্বারা ক্বহর (গজব), ইয়া দ্বারা ইয়াস (নৈরাশ্য) এবং র দ্বারা রেসওয়ারী (অপদস্থতা)।

২। তিনি বলেছেন, যে আত্মিক স্বাদ ও প্রেরণাপ্রার্থী, কাশফ ও কারামত অন্বেষণকারী, সে আল্লাহ্‌কে অন্বেষণকারী হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে পরিশিষ্ট রচয়িতা (শাহ আবদুল গনী) কবি হাফিজের উক্তি উল্লেখ করেছেন এভাবে—

শরম মা বাদে আযইঁ খেরকা আলুদা খুদ
গার বদীনে ফজল ও করম নামে কারামাতে বরীম

অর্থঃ এ কারণেই মলিন পোশাক পরিধান করতে আমি লজ্জা অনুভব করি যে– যদি এই অনুগ্রহকে কারামত নাম দেয়া হয় ।

কবি হাফিজ আরও বলেছেন –

বা খারাবাত নশীনাঁ যে কারামাত মোলাফ
হার ছখন জায়ে ও হার নোকতা মাকানী দারাদ

অর্থ ঃ উপাসনালয়ে উপাসনাকারীদের সামনে কারামতের বর্ণনা দেয়া উচিত নয়। কেনোনা প্রত্যেক কথা ও সূক্ষ্মতার ভিন্ন ভিন্ন জায়গা আছে।

৩। তিনি বলেছেন, কামালতের মধ্যে অবাধ মিলন আছে। এ মাকামে সালেকের ভাগ্যে নৈরাশ্য এবং বঞ্চিত হওয়া ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। সর্বদাই তার মিলন হয়, কিন্তু হাসিল হয় না।

৪। তিনি বলেছেন, মুরিদকে প্রত্যেক এবাদতের হালের প্রতি ভিন্ন ভিন্নভাবে খেয়াল করা উচিত। নামাজের মাধ্যমে কী হাল পয়দা হয়, তেলাওয়াতের দ্বারা কী নেসবত প্রকাশ পায়, হাদিস পাঠ, মৌখিক ভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, শোগল ইত্যাদি দ্বারা কী ধরনের আত্মিক প্রেরণা আসে— এ সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। তার সাথে সাথে এও খেয়াল করতে হবে যে, সন্দিগ্ধ খাবারের কারণে তমসা কী পরিমাণ বৃদ্ধি পেলো? এভাবে অন্যান্য গোনাহ্‌র দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫। তিনি আরও বলেছেন, বেলায়েতের পথে খাতরাত (মনের মধ্যে চিন্তা সৃষ্টি হওয়া) ক্ষতিকর বিষয়। কিন্তু কামালাতে নবুওয়াতের মাকামে থাকা অবস্থায় ক্ষতিকর নয়। যেমন আমীরুল মুমিনীন হজরত ওমর রা. বলতেন, আমি নামাজ পড়া অবস্থায় সৈন্যবাহিনীও প্রস্তুত করি।

৬। তিনি বলেছেন, খাদ্যগ্রহণের মধ্যে দু'টি জিনিস রয়েছে— নফসের রেজা ও নফসের হক। নফসের রেজার খাদ্য (যে খাদ্য গ্রহণের উপর নফস রাজী থাকে) খুবই পবিত্র। নফসের হক হচ্ছে– ফরজ ও সুন্নত আদায়ের জন্য দুর্বলতা দূর করণার্থে খাদ্য গ্রহণ করা।

৭। নকশ্‌বন্দিয়া তরিকা চারটি জিনিসের নামান্তর ১. আপদহীনতা ২. স্থায়ী হুজুরী (চৈতন্য) ৩. জযবা (আকর্ষণ) ও ৪. ওয়ারেদাত (আত্মিক প্রাপ্তি)।

৮। তিনি বলেছেন, নবী করীম স. সমস্ত কামালাতের পূর্ণতাকারী ছিলেন। তাঁর ওই সকল কামালাতের বহিঃপ্রকাশ হতে থাকে বিভিন্ন সময়ে উম্মতের বিভিন্ন ব্যক্তিগণের মাধ্যমে তাদের যোগ্যতা অনুসারে। যে সকল কামালাত রসুলেপাক স. এর ফয়েজের ভাণ্ডার দেহ মোবারকের মধ্যে ছিলো— যেমন অনাহারে থাকা, জেহাদ ও ইবাদত করা, সে সবের ফয়েজ প্রবাহিত হয়েছিলো সাহাবা কেরামের মধ্যে। যে সকল কামালাত রসুলেপাক স. এর কলব মোবারকে ছিলো, যেমন ভাবে নিমজ্জিত হওয়া, আত্মহারা হওয়া, যওক-শওক, আহাজারী করা এবং তৌহিদের রহস্য— এসব হজরত জুনায়দ বাগদাদী র. থেকে উম্মতের আউলিয়া কেরাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। রসুলেপাক স. এর নফস লতীফার কামালাত, বাতেন জগতের নেসবতের মধ্যে লয় প্রাপ্তি ও স্থবিরতা আসা এসবকিছু হজরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ র. এর জামানা থেকে নকশবন্দিয়া তরিকার আকাবেরগণের মধ্যে কার্যকর হয়েছিলো। রসুলেপাক স. এর নাম মোবারক মোহাম্মদ স. এর কামালাত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর জামানায় প্রকাশ পেয়েছিলো।

৯। তিনি বলেছেন, হালাল অন্বেষণ করা মুমিনদের উপর যেরকম ফরজ, তেমনি হালাল (মোবাহ) বর্জন করা আরেফদের উপর ফরজ।

১০। তিনি বলেছেন, খাহেশাতের অন্বেষণকারী যে, সে আল্লাহ্‌র বান্দা হয় কেমন করে?

বন্ধু! যখন তুমি কোনো কিছুর খেয়ালে থাকো তখন তুমি তার গোলাম।

১১। তিনি বলেছেন, আহারবিহীন রজনী দরবেশদের জন্য শবে মেরাজ তুল্য।

১২। তিনি বলেছেন, সুফীকে দুনিয়া ও আখেরাত পিছনে ফেলে দিয়ে মাওলার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। যেমন মাওলানা রুমী বলেছেন—

মিল্লতে এশক যে মিল্লতে হা জুদাস্ত
আশেকাঁ রা মাযহাব ও মিল্লত খোদাস্ত

অর্থঃ এশকের জাতি সকল জাতি থেকে পৃথক। আশেকগণের মাযহাব ও জাতি হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাযহাব। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকারী জাতি।

১৩। তিনি বলেছেন, দোয়া করার সময় নূরসমূহ প্রবাহিত হয়। তবে দোয়া কবুলের আলামতে বরকতের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করা জটিল। কারও কারও ধারণা এরকম— দোয়াকারী যদি তার হস্তদ্বয়কে আবু জাহেল মনে করে, তবে তাকে সে দোয়া কবুলের আলামত মনে করতে পারে। তবে আমি (শাহ গোলাম আলী) বলি, দোয়া করার পরে যদি তার বক্ষ সম্প্রসারিত হয়েছে মনে হয়, তাহলে তা দোয়া কবুলের আলামত।

১৪। তিনি বলেছেন, বায়াত তিন প্রকারের। প্রথম— পীরানের কেরামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার জন্য। দ্বিতীয়— গোনাহ্সমূহ থেকে তওবা করার জন্য। তৃতীয়— বাতেনী নেসবত লাভের জন্য।

১৫। তিনি বলেছেন, মানুষ চার প্রকারের ১. নামরদ (নপুংশক) ২. মরদ (পুরুষ) ৩. বীর পুরুষ ও ৪. ফরদ (একক বা বিশেষ ব্যক্তি)। তন্মধ্যে দুনিয়া অন্বেষণকারী হচ্ছে নামরদ। আখেরাত অন্বেষণকারী মরদ।আখেরাত ও মাওলা অন্বেষণকারী বীর পুরুষ। আর মাওলা অন্বেষণকারী হচ্ছে ফরদ।

১৬। তিনি বলেছেন, খতরা (কল্পনা) চার প্রকার— শয়তানী, নফসানী, মালাকী ও হক্কানী। শয়তানী খতরা আসে বাম দিক থেকে। নফসানী খতরা আসে উপর দিক থেকে অর্থাৎ দেমাগ থেকে। মালাকী (ফেরেশতাজাত) খতরা আসে ডান দিক থেকে এবং হক্কানী খতরা আসে ফাও কাল ফাওক (উপরের উপর থেকে)।

১৭। তিনি বলেছেন, নবুওয়াত ছাড়া সমস্ত কামালাত একজন মানুষের মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়া সম্ভব। যেমন তার প্রকাশ ঘটেছিলো হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর মধ্যে।

রুবায়ী (চতুর্পদী)

হার লাতাফাত কে নাঁহা বুদ পাছে পর্দায়ে গায়েব
হামা দর সুরতে খুব তু আয়া সাখেতা আন্দ
হারচে বর সফহা আন্দীশা কুশাদ কিলকে খেয়াল
শেকলে মাতবুযা তু যীবাতর আযাঁ সাখেতা আন্দ।

অর্থঃ গায়েবের পর্দার পিছনে লুক্কায়িত সকল সূক্ষ্মতা ও পবিত্রতার পূর্ণতা তোমার উত্তম সুরতের মধ্যে উদ্ভাসিত করে দেয়া হয়েছে। ফিকিরের পৃষ্ঠার উপর খেয়ালের কলম যে চিত্র অংকন করেছে, তোমার সুরত তার চেয়েও সুন্দর।

১৮। তিনি বলেছেন, কেউ যদি রসুলুল্লাহ স. এর ওয়ায়সী (সরাসরি) মুরিদ হতে চায়, তাহলে এশার নামাজের পর খেয়ালের মাধ্যমে নিজের হাত দু'টি রসুলেপাক স. এর হস্তদ্বয়ের মধ্যে রেখে বলবে 'ইয়া রসূলাল্লাহি বাইয়া'তুকা আলা খামসিন শাহাদাতি আল লা ইলাহা ইল্লাল্লহ ওয়া ইক্বামিস্ সালাতি ওয়া ইতাইয্ যাকাতি ওয়া সাওমি রামাদ্বানা ওয়া হাজ্জিল বাইতি ইনিস্ তাত্ব'তা ইলাইহি সাবীলা' (হে আল্লাহ্র রসুল! আমি পাঁচটি বিষয়ের উপর আপনার নিকট অঙ্গীকারাবদ্ধ হচ্ছি– ১. সাক্ষ্য প্রদান করা যে আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। ২. নামাজ কায়েম করা ৩. যাকাত প্রদান করা ৪. রমজান শরীফের রোজা রাখা এবং ৫. হজ্জ করা। নিয়মিত কয়েক রাত্রি এরকম আমল করতে হবে। কেউ যদি কোনো বুজুর্গের ওয়ায়সী মুরিদ হতে চায়, তাহলে নির্জনে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়বে। তারপর ওই বুজুর্গের রূহের দিকে মোতাওয়াজ্জোহ হয়ে বসবে।

১৯। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা আমাকে এমন অনুভূতি দান করেছেন যে, আমার শরীর কলবের হুকুম রাখে। চারদিক থেকে যে সকল লোক আসে তাদের নেসবত আমার জানা হয়ে যায়।

২০। তিনি বলেছেন, তিনটি কিতাব অতুলনীয় ১. কোরআন শরীফ ২. সহী বোখারী শরীফ ও ৩. মাওলানা রুমীর মসনবী শরীফ।

২১। তিনি বলেছেন, ওলিআল্লাহ তিন প্রকারের হয়ে থাকেন – ১. কাশফধারী ২. অনুভূতিধারী এবং ৩. মূর্খ (নিজের নেসবত সম্পর্কে অজ্ঞ)।

২২। তিনি বলেছেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. এর যে রকম কামালাত ছিলো, সে রকম কামালাত অন্য কেউ অর্জন করেছেন কি না সন্দেহ আছে। তিনি যদি সকল ওলীর প্রতি তাওয়াজ্জোহ প্রদান করেন তবে তাঁরা রাজ পথে দৃশ্যমান হয়ে যাবেন।

২৩। তিনি বলেছেন, সাদী সিরাজী সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকার জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দু'টি সূক্ষ্ম কথার মধ্যে সমস্ত তাসাউফের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন—

মোরা পেশ দানায়ী মোর্শেদ শেহাব
দু আন্দরয ফরমুদ বর রুয়ে আব
একে আঁকে বর খেশ খুদবীন মুবাশ
দিগার আঁকে বর গায়ের বদবীন মুবাশ।

অর্থঃ আমার পীর ও মোর্শেদ শায়েখ শিহাবউদ্দী সোহরাওয়ার্দী নৌকার আরোহী অবস্থায় দু'টি নসীহত করেছিলেন। একটি— নিজেকে অগ্রাধিকার না দেয়া, আর অপরটি অপরকে মন্দ না জানা।

২৪। তিনি বলেছেন, যে আমার সাথে সম্পর্ক রাখে (বায়াত গ্রহণ করে) আমি যেরকম পোশাক পরিধান করি, তারও সে রকম পোশাক পরিধান করা উচিত। আমি যে রকম জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করি, তারও সেরকম জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত। যেমন এক চতুর্পদীতে বলা হয়েছে–

ইয়া মরু বা ইয়ারে আযরাক পিরহান
ইয়া বকশ বর খানমাঁ আংগশত নীল
ইয়া মকুন বা পীলবানান দুস্তি
ইয়া বনা কুন খানা দর খুরদে পীল

অর্থঃ নীল রঙের জামা পরিধানকারীর সাথে তুমি যেয়ো না। অথবা স্বীয় খান্দানের উপর নীলের আঙুল সঞ্চালন কোরো না। হাতিওয়ালাদের সাথে বন্ধুত্ব কোরো না। অথবা স্বীয় গৃহ এরকম বানিয়ো না যে, তাতে হাতি প্রবেশ করতে পারে।

২৫। তিনি বলেছেন, কোনো কোনো মুমিনের রূহ কবজ করে মালাকুল মউত। কিন্তু খাস ব্যক্তিগণের রূহের বেলায় ফেরেশতাদের কোনো এখতিয়ার নেই।

দর কুয়ী তু আশেঁকা চুনাঁ জান বদহন্দ
কা নেজা মালাকুল মওত না গুঞ্জদ হারগেজ

অর্থঃ আশেক তোমার গলিতে এমনভাবে জান দিয়ে দেয় যে, সেখানে মউতের ফেরেশতার কোনো দায়িত্ব পালন করতে হয় না।

এ প্রসঙ্গে শাহ আবদুল গনী বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেছেন– 'আল্লাহু ইয়াতা ওয়াফ্‌ফাল আনফুসা হীনামাওতিহা' (আল্লাহ্‌ই প্রাণ হরণ করেন জীবনসমূহের, তাদের মৃত্যুর সময়)[১০]। আবার মুমিনদের বেলায় বলেছেন– 'কুল ইয়াতা ওফ্‌ফাকুম মালাকুল মাওতি অর্থ ' (বলো, তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে) [১১]। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

২৬। তিনি বলেছেন, দরবেশগণের জন্য তাই-ই জরুরী, যা শায়েখ ইবনে ইয়াসীন করভী [১২] তাঁর কাব্যে বর্ণনা করেছেন—

নানজুয়েঁও খেরকা পেশীমন ও আবে শুর
ছিপারা কালাম ও হাদিসে পয়ম্বরী
হাম নোসখা দু'চার যে এলমীকে নাফে আস্ত
দর দীন না লগবে বু আলী ও ঝায়ে উনসুরী

অর্থ ঃ একজন মুসলমানের খানা পিনা, খোরাক, পোশাক, কোরআন পাক এবং হাদিস শরীফ এবং তার সাথে সাথে কিছু উপকারী এলেম জরুরী। বুআলী সীনার বেহুদা ও পদার্থ রসায়নের অতিরিক্ত শিক্ষা গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

তাছাড়া তিনি মাওলানা জামালীর এই চতুর্পদীখানিও পাঠ করতেন—

লুঙ্গি যের লুঙ্গি বালা   নী গম দজদনী গম কালা
কাযাক বুরিয়া ও পুস্তিকী   দলকী পর যে দরদ দুস্তিকী
ই কদর বাস বুদ জামালীরা   আশেকে রন্দ লা উবালী রা

অর্থ ঃ একটি চাদর উপরে এবং একটি চাদর নিচে— এই হচ্ছে আমার দেহের পোশাক। এর জন্য চুরির চিন্তাও নেই, নেই ডাকাতির আশংকাও। বন্ধুগণের হালকা এবং চাটাই চামড়ার পোশাক, তালি দেয়া পোশাক, যা বন্ধুগণ মনের দরদ মিশিয়ে পরিধান করে, জামালীর জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট।

হাফেজ সিরাজীর এই কবিতাটিও তাঁর হালের বিবরণ বলা যেতে পারে–

দু ইয়ারে যীরক ও আয বা জারা কাহান দুমনী
ফারাগাতী ও কিতাবী ও গুশা চেমনী
মান ই মাকাম ব দুনিয়া ও আখেরাত নাদ হাম
আগার চে দর পীয়ম আফতান্দ হার দম আঞ্জু মনী
ঘার আকে কুঞ্জ কেনাআত ব গঞ্জে দুনিয়া দাদ
ফরুখতে ইউসুফমিসরী ব কমতরীন ছামানী

অর্থ ঃ দু'জন জ্ঞানী বন্ধুর পরিবর্তে বহুল পরিমাণের সম্পদ পুরানো শরাব তুল্য। দুশ্চিন্তামুক্ত সময়, কিতাব আর– বাগানের একটি কোণা যদি পাই, তাহলে আমি তা দুনিয়া ও আখেরাতের বিনিময়েও বিক্রয় করবো না। অনেক অনেক লোক চাইলেও এই মাকাম আমি কাউকে দিবো না। যে ব্যক্তি অল্পে তুষ্টি নামক গৃহকোণ দুনিয়ার খাজানার বিনিময়ে দিয়ে দেয়, সে যেনো মিশরের নবী ইউসুফের রাজত্বকে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে দিলো।

২৭। তিনি বলেছেন, নূরানী আকল তা-ই, যা কোনো মাধ্যম ছাড়াই মনজিলে মকসুদের পথ দেখায়। আর তমসাচ্ছন্ন আকল তা-ই, যা মোর্শেদের পথপ্রদর্শনের মাধ্যমে পথপ্রাপ্ত হয়।

২৮। তিনি বলেছেন, তালেবে মাওলার উচিত, এক মুহূর্তও মাওলার স্মরণ থেকে গাফেল না থাকা।

ই শরবতে আশেকীস্ত খসরু–
বে খুনে জিগর চুশীদন তোয়া

অর্থ ঃ হে খসরু! ভালোবাসার শরবত পান করা যায় না কলিজার রক্তের মিশ্রণ ছাড়া।

২৯। তিনি বলেছেন, দুনিয়ার মহব্বত সকল গোনাহ্‌র মূল। আর এটাই হচ্ছে আসল কুফুরীর গোনাহ্‌।

আহলে দুনিয়া কাফেরা মোতলাক আন্দ
রোজ ও শব দর বক বক ও দর যক যক আন্দ

অর্থঃ শুধুই দুনিয়া অন্বেষণকারী যারা তারা সাধারণ কাফের। রাতদিন তারা শুধু বক বকই করে চলে।

৩০। তিনি বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে যাওয়াল বা দূরীভূত হওয়া বলতে বুঝায় সালেকের 'আমি' বলাটা রহিত হয়ে যাওয়া। খাজা আহরার র. এ প্রসঙ্গে বলেছেন 'আনালহক' বলা সহজ। কিন্তু 'আনা' (আমিত্ব) কে দূর করা কঠিন।

৩১। তিনি বলেছেন, মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় চারটি ফয়েজ আছে। নকশবন্দিয়া, কাদেরিয়া, চিশতিয়া এবং সোহরাওয়ার্দিয়া। তবে এর মধ্যে নকশ্‌বন্দিয়া তরিকার নেসবতই প্রবল।

৩২। তিনি বলেছেন, তরিকতের ক্ষেত্রে কুফর হচ্ছে প্রভেদ উঠে যাওয়া এবং হক তায়ালার স্বাদ ব্যতীত অন্য কোনো কিছু নজরে না আসা। এ কারণেই মনসুর হাল্লাজ বলেছিলেন– 'কাফারতু বিদীনিল্লাহি ওয়াল কুফরু ওয়াজিবুন লাদায়্যা ওয়া ইন্দাল মুসলিমীন কবীহুন' (আমি আল্লাহ্‌র দীনকে অস্বীকার করেছি। এ অস্বীকার করা আমার নিকট ওয়াজিব। আর মুসলমানদের নিকট মন্দ)।

৩৩। তিনি বলেছেন, কেউ যদি খেদমত পেতে চায়, তাহলে সে যেনো মোর্শেদের খেদমত করে।

হারকে খেদমত কার্দ উ মাখদুমে শুদ–

৩৪। তিনি বলেছেন, এখন তো আমি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি। এর আগে আমি শাহানাবাদের জামে মসজিদের হাওজের তিক্ত পানি পান করে কালাম মজীদের দশ পারা করে তেলাওয়াত করতাম এবং দশ হাজার বার নফী ইছবাতের জিকির করতাম। আমার বাতেনী নেসবত এতোই শক্তিশালী ছিলো যে, পুরো মসজিদ নূরে ভরপুর হয়ে যেতো। যে গলি দিয়ে আমি হেঁটে যেতাম, সে গলিই নূরানী হয়ে যেতো। কারও মাজারে গেলে মাজারবাসীর নেসবত নিম্নগামী হয়ে যেতো।

আমিও আমার নেসবত নিম্নগামী করে দিতাম এবং সেখানকার বুজুর্গের প্রতি বিনয় প্রকাশ করতাম।

যে নাতওয়ানী খুদ ই কদর খবর দারম
কে আয রুখশ নাতোয়ানম কে দীদাবর দারম

অর্থঃ আমি আমার কমজোরি এরকম বর্ণনা করতে পারি যে, বন্ধুর চেহারা থেকে নিজের দৃষ্টিও সরিয়ে নিতে পারি না।

শায়েখ গোলাম আলী দেহলভী র. এর কাশফ ও এলহামসমূহ

১। শায়েখ গোলাম আলী দেহলভী বলেছেন, একদিন আমি রসুলেপাক স. এর বিরহযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে অস্থির হয়ে মাথার উপরে মাটি তুলে নিয়েছিলাম। যেহেতু এরূপ কার্য শরীয়তের দৃষ্টিতে ভালো নয়, তাই আমার অন্তর্দেশ (বাতেন) তমসাচ্ছন্ন হয়ে গেলো। ওই সময় আমি মির্জা মাযহারের খলীফা মীর রূহুল্লাহকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি বললেন, রসুলেপাক স. আপনার প্রতীক্ষায় আছেন। আমি অত্যন্ত শওকের সাথে রসুলেপাক স. এর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি আমার সাথে মোআনাকা করলেন। মোআনাকার সময় পর্যন্ত তিনি নিজের শেকেলে বিদ্যমান ছিলেন। তারপর তিনি সাইয়্যেদ আমীর কুলালের শেকেল ধারণ করেন।

২। তিনি বলেছেন, একদিন আমি এশার নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রসুলেপাক স. তশরীফ নিয়ে এসে এ রকম কাজ করতে নিষেধ করলেন এবং এ কাজের নিন্দা করলেন।

৩। এক রাতে আমি রসুলেপাক স. কে স্বপ্নে দেখে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! 'মান রাআনী ফাক্বাদ রাআল হক [১৩] (যে আমাকে স্বপ্নে দেখলো সে সত্যই আমাকে দেখলো) এটা কি আপনারই হাদিস? তিনি উত্তরে বললেন, হাঁ।

৪। আমার অভ্যাস ছিলো, সব সময় আমি রসুলেপাক স. এর রূহ মোবারকে সুবহানাল্লাহ আলহামদু লিল্লাহ পড়ে সওয়াব রেছানী করতাম। একবার আমার এই আমলটি বাদ পড়ে গেলো। দেখলাম, শামায়েলে তিরমিযীতে যে রকম আকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে, রসুলেপাক স. সেই আকৃতিতে তশরীফ আনলেন এবং আমল ছেড়ে দেয়ার কারণে অভিযোগ করলেন।

৫। একবার আমার নিকটে দোযখের আগুনের ভয় প্রবল হয়ে উঠলো। আমি রসুলেপাক স. কে দেখলাম। তিনি তশরীফ আনলেন এবং আমাকে বললেন, যে আমাকে ভালোবাসে সে দোযখে যাবে না।

৬। একবার আমি রসুলে পাক স. কে দেখলাম। তিনি বললেন, তোমার নাম আবদুল্লাহ এবং আবদুল মুহাইমেন।

৭। একবার আমি স্বপ্নে দেখি, আমার চেহারার গোশত দু' আঙুল পরিমাণ সুলতানুল মাশায়েখ হজরত নিজামউদ্দীন আউলিয়ার চেহারা মোবারকের মতো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দেখতে অসুন্দর দেখাচ্ছে না।

৮। একবার আমি দেখলাম, এক ব্যক্তি হজরত সুলতানুল মাশায়েখ নিজামউদ্দীন আউলিয়া র. এর একটি জামা নিয়ে এসে বলছে, ইনি আপনার পীর। আমি বললাম, আমার পীর তো মির্জা মাযহার। লোকটি একথা কয়েকবার বলার পর বললো, হজরত নিজামউদ্দীন আউলিয়া আপনার পীর সোহবতের দিক দিয়ে।

৯। একবার হজরত মোজাদ্দেদ র. তশরীফ এনে আমাকে বললেন, তুমি আমার খলীফা।

১০। একবার হজরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ র. তশরীফ আনলেন এবং আমার জামার মধ্যে প্রবেশ করলেন।

১১। একদিন এক বুজুর্গ এসে আমার নিকটে বসলেন। আমি তাঁর নাম জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, বাহাউদ্দীন।

১২। একবার এক ব্যক্তি একটি বরকতের জামা নিয়ে এসে বললো, এটি গাওছুল আজম র. আপনাকে দান করেছেন। মাওলানা খালেদ বললেন, এটি হয়তো কুতুবিয়াতের জামা হবে। শাহ গোলাম আলী দেহলভী র. বললেন, আমি বিনয়বশতঃ এই মাকামটির কথা উল্লেখ করিনি।

১৩। হজরত গোলাম আলী দেহলভী বলেন, একবার আমি হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. এর মাজারে গেলাম। তাঁর কাছে তাওয়াজ্জোহের নিবেদন জানালাম। হজরত মাজার থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে তাওয়াজ্জোহ প্রদান করলেন। দুপুরের সময় ছিলো। তাই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। তারপর শুধু আফসোসই করলাম। কেনো যে এতো তাড়াহুড়া করলাম। তাঁর তাওয়াজ্জোহে এমন হাল হয়েছিলো, যা বর্ণনাতীত।

১৪। তিনি বলেছেন, একদিন আমি হজরত খাজা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী র. এর মাজারে গিয়ে বললাম শাইআল্লিল্লাহ, শাইআল্লিল্লাহ (আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দান করুন) তখন পানিতে ভরপুর একটি হাউজ দেখলাম, যার পাড় উপচিয়ে পানি বাইরে গড়িয়ে পড়ছে। এলকা হলো, তোমার সীনা মোজাদ্দেদিয়া নেসবতে পরিপূর্ণ। এর অধিক জায়গা সেখানে নেই।

১৫। তিনি বলেছেন, একদিন আমি সুলতানুল মাশায়েখ হজরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়ার মাজারে গেলাম। তাঁর কাছে তাওয়াজ্জোহের দরখাস্ত করলাম। তিনি

বললেন, তোমার তো কামালাতে আহমদী হাসিল আছে। আমি আরয করলাম, আপনার নেসবতও আমাকে দান করুন। তিনি আমাকে তাওয়াজ্জোহ প্রদান করলেন। দেখতে পেলাম, তাঁর চেহারা আমার মতো হয়ে গিয়েছে, আর আমার চেহারা তাঁর মতো হয়ে গিয়েছে। আমি তাঁর থেকে অনেক হিস্‌সা (অংশ) লাভ করলাম।

১৬। তিনি বলেছেন, একবার আমি হজরত খাজা মোহাম্মদ যোবায়েরের উরসে হাজির হলাম। হজরত খাজা তশরীফ এনে বললেন, বেশী বেশী করে ইবাদত করো। এ পথে ইবাদত করা উচিত। এতে করে তাসাররুফের দরজা খুলে যাবে। আমি আরয করলাম, আপনার মতো মর্যাদা কীভাবে লাভ করা যায়? তিনি বললেন, বেশী বেশী ইবাদতের মাধ্যমে।

১৭। তিনি বলেছেন, একবার আমার ঘর সুগন্ধিতে ভরে গেলো। উপরের দিকে তাকানোর পর এক সুগন্ধিময় এবং আলোকিত রূহ দেখতে পেলাম। ওই আলোকিত রূহ থেকে সূর্যের মতো আলো বিকিরিত হচ্ছে। আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। একি ঘটনা! পরক্ষণেই আমার খেয়াল হলো, এ হয়তো রসুলেপাক স. এর পবিত্র রূহ অথবা রূহ গাউছুল আজমের।

১৮। একদিন খানকায় বসবাসকারীদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হলো। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. তশরীফ এনে বললেন, যারা ঝগড়া করে, তাদেরকে খানকা থেকে বের করে দাও।

১৯। একদা আমার গৃহে হজরত ফাতেমা রা. তশরীফ এনে বললেন, আমি তোমার জন্য জীবিত আছি।

২০। একবার আমি সন্দেহযুক্ত খাবার খেয়েছিলাম। দেখলাম হজরত মির্জা মাযহার খিচুনির সাথে শ্বাস গ্রহণ করছেন। বললেন, সব জায়গার খানা খাওয়া উচিত নয়।

২১। তিনি বলেছেন, একবার এলহাম হলো, কাইয়্যুমিয়াতের পদ তোমাকে দান করা হয়েছে।

২২। তিনি বলেছেন, একবার ইলহাম হলো, তোমার থেকে এক নতুন তরিকা জারী হবে।

২৩। তিনি বলেছেন, একবার আমি আমার বাড়ি প্রশস্ত করার জন্য আরয করলাম। এলহাম হলো, তোমার কোনো পরিবার পরিজন নেই। তারপরও এর অধিক আর প্রয়োজন কী?

২৪। একদিন আমি আমার প্রতিবেশীর বাড়িটি আমার প্রয়োজনে লাগাতে চাইলাম। এলহাম হলো, তুমি তোমার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিলে কেনো? তুমি তাদেরকে বাইরে বের করে দিয়েছো।

২৫। একদিন আমি হারামাইন শরীফাইন জিয়ারতের নিয়ত করে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এমন সময় এলহাম হলো, 'তোমার এখানে থাকাই উত্তম।'

২৬। তিনি বলেছেন, একদিন আমি বলেছিলাম, হে শায়েখ আবদুল কাদের! আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে কিছু দান করুন। এলহাম হলো, তুমি এরকম বলো— ইয়া আরহামার রহিমীন! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাকে কিছু দান করুন।

২৭। একদিন এলহাম হলো, হজরত সুলতানুল মাশায়েখ নিজামউদ্দীন তাঁর খলীফাগণকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেছেন। তুমি তোমার খলীফাগণকে কাবুল এবং বোখারায় প্রেরণ করো।

২৮। তিনি বলেছেন, আমার নিকট তিনবার এলহাম হয়েছে— আল্লাহ্‌র কালাম শব্দ ও সুর থেকে পবিত্র। একবার শুনেছিলাম মাদ্রাসায় আর দু'বার শুনেছি আমার বসত বাটিতে। অর্থাৎ খানকায়, যেখানে আমি অবস্থান করছিলাম।

২৯। তিনি বলেছেন, এক রাতে আমি বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আওয়াজ এলো, লাব্বাইকা ইয়া আবদুন সালেহ (হে নেক বান্দা আমি হাজির)।

হজরত শায়েখ গোলাম আলী দেহলভীর কতিপয় কারামত

আল্লাহ্‌র পথের সালেকগণের নিকট অবিদিত নয় যে, আল্লাহ্‌র মহব্বত ও নবী করীম স. এর অনুসরণের মতো কোনো কারামত ও অলৌকিকতা কিছু নেই। আর এ দু'টি বিষয় শায়েখ গোলাম আলী র. এর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিলো। তাঁর সবচেয়ে বড় কারামত ছিলো, তালেবগণের বাতেন জগতে পরিবর্তন সাধন এবং তাদের সীনার মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার ফয়েজ ও বরকত এল্‌কা করে দেয়া। আর এ বিষয়টি তাঁর জীবনে এতো অধিক মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছিলো, যা লিখে প্রকাশ করতে গেলে অনেকগুলো পাণ্ডুলিপির প্রয়োজন পড়বে।

তিনি হাজার হাজার আল্লাহ্-আকাঙ্খীর কলবে জিকিরের নূর জারী করেছিলেন এবং তারা জযবা ও আত্মিক প্রাপ্তির স্তরে পৌঁছেছিলেন। তাঁর মাধ্যমে অনেক লোক উচ্চতর মাকাম ও হালে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাছাড়া সৃষ্টিজগতের মধ্যে পরিবর্তন সাধন এবং অদৃশ্যের সংবাদপ্রাপ্তির বিষয়ে তাঁর নিকট স্বাভাবিক এলহাম হতো। অধিকাংশ সময় তাঁর দোয়ার বরকতে মানুষের সমস্যার সমাধান হতো এবং প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যেতো। অনেক আকীদার সমাধান হয়ে যেতো। তিনি যে রকম দোয়া করতেন, যেরকম বলতেন, সেরকমই বাস্তবায়িত হতো। যেমন কবির ভাষায় বলা হয়েছে—

মোতলাক আঁ আওয়াযেখুদ আযশাহ বুওয়াদ
গারচে আয হুলকুমে আবদুল্লাহ বুওয়াদ।

অর্থঃ ওলীগণের কথা আল্লাহ্পাকের কথা, যদিও সে কথা আল্লাহ্র বান্দাগণের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে।

তাঁর বাক্যসমূহ, কারামত, এলহাম সব কিছু ছিলো রসুলেপাক স. এর মোজেযার ছায়া স্বরূপ। বহু লোক স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর দীদার লাভে ধন্য হয়েছিলেন এবং তরিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা অনেক উচ্চ মাকাম লাভ করে স্ব স্ব এলাকায় ফিরে গিয়েছিলেন। তালেবগণের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও তিনি তাদের প্রত্যেককে তাওয়াজ্জোহ দিয়ে এক মাকাম থেকে অন্য মাকামে এবং এক হাল থেকে অন্য হালে পৌঁছে দিতেন। তাওয়াজ্জোহের শক্তি দ্বারা বহু বছরের কাজ কয়েক দিনের মধ্যে করে দিতেন। অনেক পাপাচারী ফাসেক তাঁর তাওয়াজ্জোহের ওসিলায় তওবা করে সঠিক পথে চলে এসেছিলো। বেশ কিছু কাফের তাঁর মামুলি তাওয়াজ্জোহ দ্বারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলো।

কারামত ১. একবার সুন্দর ও আকর্ষণীয় সুরতের এক ব্রাহ্মণপুত্র তাঁর মজলিশে এলো। মজলিশের সকল লোকের দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ হলো। তিনি তার দিকে অনুগ্রহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে কুফুরীর পৈতা খুলে ফেলে ইমানের লেবাস পরিধান করলো। কলেমা শাহাদত পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলো। রূপলাবণ্যকে ইসলামের নূর দ্বারা জ্বালিয়ে দিয়ে সে সেখান থেকে প্রস্থান করলো। যেমন কবি বলেছেন—

বনশীন ব গোদায়াঁ দরে দোদস্ত কে হার কিছ
বনাশস্ত বাঙ্গঁ তায়েফা শাহী শোদ বর খাস্ত

অর্থঃ বন্ধুর দুয়ারে যাচঞাকারীদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও। যে তার কাছে বসে, সে বাদশাহ্ হয়ে সেখান থেকে উঠে যায়।

২. মৌলভী কারামতউল্লাহ তাঁর খাদেম ছিলেন। একদিন তাঁর পাঁজরে প্রচণ্ড ব্যথা হলো। শায়েখ গোলাম আলী তাঁর পবিত্র হাত সেখানে রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা দূর হয়ে গেলো।

৩. একবার তিনি এক চলন্ত নৌকার দিকে তাওয়াজ্জোহ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নৌকা থেমে গেলো।

৪. মিঞা আহমদ ইয়ার নামে তাঁর জনৈক সঙ্গী ছিলেন। তিনি বলেছেন, আমি ব্যবসার জন্য এক জায়গায় গিয়েছিলাম। পথিমধ্যে এক প্রান্তরে আমি হজরতকে দেখতে পেলাম। তিনি আমার গরুর গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন, গাড়ি দ্রুতগতিতে চালিয়ে নিয়ে যাও এবং এই কাফেলা থেকে পৃথক হয়ে যাও। সামনে রয়েছে ডাকাত দল। তারা এই কাফেলাতে লুটতরাজ চালাবে। একথা বলার পর

তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি গাড়ি দ্রুত গতিতে চালিয়ে কাফেলা থেকে পৃথক হয়ে গেলাম। আল্লাহ্‌তায়ালার ফয়সালা অনুসারে সমস্ত কাফেলায় রাহাজানি করা হলো। আমি সহী সালামতে গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম।

৫। মিঞা জুলফশাহ তাঁকে খুবই মহব্বত করতেন। তিনি বলেছেন, আমি আমার হালের প্রথম দিকে হজরতের খেদমতে এসেছিলাম। এক প্রান্তর পার হতে গিয়ে পথ ভুলে গেলাম। হঠাৎ এক বুজুর্গ এসে আমাকে পথ দেখিয়ে দিলেন। বললাম, আপনি কে? তিনি বললেন, তুমি যার কাছে বায়াত গ্রহণ করার জন্য যাচ্ছো, আমি সেই ব্যক্তি। দু'বার আমার সাথে তাঁর এরকম ঘটনা ঘটেছে।

৬. মিঞা আহমদ ইয়ার বর্ণনা করেছেন, একবার আমি হজরতের সঙ্গে কোনো এক নেককার মহিলার বাড়িতে গেলাম। মহিলাটি ছিলেন তাঁর মুরিদ। তাঁর বড় মেয়ে মারা গিয়েছিলো। তারই সমবেদনা জানাতে আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। তিনি ওই দুর্বল বৃদ্ধা মহিলাকে বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা এ কন্যাসন্তানের পরিবর্তে আপনাকে একটি পুত্রসন্তান দান করবেন। মহিলা বললো, হজরত! আমি তো বৃদ্ধা। আমার স্বামীও বৃদ্ধ। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা সবকিছু করতে সক্ষম। অতঃপর আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর বাড়ির সামনে একটি মসজিদে প্রবেশ করলাম। সেখানে তিনি ওজু করে দু'রাকাত নামাজ পড়ার পর বৃদ্ধার সন্তানের জন্য দোয়া করলেন। তারপর বললেন, বৃদ্ধা মহিলার সন্তানের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোয়া করেছি এবং দোয়া কবুলের আলামত বুঝতে পেরেছি। ইনশাআল্লাহ্‌ তাঁর সন্তান হবে। পরবর্তীতে আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে একটি পুত্র সন্তান দান করেছিলেন এবং সে বড়ও হয়েছিলো। আলহামদু লিল্লাহি আ'লা যালিক।

৭. একবার এক মহিলা এসে তাঁর কাছে রোগমুক্তির জন্য দোয়ার দরখাস্ত করলেন। তিনি তাঁর দস্তরখান থেকে তাঁকে তাবাররুক দান করলেন। রুটি এবং কাবাব। মহিলা যখন তার বাড়িতে ফিরে এলেন, তখন দেখা গেলো তা হালুয়ায় রূপান্তরিত হয়েছে। জানা গেলো, মহিলার মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এসেছে। বাস্তবে তাই হয়েছিলো।

৮. মীর আকবর আলী ছিলেন তাঁর প্রতি নিবেদিত ব্যক্তি। তিনি একদিন তাঁর কোনো এক প্রিয়জনের স্ত্রীর রোগারোগ্যের জন্য দোয়ার আরয করলেন। যেহেতু তিনি বার বার আবেদন নিবেদন করছিলেন, তাই বাধ্য হয়ে হজরত তাঁকে বললেন, আকবর আলী! তার হায়াত তো পনেরো দিনের বেশী বলে মনে হচ্ছে না। আল্লাহ্‌তায়ালার বিধি মোতাবেক পনেরো দিনের দিনই তার মৃত্যু হয়েছিলো। কিন্তু মীর আকবর আলী অসুস্থতার দিবসগুলোতে উক্ত মহিলার প্রতি তাওয়াজ্জোহ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হজরত যখন তাঁর জানাযায় তশরীফ নিলেন, তখন বললেন,

আকবর! সম্ভবতঃ তুমি তাকে তাওয়াজ্জোহ দিয়েছিলে। তাই তার মধ্যে বরকত অনুমিত হচ্ছে।

৯. তাঁর খানকার নিকটে এক রাফেজীর বাড়ি ছিলো। তাঁর খানকা সংকীর্ণ ছিলো বিধায় ওই বাড়িটি খানকার জন্য প্রয়োজন ছিলো। বাড়িটির মালিক ছিলো এক মহিলা। তিনি তাঁর কাছে বাড়িটি ক্রয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু মহিলা তা প্রত্যাখ্যান করলো। তিনি তখন দিল্লীর এক সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হাকীম শরীফ খানকে সুপারিশের জন্য মহিলার নিকটে পাঠালেন। তিনি গিয়ে বললেন, বিক্রি করে টাকা নিতে যদি তোমার লজ্জা হয়, তাহলে বাড়িটি দান হিসেবে দিয়ে দিতে পারো। আমরা গোপনে তার মূল্য পরিশোধ করে দিবো। কিন্তু উক্ত বদবখত রাফেজী মহিলা, যার স্বভাব ছিলো ওলি আল্লাহ্দের সঙ্গে শত্রুতা করা— সে এ প্রস্তাবও কবুল করলো না। বরং সে তাঁর সম্পর্কে অনেক অনর্থক কথা বললো, রাফেজীদের স্বভাবই এরকম— তারা ওলি আল্লাহদেরকে গালি গালাজ করে। হাকীম সাহেব সেখান থেকে ফিরে এসে তাঁর কাছে সবকিছু বললেন। তিনি তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল আকাশের দিকে উঠিয়ে নিবেদন করলেন, হে মাওলা! আপনি তার কালাম শুনেছেন। আমি তার বাড়িটি গ্রহণ করবো না, যতক্ষণ না সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। এরপরই দেখা গেলো, তকদীরে এলাহী অনুসারে সে বাড়ির লোকজন ক্রমান্বয়ে একজন একজন করে মরতে শুরু করলো। একটি শিশু তখনও জীবিত ছিলো, সেও যখন অসুস্থ হয়ে পড়লো, তখন মহিলাটি বুঝতে পারলো, এ আমার অসদাচরণেরই ফল। মহিলা শিশুটিকে নিয়ে এলো এবং বাড়ি অর্পণ করার প্রস্তাবও দিলো

১০. হাকীম রুকনুদ্দীন বাদশাহ্র দরবারের মন্ত্রীত্বের পদ লাভ করেছিলেন। শাহ গোলাম আলী র. হাকীম সাহেবের নিকট কোনো এক ব্যক্তির জন্য কোনো এক বিষয়ে সুপারিশ করলেন। তিনি এ বিষয়ের প্রতি তেমন গুরুত্ব দিলেন না। এতে করে তিনি মনে কষ্ট পেলেন। অল্পদিন পরেই দেখা গেলো, হাকীমকে পদচ্যুত করে দেয়া হয়েছে। আর কোনো দিন তিনি উক্ত পদ ফিরে পাননি।

১১. দিল্লীর সুবাদার শাহ্ নিজামউদ্দীনের প্রতিও তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনিও পদচ্যুত হয়েছিলেন।

১২. একবার তাঁর কতিপয় খলীফা দূরাঞ্চল থেকে এলেন। পথিমধ্যে তাঁরা বলাবলি করছিলেন যে, কদমবুছির সময় হজরত তো সকলকেই কিছু না কিছু তাবাররুক দিয়ে থাকেন। একজন বললেন, এ মুহূর্তে আমার একটি জায়নামাজ পাওয়ার ইচ্ছা। আরেকজন বললেন, আমার টুপী পাওয়ার ইচ্ছা। তৃতীয় জন অপর কোনো বস্তু পাওয়ার আরজ করলেন। তাঁরা যখন খানকা শরীফে পৌঁছলেন তখন প্রত্যেকেই আপন আপন বাসনা অনুসারে আবাররুক লাভ করলেন। এ

ধরনের ঘটনা বহুবার সংঘটিত হয়েছিলো। মানুষের মনের আকাংক্ষা অনুসারে তাঁর মুখ থেকে বাণী বের হয়ে আসতো।

১৩. একদিন তিনি হাকীম নামদার খানকে দেখতে গেলেন। তিনি তখন মৃত্যুপথযাত্রী। চক্ষুদ্বয় বন্ধ। বেহুঁশ অবস্থায় ছিলেন তিনি। তাঁর নিকটাত্মীয়গণ তাঁর নিকটে রোগমুক্তির দোয়ার জন্য দরখাস্ত করলেন। তিনি এক মুহূর্ত তাঁর দিকে তাওয়াজ্জোহ দিলেন। সাথে সাথে তিনি হুঁশ ফিরে পেলেন। চোখ মেলে তাকালেন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথা বললেন। তারপর যখনই তিনি ঘর থেকে বের হলেন, অমনি তাঁর ইনতেকাল হয়ে গেলো।

১৪. এক ব্যক্তি বোখারা থেকে কাবুল হয়ে ভারতে আসছিলো। আটক নদী পার হওয়ার সময় ব্যবসায়ের পণ্য সামগ্রী সহকারে তার উটটি নদীতে ডুবে গেলো। সে বললো, আমার পণ্যসহ উটটি যদি জীবিত বেরিয়ে আসে, তাহলে আমি শাহ্ গোলাম আলীকে নিয়াজ দান করবো। তখন আল্লাহ্তায়ালার হুকুমে তার উট নদী থেকে বেরিয়ে এলো। লোকটি যখন তাঁর খেদমতে হাজির হলো, তিনি তাঁর নিকটে পুরো ঘটনার বিবরণ দিলেন। বললেন, তুমি কি নিয়াজ আদায় করেছো? সে বললো, হাঁ আদায় করেছি।

১৫. মিঞা আহমদ ইয়ার সাহেবের চাচাকে বাদশাহ্ গ্রেফতার করেছিলো অর্থ গ্রহণ করার অপরাধে। মিঞা আহমদ ইয়ার কাঁদতে কাঁদতে হজরতের খেদমতে হাজির হলেন। তিনি তাঁকে বললেন, কিছু লোক নিয়ে কেল্লায় যাও এবং তাকে মুক্ত করে আনো। মিঞা সাহেব বললেন, কেল্লার ফটকে তো রয়েছে সেনাপ্রহরীরা। আমরা তাকে কেমন করে আনবো? তিনি বললেন, তোমার একথার অর্থ কী? আমার কথা শোনো। যাও। তিনি তখন কেল্লার অভ্যন্তরে চলে গেলেন। ফটকের সেনাপ্রহরীর দল তাঁকে দেখতে পেলো না। তিনি তাঁর চাচাকে কয়েদখানা থেকে মুক্ত করে আনলেন। কেউ কোনো কথা বললো না।

১৬. মৌলভী ফজল ইমাম সাহেবের পুত্র খুব অসুস্থ ছিলো। সে স্বপ্নে দেখলো, হজরত শাহ্ গোলাম আলী তশরীফ এনেছেন। তিনি তাঁকে কিছু পান করালেন। সকালে দেখা গেলো, সে ভালো হয়ে গিয়েছে। সে তখন তাঁর খেদমতে নিয়াজস্বরূপ কিছু মুদ্রা পেশ করলো। তিনি বললেন, এ সব কি রাতের অনুগ্রহের শুকরানা?

১৭. এক ব্যক্তি তাঁর খেদমতে এসে আরয করলো, দু'মাস যাবত আমার ছেলে নিখোঁজ। আপনি তাওয়াজ্জোহ দিন, যাতে ছেলেটি ফিরে আসে। তিনি বললেন, তোমার ছেলে তো তোমার ঘরেই আছে। লোকটি একথা শুনে মনে মনে বিস্মিত হলো। ভাবলো, আমি তো এই মাত্র বাড়ি থেকে এলাম। আর হজরত বলছেন, ছেলে আমার ঘরেই আছে। তাঁর কথা মতো লোকটি বাড়িতে চলে গেলো এবং দেখতে পেলো, সত্যিই ছেলে ঘরের ভিতরে বসে আছে।

১৮. এক মেয়ে লোক তাঁর কাছে এসে বললো, আমার ছেলে সৈন্যবাহিনীতে চাকুরী করতো। চাকরী চলে যাওয়াতে সে শরীরের সমস্ত পোশাক খুলে ফেলে দিয়ে লেংটি পরিধান করেছে। দীন শরীয়ত সব কিছু ছেড়ে দিয়ে মালঙ্গ (ধ্বজাধারী) সেজে ভাং সেবন করছে। তিনি মহিলাকে বললেন, বসো। সে বসে গেলো। তাতে তার সমস্ত লতিফায় জিকির জারী হয়ে গেলো। তিনি তার পুত্রের প্রতি তাওয়াজ্জোহ প্রদান করলেন। ফলে সে মালামতিয়া মতবাদ ছেড়ে দিয়ে সঠিক পথে ফিরে এলো।

১৯. গরীবউল্লাহ ছিলো তাঁর প্রতিবেশী। এক রাতে কঠিন রোগযন্ত্রণায় সে জাঁকান্দানী অবস্থায় চলে গেলো। শেষ রাতের দিকে তার এক আত্মীয় তাকে হজরতের কাছে নিয়ে এলো। তিনি তার প্রতি তাওয়াজ্জোহ প্রদান করলেন। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সে পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলো।

২০. মৌলভী কারামতউল্লাহ সাহেব বলেছেন, আমি যখন হজরতের কাছে ছিলাম, তখন আমি অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটতে দেখেছি। একদিন ফজরের নামাজের পর যখন মোরাকাবা ও জিকিরের সময়, তখন আমি বগলে কিতাব নিয়ে পড়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম। আমার উপর হজরতের দৃষ্টি পতিত হলো। তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে আমাকে বললেন, এসো। জিকিরে মশগুল হয়ে যাও। আমি যেহেতু বেআদব ছিলাম। বললাম, আমি তো এসেছিলাম মেহনত ছাড়া যেনো কিছু মিলে যায়, সেই আশায়। মেহনত করলে তো সব জায়গায়ই পাওয়া যায়। তিনি বললেন, আমি তোমাকে বাহাউদ্দীনের ওসিলায় মেহনত ছাড়াই দান করবো। তুমি বসে যাও। তিনি আমার প্রতি তাওয়াজ্জোহ প্রদান করলেন। আমি বেহুঁশ হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছিলো, আমার দীল বুঝি বুক থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ পর আমার হুঁশ ফিরে এলো। হজরত তখন হালকা থেকে পৃথক হয়েছেন। আমার শরীরের উপর রৌদ্র পতিত হয়েছে। সেখানে ছিলেন কেবল হজরতের খাস সাথী শাহ্ আবু সাঈদ। তিনি আমাকে বললেন, কী হয়েছিলো? আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, নিদ্রা প্রবল হয়ে গিয়েছিলো। তিনি একথা শুনে মৃদু হাসলেন।

শাহ্ গোলাম আলী দেহলভীর ইনতেকাল

শাহ্ গোলাম আলী সব সময় শাহাদতের মৃত্যু কামনা করতেন। কিন্তু তিনি একথাও বলতেন যে, আমার পীর ও মোর্শেদের শাহাদতের কারণে মানুষের উপর কী পরিমাণ বালা মসিবত নাযিল হয়েছিলো, তা অবিদিত নয়। তিন বছর পর্যন্ত ভারতে দুর্ভিক্ষ বিরাজ করেছিলো। হাজার হাজার লোকের জীবনপাত হয়েছিলো। মানুষেরা একে অপরকে হত্যা করেছিলো। এ সকল কথা লেখনীতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই আমি আমার নিজের শাহাদতের ব্যাপারে শংকিত। এ পরিশিষ্টের

রচয়িতা শাহ্ আবদুল গনী বলেন, হাদিস শরীফে এসেছে ‘লাযাওয়ালুদ্দুনইয়া আহওয়ানু ইন্দাল্লহি মিন কাতলি নাফ্সিম মু’মিন’ [১৪]। (আল্লাহ্তায়ালার নিকট এক মুমিনকে হত্যা করার চেয়ে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া অধিকতর সহজ)। জামাল, সিফফীন, হাররা এবং কারবালায় যে যুদ্ধ হয়েছিলো এবং পরে বনু উমাইয়া এবং বনু হাশেমের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের কারণ ছিলো আমীরুল মুমিনীন হজরত ওছমান রা. এর শাহাদত।

হজরত শাহ্ গোলাম আলী জীবনের শেষ প্রান্তে এসে শ্বাসকষ্ট ও খোস পাচড়া রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তখন আমার পিতা শাহ্ আবু সাঈদ লখনৌ শহরে ছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি আমার পিতার নিকটে অনেক পত্র লিখেন। আমার পিতার নিকট লিখিত তাঁর দু’একটি পত্র যথাস্থানে উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ্। মোট কথা শাহ্ গোলাম আলী যখন এমতো দুরাবস্থায় ছিলেন, তখন আমার পিতা তাঁর পরিবার-পরিজন লখনৌতে রেখে তাঁর মোর্শেদের খেদমতে চলে আসেন। তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমার খুব ইচ্ছা ছিলো তোমাকে জড়িয়ে ধরে অনেক্ষণ কাঁদবো। কিন্তু এখন আমার ক্রন্দন করার শক্তি নেই।

তাঁর সব সময়কার অভ্যাস ছিলো এরকম— যখন কোনো সন্দেহজনক অসুখ হতো, তখনই তিনি ওসিয়তনামা লেখাতেন। মৌখিকভাবেও বলতেন সবসময় জিকির শোগলের নেসবতে থাকতে, সদাচরণ করতে এবং মিলে মিশে বসবাস করতে। বিনা বাক্যে আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছাকে মেনে নিতে। ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দারিদ্র, অল্পেতুষ্টি, তাসলিম, রেজা ও তাওয়াক্কুলের উপর জীবনযাপন করতে তাগিদ প্রদান করতেন তিনি। আল্লাহ্তায়ালার বাণী পাঠ করতেন এভাবে— ‘ওয়া মান আসদাকু মিনাল্লাহি হাদীসা’ (কে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী) [১৫]।

তখন তিনি বলেছিলেন, আমার জানাযাকে তোমরা দিল্লীর জামে মসজিদে রক্ষিত আছারে নববীর কাছে নিয়ে যেয়ো এবং হজরত রসুলেপাক স. সকাশে শাফাআতের নিবেদন জানিও। তাঁর ওসিয়ত পালিত হলো। জামে মসজিদে জানাযার নামাজ পড়া হলো। তারপর নিয়ে যাওয়া হলো আছার শরীফের নিকটে। তিনি আরও ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন, খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ র. বলেছেন, আমার জানাজার সামনে ফাতেহা, কলেমা তাইয়্যেবা এবং আয়াত শরীফ পাঠ করা আদবের পরিপন্থী। তখন এই শেরটি যেনো পাঠ করা হয়—

মুফলিসা নীম আমুদা দর কুয়েতু শাইলিল্লাহ আয জামালে রুয়েতু
দস্তে বকশা জানেব যাম্বীবীলে মা আফরী বর দস্তও বর পহলুয়েতু

অর্থঃ আমি দরিদ্র। তোমার গলিতে এসেছি। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তোমার চেহারার নূর থেকে কিছু খয়রাত করো। আমার ভিক্ষাপাত্রের দিকে তোমার অনুগ্রহের হাত বাড়াও। তোমার দান ও দানশীলতার হাতের উপর সমস্ত প্রশংসা।

তিনি বলেছিলেন, আমার জানাযার সামনেও যেনো এই কবিতা পাঠ করা হয়। তাছাড়া সুন্দর সুরে যেনো পাঠ করা হয় এই আরবী কবিতাটিও— 'ওয়াফাতু আ'লাল কারীমি বিগইরি যাদিম মিনাল হাসানাতি ওয়াল ক্বাল্‌বিস্‌ সালীমি ফাহামলুজ যাদি আফ্‌বাহু কুল্লা শাইয়িন ইযা কানান ওয়াফ্‌দু আ'লাল কারীমি' (আমি মহানুভব সত্তার অভিমুখে যাত্রা করেছি নেকী এবং কলবে সলীমের পণ্য ছাড়াই। কেনোনা মহানুভবের দরবারে পণ্যসামগ্রী নিয়ে যাওয়া নেহায়েতই মন্দ কাজ)।

শনিবারে মৌলভী কারামত উল্লাহ সাহেবকে বললেন, মিঞা সাহেবকে (শাহ্‌ আবু সাঈদকে) তাড়াতাড়ি ডেকে আনো। মৌলভী সাহেব গেলেন এবং আমার পিতা শাহ্‌ আবু সাঈদকে ডেকে আনলেন। আমার পিতা ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি আমার পিতার দিকে তাওয়াজ্জোহ করলেন। আর এমনি অবস্থায় হক তায়ালার মোশাহাদার মধ্যে নিমজ্জিত থেকে এই চিন্তাপূর্ণ দুঃখভারাক্রান্ত জগত থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। সেদিন ছিলো ২২শে সফর ১২৪০ হিজরী এশরাকের সময়।

শোক সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। হাজার হাজার লোক একত্রিত হলো। জামে মসজিদে সম্পাদিত হলো জানাযার নামাজ। নামাজের ইমামতী করলেন আমার পিতা হজরত শাহ্‌ আবু সাঈদ দেহলভী র.। খানকা শরীফে হজরত মির্জা মাযহার জানে জানাঁ শহীদ র. এর ডান দিকে তাঁকে দাফন করা হলো। এখন ওই সীমানার ভিতরে[১৬] তিনটি মাযার শরীফ আছে। পরে শাহ্‌ আবু সাঈদ দেহলভী মোজাদ্দেদী র. কেও সেখানেই দাফন করা হয়। তিনি যখন বায়তুল্লাহ শরীফে হজ সম্পাদন করে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন পথিমধ্যে টুঁক নামক স্থানে ইনতেকাল করেন। তাঁকেও সেখান থেকে এনে শাহ্‌ গোলাম আলী র. এর পাশে সমাহিত করা হয়। ফলে শাহ্‌ গোলাম আলী র. এর মাজার শরীফ থাকে মাঝখানে।

হজরত শাহ্‌ গোলাম আলীর ওফাতের সনটি পাওয়া যায় আবজাদী হিসাব অনুসারে এ বাক্যের মধ্যে 'জাঁ বহক নকশ্‌বন্দ ছানী দাদ'। উক্ত হরফগুলোর মান ১২৪০।

শাহ্ গোলাম আলীর খলীফাবৃন্দ

১। হজরত শাহ্ আবু সাঈদ মোজাদ্দেদী

প্রশংসিত প্রভুপালকের পক্ষ থেকে কামালত অর্জনকারী, শরীয়তের সংরক্ষণকারী এবং হাফেজে কোরআন আমাদের পীর ও মোর্শেদ হজরত শাহ্ আবু সাঈদ, পুত্র হজরত শফিউল কদর পুত্র হজরত আজীজুল কদর, পুত্র মোহাম্মদ ঈসা, পুত্র হজরত সাইফুদ্দীন, পুত্র হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম, পুত্র হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি রহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন। তাঁর জন্ম হয়েছিলো যিলকদ মাসের ২ তারিখ ১১৯৬ হিজরীতে রামপুরের মোস্তফাবাদে।

প্রাথমিক জীবন থেকেই তাঁর জীবনাবস্থা ছিলো মঙ্গলময়। তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন— আমার জীবনের প্রথম দিকে আমার এক নিকটাত্মীয় মিঞা যিয়াউন্নবী [১৭] সাহেবের সঙ্গে লখনৌতে গিয়েছিলাম। সেখানে এক বাড়িতে বসবাস করতাম আমি। নামাজের জন্য মসজিদে আসা যাওয়ার কালে পথিমধ্যে এক ফকীরের সঙ্গে দেখা হতো। সে অধিকাংশ সময় উলঙ্গ থাকতো। কিন্তু আমার আসা যাওয়ার সময় সে তার ছতর ঢেকে নিতো। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার কী হয়েছে! যখনই তুমি তাকে (শাহ্ আবু সাঈদকে) দেখছো, তখনই ছতর আচ্ছাদিত করছো। কারণ কী? সে বললো, এমন এক দিন আসবে যখন এই ছেলেটি এক মহান পদ লাভ করবে। সে তখন তার নিকটজনদের প্রত্যাবর্তনস্থল হবে। ওই ফকীর যা বলেছিলো পরবর্তী জামানায় তাই বাস্তবায়িত হয়েছিলো।

তিনি প্রায় দশ বছর বয়সে কোরআন মজীদ হেফজ করেন। ক্বারী নসীম র. এর কাছে এলমে তাজভীদ শিখেন এবং সুন্দর ও তারতীলের সঙ্গে কোরআন পাঠ করার ক্ষেত্রে ক্বারীগণের রওনক বৃদ্ধি করেন। কেউ তাঁর তেলাওয়াত শুনলে তার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যেতো। তিনি বলতেন, ভালোভাবে কোরআন পাঠ করার ব্যাপারে আমার নিজের উপর আমার তেমন আস্থা ছিলোনা। সে কারণে আমি হেরেম শরীফে গিয়ে আরবের সম্মানিত ক্বারী সাহেবগণের কাছে কোরআন তেলাওয়াত শুনিয়েছি। তাঁরা আমার তেলাওয়াত শুনে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

মোট কথা, তিনি কোরআন মজীদ হেফজ করার পর অন্যান্য ধর্মীয় বিদ্যায় বুৎপত্তি অর্জন করেন। অধিকাংশ পাঠ্য কিতাবের শিক্ষা গ্রহণ করেন মুফতী শরফুদ্দীন[১৮] এবং কতিপয় কিতাবের শিক্ষা গ্রহণ করেন শাহ্ ওলি উল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভীর ফরজন্দ হজরত মাওলানা শাহ্ রফীউদ্দীন মোহাদ্দেছে দেহলভীর নিকটে। তিনি তাঁর কাছ থেকে শরহে মুসলিম অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর কাছ থেকেই সহী মুসলিমের সনদ গ্রহণ করেন। তাছাড়া তিনি তাঁর পীর মোর্শেদ

হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. এর আপন মামা হজরত সিরাজ আহমদ এবং হজরত শাহ্ আবদুল আজীজ থেকেও হাদিস শিক্ষা করেন।

এলেম শিক্ষা কালেই তাঁর মধ্যে তলবে মাওলার প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিলো। প্রথমে তিনি তাঁর সম্মানিত পিতা হজরত শাহ্ শফিউল কদরের হালকায় দাখেল হন। তিনি তাঁর পিতা-পিতামহগণের তরিকার উপর আমলকারী ছিলেন। তাঁর উপর তরকে দুনিয়ার হাল গালেব ছিলো। নবাব নসরুল্লাহ খান তাঁকে বখশীগিরি (বেতন বণ্টন করার পদ) দিতে চাইলে তিনি তা গ্রহণ করেননি। জিকির ও শোগলের মধ্যেই সব সময় নিয়োজিত থাকতেন তিনি। এলমে হাদিসের প্রতিও ছিলো তাঁর অত্যধিক আগ্রহ। ফাসেক ফাজের লোক থেকে সব সময় তিনি বিমুখ থাকতেন। ১২৩৬ হিজরীর শাবান মাসের ২৯ তারিখ সোমবার দিন লখনৌতে তাঁর (হজরত শাহ্ শফিউল কদরের) ইনতেকাল হয়। সৈয়দ আহমদ সাহেব ও মৌলভী ইসমাঈল শহীদের অন্যান্য বন্ধুগণ তাঁর কাফন দাফন কার্য সম্পন্ন করেছিলেন।

মোট কথা শাহ্ আবু সাঈদ মোজাদ্দেদীর মধ্যে প্রেমাসক্তির অনল প্রজ্জ্বলিত ছিলো। যতদিন বুজুর্গ পিতা জীবিত ছিলেন, তাঁর সোহবত গ্রহণ করেছিলেন তিনি। পিতার ইনতেকালের পর হজরত শাহ্ দরগাহীর খেদমতে চলে যান[১৯]। তিনি দু'ওয়াসেতায় হজরত খাজা মোহাম্মদ যোবারের র. থেকে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি চূড়ান্ত এস্তেগরাক (নিমজ্জন) এর মধ্যে থাকতেন। নামাজের সময় হলে লোকেরা তাঁকে জাগ্রত করতো। তাঁর মধ্যে জালালিয়াত এতো বেশী ছিলো যে, একই সময়ে যদি তিনি একশ' লোককে তাওয়াজ্জোহ দিতেন, তবে সবাই বেহুঁশ হয়ে যেতো। একবার নামাজ আদায় কালে শওকে এলাহীর কারণে শরীরে কম্পন এসে গেলো। দেখা গেলো প্রথমে ইমাম পরে মুক্তাদীগণ এবং তারপর সমস্ত মহল্লাবাসীর মধ্যে ওজদ উপস্থিত হয়েছে এবং সকলেই নাচতে শুরু করেছে।

হজরত শাহ্ দরগাহী একজন মাদারজাদ ওলী ছিলেন। পাঞ্জাব জেলায় তখতে হাজার নামক স্থানে ১১৬২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে জযবা ছিলো। তাই তিনি জন্মভূমি থেকে বেরিয়ে মরুভূমিতে ঘোরাফেরা করতেন। ভালোমন্দ বিচার করার মতো বয়স যখন হলো, তখন তাঁর মধ্যে কিছুটা স্বাভাবিকতা ফিরে এলো। তখন তিনি কোরআন মজীদের এক পারার চতুর্থাংশ কারও কাছে পড়েন এবং নামাজ সহী করেন। তারপর আবার তিনি মাগলুবুল হাল হয়ে যান এবং গাছের পাতা আহার করতে থাকেন। কিন্তু নামাজের সময় হলে স্বাভাবিক হয়ে যেতেন। নামাজ আদায় করার পর আবার বেহুঁশ হয়ে যেতেন। শেষে বদায়ুন অঞ্চলের মরুভূমিতে অবস্থিত সুলতানুত্তারেকানের মাজার

পর্যন্ত পৌঁছেন [২০] । কাদেরিয়া তরিকার হাফেজ জামালউল্লাহ [২০] এর নিকট বায়াত গ্রহণ করেন । আমীর ওমরাগণের সঙ্গে তিনি দেখা করতেন না । ঘুমন্ত অবস্থায় কেউ তাঁর চাদরের মধ্যে টাকা বেঁধে দিলে তিনি নাজাসাতের (অপবিত্রতার) গন্ধ পেতেন । তারপর নদীতে নিয়ে সে টাকা এমন ভাবে ফেলে দিতেন যেনো তার মধ্যে হাতের স্পর্শ না লাগে ।

হজরত শাহ্ দরগাহীর কতিপয় কারামত

১ । তাঁর কোনো এক ভক্ত এক সময় বাঘের সামনে পড়েছিলো । সে তখন তাঁকে স্মরণ করে বাঘকে এক চপেটাঘাত করে । অমনি বাঘ সেখান থেকে পালিয়ে যায় ।

২ । নবাব আহমদ ইয়ার খানের স্ত্রী ছিলো বন্ধ্যা । তিনি তাঁর সন্তান লাভের জন্য দোয়া করেন । আর তার গর্ভ থেকে বিশটি ছেলে জন্মগ্রহণ করে ।

৩ । একবার এক বণিক এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লো । বললো, আমি স্বয়ং দেখেছি, ঘরের দরজা ভেঙে আমার উপর পড়ছিলো, তখন আপনি (শাহ্ দরগাহী) দরজাটি উঠিয়ে নিয়ে অন্য দিকে ফেলে দিলেন । আর আমি প্রাণে বেঁচে গেলাম ।

৪ । তিনি এক লোককে বলেছিলেন, 'তোমার বাড়ি পুড়ে যাবে ।' তার বাড়ি পুড়ে গিয়েছিলো ।

হজরত শাহ্ দরগাহী র. এর মৃত্যু হয়েছিলো ১২২৬ হিজরীতে রামপুরে ।

মোটকথা হজরত শাহ্ আবু সাঈদ হজরত শাহ্ দরগাহীর খেদমতে পৌঁছার পর তিনি তাঁর হালের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেন । অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তাঁকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন এবং এজাযত ও খেলাফত প্রদান করেন । খেলাফতপ্রাপ্তির পর চারিদিকে সাড়া পড়ে গেলো । অনেক মুরিদান এসে ভিড় করতে লাগলো । তার হালকায় বেহুঁশি এবং ওজদ খুব বেশী হতো । আহাজারী এবং নারা ধ্বনি উচ্চারিত হতো । যেহেতু মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় এ সব বিষয় নিষিদ্ধ এবং এই তরিকার সাথে নাচানাচির কোনো সম্পর্ক নেই, এই তরিকার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সাহাবা কেরামের মতো সুন্নত প্রতিপালন, কোরআন মজীদ পাঠ ও শ্রবণ, নামাজের মধ্যে হুজুরী এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ । হজরত মির্জা মাযহার শহীদের পদ্ধতিও ছিলো এরকম । তাছাড়া তিনি (শাহ্ আবু সাঈদ) শাহ্ গোলাম আলীকে রামপুরে দেখেছিলেন । যখন দিল্লীতে শাহ্ নিজামউদ্দীনের সুবেদারী ছিলো[২২], তিনি শাহ্ নিজামউদ্দীনের উপর অতুষ্ট হয়ে রামপুর চলে গিয়েছিলেন [২৩] ।

শাহ্ গোলাম আলী রামপুর থেকে দিল্লী ফিরে আসেন। তখন দিল্লী আলেম ও সালেহ লোকদের দ্বারা ভরপুর ছিলো। হজরত শাহ্ ওলিউল্লাহর ফরজন্দ শাহ্ আবদুল আজীজ, শাহ্ রফিউদ্দীন এবং শাহ্ আবদুল কাদের প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম তখন জীবিত ছিলেন। জীবিত ছিলেন হজরত কাযী সানাউল্লাহ পানিপথীও। শাহ্ আবু সাঈদ র. আল্লাহপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে কাযী সাহেবের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত তাজীমের সাথে তাঁর জবাব দিয়েছিলেন এবং তাঁকে বলেছিলেন হজরত শাহ্ গোলাম আলীর চেয়ে অধিক যোগ্য কেউ নেই। শাহ্ আবু সাঈদ তাঁর খেদমতে হাজির হন। তখন হজরত শাহ্ দরগাহীও জীবিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, হজরত শাহ্ গোলাম আলীর মতো মোর্শেদ না পেলে আমার প্রথম মোর্শেদের বিষয়ে যথেষ্ট আশংকা ছিলো। কিন্তু আমি হজরতের খেদমতে আসায় তিনি আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন, যাতে আমার কোনো ক্ষতি না হয়।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. তাঁর মকতুবে বলেছেন, কোনো তালেব যদি অন্য কারও নিকট অধিক হেদায়েত অনুভব করে, তবে প্রথম মোর্শেদকে এনকার না করে তাঁর খেদমতে হাজির হতে পারবে।

শাহ্ আবু সাঈদের মধ্যে তাঁর প্রথম পীর শাহ্ দরগাহীর প্রতি ভালোবাসা সুদৃঢ় ছিলো। একদিন হজরত শাহ্ গোলাম আলীর মজলিশে শাহ্ আবু সাঈদের উপস্থিতিতে এক ব্যক্তি শাহ্ দরগাহীর সমালোচনা করেছিলো। তিনি তখন রাগান্বিত হয়ে ওই ব্যক্তিকে চপেটাঘাত করেছিলেন। শাহ্ গোলাম আলীও এতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এ জন্য যে, আমাদের তরিকার কোনো একজন বুজুর্গের নামে গীবত করা অভিপ্রেত নয়। শাহ্ আবু সাঈদ বলেছেন, আমি শাহ্ গোলাম আলীর খেদমতে আসার কারণে আমার প্রতি শাহ্ দরগাহীর অসন্তুষ্টি ছিলো। কিন্তু শেষ বার তাঁর ওফাতের কাছাকাছি সময় আমি যখন তাঁর কাছে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন দেখেছিলাম তাঁর সেই অসন্তুষ্টি দূর হয়ে গিয়েছে। আলহামদু লিল্লাহি আলা যালিক।

শাহ্ আবু সাঈদ বলেছেন, বন্ধুবর্গের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সুলুক সম্পর্কিত একটি পুস্তিকা রচনা করে [২৪] তা হজরত শাহ্ গোলাম আলীর খেদমতে পেশ করেছিলাম। পুস্তিকাটি দেখে তিনি খুব প্রীত হন এবং ওই পুস্তিকার শেষে তাঁর প্রশংসাবাণী লিখে দেন[২৫]। পুস্তিকাটি তখনকার জন্য মোজাদ্দেদিয়া তরিকার কর্মপ্রণালী তুল্য ছিলো। প্রত্যেক দেশেই যার মধ্যে এ তরিকার ফয়েজ ছিলো, তার কাছেই পুস্তিকাটি পাওয়া যতো। কোনো কোনো বুজুর্গ মক্কা মোয়াজ্জমায় পুস্তিকাটির আরবী অনুবাদ করেছিলেন। সে কালে আরব দেশে সুলুক সংক্রান্ত ওই পুস্তিকাটিই প্রচলিত ছিলো। প্রবল ধারণা করা হয় যে, পারস্য দেশেও পুস্তকটির অনুবাদ করা হয়েছিলো।

হজরত শাহ্ আবু সাঈদের কারামতসমূহ

১। মিঞা আজীমুল্লাহ সাহেব থেকে বর্ণিত— তিনি বলেছেন, আমি নবাব মোহাম্মদ আমীর খানের কর্মচারী ছিলাম। হজরত শাহ্ আবু সাঈদ একদিন কোনো এক ব্যক্তিকে পাঠালেন আমাকে ডেকে আনার জন্য। কিন্তু ঘটনাক্রমে তখন আমি ঘরে ছিলাম না। আর ঘরে আসার পর পরিবারের কেউ আমাকে এ বিষয়ে অবহিতও করেনি। তিনি আর এক লোককে পাঠালেন। আমি তাঁর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, আগের ডাকে এলেনা কেনো? তোমার নবাব যদি তলব করতেন, তাহলে তো ঠিকই যেতে। আমি ওজরখাহী করে বললাম, আমি আগে জানতে পারিনি। সে দিন থেকে আমার উপর দৈনিক হাজিরা দেয়ার হুকুম হলো। তারপর থেকে আমার প্রতি তাঁর তাওয়াজ্জোহের বিস্ময়কর পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। দিন শেষে রাতের বেলায় নিম্ন মাকামে পৌঁছার বিষয়ে যতক্ষণ একীন না হতো, ততক্ষণ উর্ধ্ব মাকামের তাওয়াজ্জোহ দিতেন না। পৌঁছে গেছি বলে যখন একীন হতো, তখন সকাল বেলা পরবর্তী মাকামের তাওয়াজ্জোহ দিতেন। এভাবেই আমার দায়েমী আমল চলতো। কর্মক্ষেত্রে রওয়ানা দিতে ঘরের মধ্যেই যদি বিলম্ব হয়ে যেতো এবং ঘর থেকে বের হওয়ার সময় যদি মনে মনে ভাবতাম য, আজ কর্মক্ষেত্র থেকে সোজা ঘরে চলে আসবো এবং হজরতের খেদমতে আজ আর হাজির হবো না। কিন্তু যখন ওই স্থানে পৌঁছতাম, যেখান থেকে খানকার দিকে রাস্তা চলে গিয়েছে, তখন মনে হতো কেউ বুঝি আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তখন বাধ্য হয়ে তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে যেতাম। এটি ছিলো তাঁর এক বিরাট তাসাররুফ (হস্তক্ষেপ)।

২। একবার তিনি রামপুর থেকে সম্বল যাচ্ছিলেন। কিছু দূর যাত্রা করার পর সামনে পড়লো নদী। তখন এশার নামাজের সময়। কিন্তু নদী পার হওয়ার জন্য নৌকার মাঝি পাওয়া গেলো না। নৌকার মালিক ছিলো এক মুশরিক ব্যক্তি। তিনি তাকে বললেন, নৌকা নদীতে ভাসিয়ে দাও। তাঁর ভয়ে সে নৌকা নদীতে ভাসিয়ে দিলো। আল্লাহ্র অনুগ্রহে নিরাপদে নৌকা চলে গেলো। মুশরিক লোকটি তাঁর কারামত দেখে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন।

৩। মির্জা তহমাস কিল্লাতে তাঁকে দাওয়াত করেছিলো। সেখানে অনেক শাহ্জাদা উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা বললেন, আমরা কোনো বুজুর্গের কারামত কখনও দেখিনি। তিনি তখন নারা ধ্বনি করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। পরে তারা সকলেই তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিলো।

৪। হাকীম ফরখ হুসাইন হজরত শাহ্ গোলাম আলীর একজন মোসাহেব ছিলেন। তিনি একদিন শাহ্ আবু সাঈদের শানের খেলাফ কিছু বলেছিলেন। তিনি

তখন রাগান্বিত হয়ে বলেছিলেন, আপনাকে এর সাজা ভোগ করতে হবে। কার্যতঃ তাই হলো। তিনি কোনো এক বিষয়ে অপবাদগ্রস্ত হয়ে গোপনে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

৫। তাঁর ইনতেকালের পর তাঁর এক পুরানো মুরিদ শেখ আহমদ বখশ তাঁর মাজার জিয়ারতের জন্য দিল্লীতে আসেন। তিনি তাকে স্বপ্নে বললেন, ফিরিঙ্গীরা তোমাকে যে প্রশংসাপত্র দিয়েছিলো, যা তোমার পোটলায় বাঁধা আছে, তা ছিঁড়ে ফেলে দাও। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা ভালো নয়। শেখ আহমদ বলেন, আমার স্মরণেই ছিলো না যে, ওই প্রশংসাপত্র আমার সঙ্গে আছে। তিনি যেরকম বলেছিলেন, সেরকমই হলো। প্রশংসাপত্রটি পাওয়া গেলো। সঙ্গে সঙ্গে সেটি ছিঁড়ে ফেলে দিলাম। বুঝতে পালাম যে, ওটা ছিঁড়ে ফেলার সাথে সাথে আমার অন্তর থেকে কাফেরদের প্রতি ভালোবাসা বের হয়ে গেলো। আলহামদু লিল্লাহি আলা যালিক।

৬। মিঞা মোহাম্মদ আসগর বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, কোনো কোনো সময় আমার তাহাজ্জুদের নামাজ বাদ পড়ে যেতো। একবার আমি তাঁর খেদমতে বিষয়টি সম্পর্কে জানালাম। তিনি বললেন, আমাদের খাদেমকে বলে দিও, সে যেনো তাহাজ্জুদের সময় তোমার বিষয়ে আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমি তোমাকে উঠিয়ে দেবো। আমি তো শুধু এতোটুকু যিম্মাদারী নিতে পারি। বাকী কাজ তোমার এখতিয়ারে। তিনি বলেন, বাস্তবে তাই হলো। মনে হতো কে যেনো আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিচ্ছে।

৭। তিনি হেজায সফরের যাত্রাপথে সুরাটে পৌঁছেন। সেখানে ইউসুফ বু আলী খান নামক এক আমীর ফকীরদের দলভুক্ত ছিলেন। তিনি সেখানকার মসজিদে লুঙ্গি পরিধান করে বসে থাকতেন। হজরতের আগমনের সংবাদ শোনার পর থেকে তিনি মসজিদে আসা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু পরে তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তাঁর খেদমতে হাজির হন এবং একশ টাকা নজরানা পেশ করেন। আমাকে (লেখক শাহ্ আবদুল গনী) এবং হজরতকে দাওয়াত করে তাঁর মহলে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে হজরতের নিকট বায়াত করালেন। সেখানকার লোকজন বিস্মিত হলো। ভাবতে লাগলেন এমন কী হলো যে, তিনি নজরানা পেশ করলেন এবং হয়ে গেলেন একজন খাঁটি ভক্ত।

৮। হজ্বের উদ্দেশ্যে জলজাহাজে যাত্রা করে বোম্বাই পৌঁছলেন। জাহাজের ভাড়া পরিশোধ করলেন। অন্যান্য লোকও তাঁর সোহবতকে গনীমত মনে করে তাঁর সঙ্গে একই জাহাজের যাত্রী হয়েছিলো। বোম্বাই পৌছার পর তিনি বললেন, এই জাহাজে যাত্রা করাটা আমার কাছে মঙ্গলজনক মনে হচ্ছে না। তাই জাহাজের ভাড়া ফেরত নিয়ে নিলেন। যেহেতু মালিকের সঙ্গে এ রকম শর্ত পূর্বেই সাব্যস্ত

ছিলো। শেষে তিনি অন্য জাহাজে আরোহণ করলেন। পরে দেখা গেলো প্রথম জাহাজটি পৌঁছলো হজ শেষ হওয়ার পর। দ্বিতীয় জাহাজ যথাসময়েই পৌঁছে গেলো। প্রথম জাহাজের যাত্রীদেরকে এক বছর অবস্থান করতে হয়েছিলো সেখানে।

পরিশিষ্ট রচয়িতা শাহ্ আবদুল গনী বলেছেন, শাহ্ গোলাম আলী যখন সর্বশেষ রোগে আক্রান্ত হন, তখন আমার পিতা শাহ্ আবু সাঈদ লখনৌ ছিলেন। তিনি তাঁকে তলব করে বার বার পত্র লিখলেন। উদ্দেশ্য ছিলো তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করবেন। ওই পত্রসমূহের মধ্য হতে একটি পত্র এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। আর একটি পত্র যা সংক্ষিপ্ত আকারে তরিকা গ্রহণের উপকারিতার বিষয়ে লিখিত, তালেবগণের উপকারার্থে, তা-ও এখানে সন্নিবেশিত করা হলো।

প্রথম মকতুব

বখেদমতে শরীফ সাহেবজাদা, উন্নত নসবের অধিকারী শাহ্ আবু সাঈদ তোমার প্রভুপালক তোমাকে নিরাপদে, শান্তি ও রহমতের সাথে রাখুন। আমি এখন চর্মরোগ, দুর্বলতা ও প্রচণ্ড শ্বাস কষ্টে আক্রান্ত। ওঠা বসা করার শক্তিও রহিত। কোমরের ব্যথা প্রকট আকার ধারণ করেছে। বসে নামাজ পড়তেও কষ্ট। হজরত শাহ্ রফিউদ্দীন সাহেব বলেছেন, দু'জন ব্যক্তির পালাক্রমে আপনার কাছে থাকা উচিত। আমার রোগযন্ত্রণা এখন সীমা অতিক্রম করেছে। বসার মতো শক্তি নেই। জরুরী কাজ কর্ম করতেও অসুবিধা জনিত আলস্য। তাই তোমার এখানে আসাটা খুবই সমীচীন মনে করছি। তাড়াতাড়ি চলে এসো।

মৌলভী বাশারত সাহেব তাঁর পরিবার পরিজনের দেখাশোনা করার জন্য বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন। ফিরে আসবেন কি না জানা নেই। তলবের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য আমি কয়েকটি পত্র দিয়েছি এবং তাবাররুক প্রেরণ করেছি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তোমার এখানে আসার কোনো ইচ্ছাই দেখছি না। বাহ্যতঃ আমার রোগমুক্তি অসম্ভব। আর পরিতাপের বিষয়, তুমি বিলম্ব করছো।

আমার মনে হচ্ছে, এই খান্দানের আলীশান মাকামসমূহের শেষ পদটি তোমার সাথে সম্পৃক্ত। ইতোপূর্বে প্রথম অসুস্থতার কালে আমি দেখেছিলাম, তুমি আমার চৌকির উপর বসে আছো এবং কাইয়্যুমিয়াত তোমাকে দান করা হয়েছে। এই তরিকার বিস্ময়কর ও সূক্ষ্ম তাওয়াজ্জোহসমূহের জন্য তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দেখছি না। সুতরাং পত্র পাওয়া মাত্রই তুমি একা একা আমার এখানে চলে এসো। আহমদ সাঈদকে রেখে এসো তোমার স্থানে। খাতেমা বিল খায়েরের জন্য দোয়া, দরূদ, এস্তেগফার, কলেমা তাইয়্যেবার খতম, কোরআন মজীদ খতম, খতমে খাজেগান এবং হাবীবে মোস্তফা স. এর অনুসরণে সে সাহায্য করতে পারবে। ওয়াস্ সালাম।

দ্বিতীয় মকতুব

হামদ ও সালাতের পর জেনে রাখা উচিত, ইমামে রব্বানী হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর তরিকায় মাকাম ও পরিভাষাসমূহ সুনির্ধারিত। প্রত্যেক স্তরে যে হাল, আত্মিক অবস্থা, নূরসমূহ এবং রহস্যাদির উদয় ঘটে, তা জানা ব্যতীত তরিকা গ্রহণ করা অনর্থক। জীবন কেনো ধ্বংস করা হবে? তওবা থেকে রেজার (সন্তুষ্টির) মাকাম পর্যন্ত দশটি মাকাম (তওবা, এনাবত, জোহদ, অরা, শোকর, তসলীম, তাওয়াক্কুল, সবর, কেনাআত ও রেজা) যদি বাতেন জগতে হাসিল না হয়, তাহলে তরিকা গ্রহণের ফায়দা কী? আলমে আমরের সায়েরে বিভিন্ন আত্মিক অবস্থা সৃষ্টি হয়। কলব লতিফার সায়ের আহাদিয়াতে সেরফা (নিছক এককত্ব) এর মোরাকাবা এবং তারপর মাইঁয়াতের (সঙ্গতার) মোরাকাবা করতে হয়। এর ফলে আত্মহারা, নিমজ্জন, জাগতিক সম্পর্কচ্ছিন্নতা এবং আরয-আকাঙ্খার অপনোদন হাসিল হয়। নফস লতীফার সায়েরে আকরাবিয়াত (অধিকতর নৈকট্য) কার্যকর করতে হয়। ফলে এসতেহ্লাক (ধ্বংস) ও এদ্বমেহ্লাল (দুর্বল করণ) এবং আমিত্বের ফানা হাসিল হয়। আলমে খালক (আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস) এর সায়েরে মাটি ব্যতীত বাকী তিন পদার্থের ফয়েজ পাওয়া যায় এবং ইসমে বাতেন ও মালয়ে আ'লা (ফেরেশতা জগত) এর তাজাল্লীসমূহ এবং কালেব (দেহ) এর মার্জিতকরণ হাসিল হয়। কামালাতের তিনটি মাকামে বর্ণবিহীনতা এবং বাতেনের নেসবতে সূক্ষ্মতা পয়দা হয়। হাকীকতের সাতটি মাকামে নূরের প্রশস্ততা ও নজরী বদাহাত, আম্বিয়া কেরামের জিয়ারত এবং মহব্বতে যাতির আস্বাদ হাসিল হয়। কবির ভাষায়—

না সুলতান খরীদ্দার হার বান্দাইস্ত
না দর যীর হার ঝিন্দা জিন্দাইস্ত

অর্থঃ বাদশাহ্ সকল গোলামের ক্রেতা হয় না, আর তালি দেয়া পোশাক পরিহিত সকলেই বুজুর্গ হয় না।

এ তরিকার সালেক যদি এ রকম এলেম ও মারেফত লাভ করতে পারে, তাহলে তাকে মোবারকবাদ। আর তা না হলে অহংকার ও আত্মম্ভরিতাই কেবল অর্জন করবে। সুতরাং তার জন্য ধ্বংস। যার সোহবতের দ্বারা এ ধরনের হাল পাওয়া যায়, তিনি উত্তম। অন্যথায় কেবল তরিকার বদনাম। এ ধরনের মুরিদানের কারণে শায়েখের অনুতাপ হয়। এরা আজীব ধরনের মুরিদ, যারা তরিকার বদনাম করে। নিজেকে পীর বলে দাবী করে। 'হাদাহুমুল্লাহু সুবহানাহু রেজাইহি ওয়া ইকাতিয়াকি লিকাইহি আমীন' (আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন এবং তার মোলাকাতের আগ্রহের পথ প্রদর্শন করুন)।

আলহামদু লিল্লাহ! হজরত মৌলভী বাশারাতুল্লাহ্ সাহেব এবং হজরত হাফেজ আবু সাঈদ সাহেব তরিকা প্রচারের ক্ষেত্রে উক্ত মাকামসমূহে নেসবত পয়দা করতে পেরেছেন। তাছাড়া আল্লাহ্‌তায়ালা অন্যান্য বন্ধুদেরকেও দৃঢ়তা, সুন্নতের এত্তেবা, শায়েখের প্রতি মহব্বত, তরকে দুনিয়া, নির্জন বাস, অন্য থেকে নৈরাশ্য, আল্লাহ্‌র প্রতি আশাবাদিতা ইত্যাদির তৌফিক দান করুন। তাদের জন্য, আমার বন্ধুদের জন্য এবং এ ধরাশায়ী ও জীবন বরবাদকারী বৃদ্ধের জন্যও উক্ত হালসমূহ দান করুন।

আমি বড় অনুতাপের সাথে লিখছি, যেহেতু মোর্শেদগণের এজাযতনামায় দু'এক শব্দ লিখতে হয়, তাই লিখছি— যাদের কথা উল্লেখ করেছি, তাদের হাত এমন, যা আমার হাতের চেয়ে উত্তম। তাদের হাত আমারই হাত। তাদের কাছে বায়াত গ্রহণ প্রকারন্তরে আমার হাতেই বায়াত গ্রহণ, যা সৌভাগ্য অর্জন এবং নাজাত লাভের সুদৃঢ় মাধ্যম। আল্লাহ্‌তায়ালা বরকতময় করুন, যদি তারা (মোর্শেদ এবং মুরিদ) দুনিয়া থেকে বিমুখ হয় এবং সত্যের উপরে থেকে ভগ্ন মনোরথে খাঁটি অন্তকরণে আল্লাহ্‌তায়ালার ওয়াদার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, যা আমার তরিকার রোকন এবং যুগযুগান্তরের তাওয়াজ্জোহের ফসল।

হে আল্লাহ! আমাকে এবং তাদেরকে তোমার এবং তোমার হাবীব স. এর সন্তুষ্টি অর্জনের তৌফিক দান করো। আর আমাদের আখেরাতকে দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম বানিয়ে দাও। আমীন। আমীন। আমীন।

দু'টি মকতুবের ভাষ্য এখানে সমাপ্ত হলো।

মোট কথা, হজরত শাহ্ গোলাম আলীর নির্দেশ মতো হজরত শাহ্ আবু সাঈদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তারপর নয় বছর পর্যন্ত মুরিদগণের হেদায়েতের কাজে নিয়োজিত থাকেন। তিক্ততা, কঠোরতা, অভাব-অনটন, যা এ তরিকার আকর্ষণীয় রীতি, তিনি তার স্বাদ গ্রহণ করেছেন।

১২৪৯ হিজরীতে তিনি হারামাইন শরীফাইন জিয়ারতের সংকল্প করলেন। দিল্লীবাসীরা খুব ব্যথিত হলো। তিনি আপন সাহেবজাদা হজরত শাহ্ আহমদ সাঈদকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। হারামাইন শরীফাইন সফরের প্রথম পর্যায়ে তিনি রমজান মাসে বোম্বাই আসেন এবং সেখানে তারাবীর নামাজে কোরআন মজীদ খতম করেন। শওয়াল মাসে জাহাজে আরোহণ করেন এবং যিলহজ্ব মাসের প্রথম দিকে জেদ্দায় পৌঁছে যান। শায়েখুল হেরেম মাওলানা মোহাম্মদ জান তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য জেদ্দায় আসেন। যিলহজ্ব মাসের দুই অথবা তিন তারিখে তিনি মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করেন। হারামাইনের কাযী, মুফতী, আলেম ওলামা সকলেই সসম্মানে তাঁর সাথে দেখা করেন। বিশেষ করে শায়েখ আবদুস্ সিরাজ শাফেয়ী, মুফতী শায়েখ ওমর, মুফতী সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ, মীর গনী হানাফী, তাঁর

চাচা শায়েখ ইয়াসীন হানাফী, শায়েখ মোহাম্মদ আবেদ সিন্ধী এবং আরও অনেক মহান ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সেখানে উপস্থিত হন।

যিলহজ্ব মাসেই পবিত্র নগরীতে তিনি অতিসার এবং জ্বরে আক্রান্ত হন। স্বাস্থ্যগত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি মদীনা মুনাওয়ারা জিয়ারতের আগ্রহ দমন করতে পারলেন না। মদীনায় আগমন করলেন। রবিউল আউয়াল মাসের মীলাদুন্ নবীর তারিখে তিনি সেখানে ছিলেন। ওই সময় কেউ একজন স্বপ্নে দেখেন, রসুলেপাক স. সাহাবা কেরামকে সঙ্গে নিয়ে শাহ্ আবু সাঈদ মোজাদ্দেদী প্রকোষ্ঠের দিকে আসছেন। তিনি আরও দেখেন, আমীরুল মুমিনীন হজরত ওমর ফারুক ছাড়া অন্য সকলেই পায়ে হেঁটে আসছেন। আর হজরত ওমর রা. আসছেন ঘোড়ায় চড়ে। কেউ একজন এই স্বপ্নের তাবীর করেছিলেন এরকম— সম্ভবতঃ আমীরুল মুমিনীন হজরত ওমর ফারুকের বিশেষত্বের কারণ ছিলো, শাহ্ আবু সাঈদ তাঁর ফরজন্দগণের মধ্যে একজন। তাঁর তালেবগণের হালকায় লোক সমাগম এতো বেশী হতো যে, ঘরবাড়ি ভরে যেতো। শায়েখুল হেরেম মাওলানা মোহাম্মদ জান তাঁকে দাওয়াত করে আপ্যায়ন করে বলেছিলেন, এই দাওয়াত রসুলেপাক স. এর পক্ষ থেকে।

মদীনা মুনাওয়ারায় আগমনের পর তাঁর অসুস্থতা অনেকাংশে লাঘব হলো। তিনি তখন প্রায় আধাক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে যেতে পারতেন।

হারামাইন শরীফাইন জিয়ারত শেষে তিনি দেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। আবার রোগ-ব্যাধি বৃদ্ধি পেতে থাকে। রমজানের প্রথম রোজা রাখলেন এ মনে করে, যদি কোনো ক্ষতি না হয় তাহলে অবশিষ্ট রোজাও রাখবেন। কিন্তু একটি রোজা রাখার পর অসুস্থতা কঠিন আকার ধারণ করলো। ফলে ফিদ্য়া দানের হুকুম দিলেন। তিনি বলেন, যদিও রোগী ও মুসাফিরের জন্য ফিদ্ইয়া দেয়া অপরিহার্য নয়, তবু মন চাচ্ছে ফিদইয়া দেই।

বাইশ রমজান তারিখে টুঁক নামক শহরে প্রবেশ করেন। এখানে পৌঁছার পর নবাব উজিরুদ্দৌলা তাঁকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। ঈদের দিন তাঁর ছাকরাতুল মওত শুরু হলো। এ নালায়েক (লেখক শাহ্ আবদুল গনী)কে কয়েকটি বিষয়ে ওসিয়ত করলেন তিনি। বললেন, সুন্নতের অনুসরণ অপরিহার্য মনে করবে। দুনিয়াদারদের কাছ থেকে দূরে থাকবে। তাদের কাছে গেলে লাঞ্ছিত হতে হবে। না গেলে তারা কুকুরের মতো তোমার দরজায় লুটিয়ে পড়বে। তিনি আরও বললেন, যে সমস্ত শোগল ও ওজিফা আমি পেয়েছি, তোমাকে এবং আবদুল মুগনীকে [২৬] সেসবের এজাযত প্রদান করলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এখন কোন নামাজের ওয়াক্ত? মৌলভী হাবীবুল্লাহ্ সাহেব [২৭] বললেন, হজরত! আপনি যে নামাজ চান, তাই পড়তে পারেন। তিনি বললেন, আজ সারা রাত আমি

নামাজের মধ্যে কাটিয়েছি। জোহরের নামাজের পর হাফেজ সাহেবকে হুকুম দিলেন, তিনবার সুরা ইয়াসীন পাঠ করো। তৃতীয়বার শোনার পর বললেন, এখন সময় খুব কম। তারপর বললেন, আজ যেনো নবাব আমার ঘরে না আসে। তার পূর্বে কোনো এক দুনিয়াদার এখানে এসেছিলো। আমীর ওমরাগণের গমনাগমনে জুলমাত (তমসা) আসে।

ঈদুল ফিতরের দিন জোহর ও আসর নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে শনিবারে তিনি এই নশ্বর জগত থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন। নবাব উজিরুদ্দৌলা এবং শহরের অন্যান্য লোক সেখানে হাজির হন। মৌলভী হাবীবুল্লাহ এবং অন্যান্য সফর সঙ্গীগণ গোসল করানোর দায়িত্ব নেন। টুঁক শহরের কাযী মৌলভী খলীলুর রহমান জানাযার নামাজের ইমামতী করেন [২৮]। সেখানে গোসল ও কাফন দিয়ে কফিনে করে লাশ মোবারক দিল্লীতে নিয়ে আসা হয়। দিল্লীতে পৌঁছতে চল্লিশ দিন সময় লেগে যায়। চল্লিশ দিন পর লাশ মোবারক কফিন থেকে বের করে দাফন করা হয়। তখন মনে হচ্ছিলো, যেনো এই মাত্র গোসল দেয়া হয়েছে। লাশ মোবারকের মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। লাশের নিচে যে তুলা দেয়া হয়েছিলো, তা থেকে সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ছিলো। লোকেরা সেই তুলা তাবাররুক হিসাবে গ্রহণ করেছিলো। তাঁকে হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. এর কবরের পাশেই দাফন করা হয়। লোকেরা তাঁর ওফাতের সন সম্পর্কে বিভিন্ন মত দিয়েছে। তবে নির্ভর যোগ্য সন হচ্ছে ইউনাব্বিরুল্লাহু মাদ্বজাআহু বাক্যটির আবজাদী মান অনুসারে ১২৫০ হিজরী।

২। হজরত শাহ্ আহমদ সাঈদ

তিনি ছিলেন আবু সাঈদ র. এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁর জন্ম হয়েছিলো ১২১৭ হিজরীতে। তিনি তাঁর সম্মানিত পিতার কাছ থেকে কোরআন মজীদ হেফজ করেছিলেন। আকলী এলেম, ফেকহী ইত্যাদির এলেম শিখেছিলেন মৌলভী ফজল ইমাম এবং মুফতী শরীফউদ্দীনের নিকট থেকে। এলমে হাদিসের শিক্ষা লাভ করেছিলেন হজরত শাহ্ আবদুল আজীজ র. এর শাগরেদগণ, যেমন রশীদউদ্দীন খান প্রমুখ ওলামা কেরাম থেকে। মোজাদ্দেদিয়া তরিকার সুলুক গ্রহণ করেছিলেন হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. এবং তাঁর পিতা শাহ্ আবু সাঈদ র. এর কাছ থেকে। আর তাঁর পিতার কাছ থেকে এজাযত ও খেলাফত লাভ করে লোকদেরকে জাহেরী ও বাতেনী এলেমে সৌভাগ্যশালী করেন।

হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. তাঁর পুস্তিকায় [২৯] শাহ্ আহমদ সাঈদের অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেনঃ 'আবু সাঈদের পুত্র আহমদ সাঈদ এলেম, আমল ও কোরআন

মজীদ হেফজ এবং সম্মানিত নেসবতের হালের দিক দিয়ে তাঁর পিতার কাছাকাছি পর্যায়ে আছে'

তিনি তাঁর এক মকতুবে লিখেছেন, আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের চার জনকে শান্তিতে রাখুন। মনে রাখবে, মহববতের সম্পর্ক আত্মীয়তার সম্পর্কের চেয়ে উত্তম। আমি দোয়া করছি, আবু সাঈদকে 'আস্সাদাহুল্লাহ' (আল্লাহ্তায়ালা সৌভাগ্যশালী করুন)। আহমদ সাঈদ কে 'জাআলাহুল্লাহ মাহমুদান' (আল্লাহ্তায়ালা প্রশংসিত করুন)। রউফ আহমদকে 'রাআফাল্লাহু বিহি' (আল্লাহ্তায়ালা তার প্রতি দয়ার্দ্র হোন) এবং বাশারাতুল্লাহকে 'জাআলাহুল্লাহ মুবাশ্শারান বি কুবুলিহি' (আল্লাহতায়ালা তাঁকে কবুলিয়াতের সুসংবাদ প্রাপ্ত করুন)। আল্লাহ্তায়ালা এই চার বুজুর্গকে হায়াতে বরকত দান করুন এবং তরিকা প্রচলনের কারণ বানিয়ে দিন। আমীন।

শাহ্ আহমদ সাঈদ তাঁর পিতার ইনতেকালের পর শাহ্ গোলাম আলী র. এবং পিতা শাহ্ আবু সাঈদ র. এর স্থলাভিষিক্ত হন। ভারত বর্ষ থেকে খোরাসান পর্যন্ত তালেবে মাওলাগণের খেদমত করেন। তাঁরা সকলেই আপন আপন যোগ্যতা অনুসারে তাঁর কাছ থেকে ফায়দা গ্রহণ করেন। কান্দাহার ও গজনীতে তাঁর খলীফাবৃন্দ খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

শাহ্ আহমদ সাঈদ ১২৭৪ হিজরীতে হারামাইন শরীফাইন জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে উপস্থিত হন এক বছর পর। ১২৭৭ হিজরীতে তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় ইনতেকাল করেন।

পরিশিষ্ট লেখক শাহ্ আবদুল গনী শাহ্ আবু সাঈদের দ্বিতীয় সাহেবজাদা ছিলেন।

৩। হাফেজ আবদুল মুগনী

তিনি শাহ্ আবু সাঈদের তৃতীয় সাহেবজাদা ছিলেন। তিনি এলমে হাদিস ও ফেকাহ্ শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে শান্তিতে রাখুন। তাঁর জন্ম সাল ছিলো ১২৩৯ হিঃ। ১২৯২ হিজরী মদীনা মুনাওয়ারায় ইনতেকাল করেন।

৪। মৌলভী মোহাম্মদ শরীফ

তিনি রামপুরে এলেম হাসিল করার পর শাহ্ আবু সাঈদের খেদমতে হাজির হন। শাহ্ আবু সাঈদ তাঁর হালের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সুলুকের মাকামসমূহ অতিক্রম করানোর পর খেলাফত দিয়ে বিদায় দেন। তিনি পাঞ্জাব ও

কাশমীরে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। অনেক লোক তাঁর কাছ থেকে ফায়দা গ্রহণ করে। তিনি হুশিয়ারপুর নামক স্থানে ইনতেকাল করেন। পরে লাশ মোবারকের কফিন সেখান থেকে সেরহিন্দ শরীফে আনা হয়। হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর মাজারের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

৫। মোল্লা আহাদ বুর্দি তুর্কিস্তানী

হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. এর জীবদ্দশায় হজরত শাহ্ আবু সাঈদের নিকট লখনৌতে সুলুকের তালীম গ্রহণ করেন। তাঁর কাছ থেকে বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশের লোকজন ফায়দা হাসিল করেছিলো।

৬। মোল্লা আলাউদ্দীন

তিনি হজরত শাহ্ আবু সাঈদ র. থেকে তরিকার তালীম গ্রহণ করার পর পেশোয়ার চলে যান। সেখানকার শাসক তাঁর ভক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি তার প্রতি কোনোরূপ তাওয়াজ্জোহ প্রদান করেননি। সাধারণ লোকজন তাঁর কাছ থেকে অনেক ফায়দা হাসিল করেছিলো।

৭। শাহ্ সা'দুল্লাহ সাহেব

তিনি হজরত শাহ্ গোলাম আলীর খেদমতে পৌঁছে সুলুক আরম্ভ করেছিলেন। অতঃপর শাহ্ আবু সাঈদের কাছ থেকে তাওয়াজ্জোহ গ্রহণ করেন। তাঁর কাছ থেকে এজাযত পাওয়ার পর হারামাইন শরীফাইনে চলে যান। সেখান থেকে অভিষিক্ত হয়ে হায়দরাবাদ দাক্ষিণাত্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি এরশাদের কাজে পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের ছোট-বড় সকলে তাঁর ভক্ত হয়ে যায়। তাঁর খানকায় দেড়শ ছাত্র ছিলো এমন, যাদেরকে মাসহারা প্রদান করা হতো। তিনি শাহ্ গোলাম আলী এবং শাহ্ আবু সাঈদের ওরশ করতেন জাঁক জমকের সাথে। তিনি দুনিয়া থেকে সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং বড়ই দানশীল ছিলেন [৩০]।

৮। মোল্লা আবদুল করীম তুর্কিস্তানী

তিনি হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. এর খেদমতে এসে তরিকার নেসবত হাসিল করেন এবং শাহ্ আবু সাঈদ র. থেকে তাওয়াজ্জোহ গ্রহণ করেন। তাঁর কাছ থেকে এজাযত পাওয়ার পর বিদায় গ্রহণ করেন। সবজ শহরে তাঁর মাধ্যমে তরিকার প্রচার প্রসার ঘটে। হাজার হাজার তালেব তাঁর হালকায় অংশগ্রহণ করতো। বিশাল খানকা চত্বর এবং লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেন। শহরের শাসক তাঁর প্রতি যথেষ্ট ভক্তি পোষণ করতো।

৯। মোল্লা গোলাম মোহাম্মদ

তিনি আটক জেলা থেকে এসে হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. এর জীবদ্দশায় শাহ্ আবু সাঈদ থেকে নেসবত হাসিল করেন। অতঃপর নিজের জন্মভূমিতে ফিরে গিয়ে মানুষের উপকার করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি হারামাইন শরীফাইন সফর করেন। সেখান থেকে অভিষিক্ত হয়ে মাতৃভূমিতে ফেরার পথে পথিমধ্যে তাঁর ইনতেকাল হয়।

১০। হজরত মির্জা আবদুল গফুর খুরজুয়ী

যৌবনকালেই তিনি হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. এর খেদমতে হাজির হতেন। তাঁর কাছে অনেক তাওয়াজ্জোহ লাভ করেছিলেন। রোগ-ব্যাধি দূর করার ক্ষেত্রে তাঁর তাওয়াজ্জোহ ছিলো ঔষধতুল্য। হজরত গোলাম আলী অনেক রোগীকে তাঁর কাছে পাঠাতেন। কখনও কখনও তিনি এক বার তাওয়াজ্জোহ দিয়েই রোগ দূর করে দিতেন। হজরত শাহ্ গোলাম আলী এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন, ওমুক (মির্জা আবদুল গফুর) এর কাছে যাও। তাহলে তোমার লতিফাসমূহ জারী হয়ে যাবে। তিনি সে লোককে একবার তাওয়াজ্জোহ দিয়ে লতিফাসমূহ জারী করে দিয়ে শাহ্ গোলাম আলীর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাকে দেখা মাত্রই বুঝলেন, তার লতিফাসমূহ জারী হয়ে গিয়েছে।

মির্জা আবদুল গফুরের মুরিদগণের কাশফ হাসিল হতো। তারা অনেক বিস্ময়কর বিষয়ের বিবরণ দিতে পারতো। তিনি রূহ এর সাথে মোলাকাত করার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর কোনো কোনো খলীফা তুর্কিস্তানে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি খোরজা অঞ্চলে ইনতেকাল করেন। শাহ্ গোলাম আলী র. এর অধিকাংশ মুরীদান তাঁর কাছ থেকে তাওয়াজ্জোহ গ্রহণ করেছিলেন।

১১। হজরত শাহ্ রউফ আহমদ র.

তিনি শাহ্ আবু সাঈদ র. এর খালাতো ভাই ছিলেন। শাহ্ আবু সাঈদ যখন শাহ্ দরগাহীর খেদমতে গিয়েছিলেন, তখন তিনিও তাঁর সাথে সেখানে গিয়েছিলেন। আবার তিনি যখন হজরত শাহ্ গোলাম আলীর কাছে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন রউফ আহমদও তাঁর অনুসরণ করে হজরত শাহ্ গোলাম আলীর খেদমতে হাজির হন। তিনি হজরতের অসংখ্য অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ করেন।

তিনি হজরত গোলাম আলীর মলফুযাত, মকতুবাত এবং মাকামাতের সংকলক ছিলেন। তাছাড়া এলমে ফেকাহ্ ও অন্যান্য বিষয়ের উপর তিনি বিভিন্ন পুস্তক রচনা করেছেন [৩১]। হিন্দী এবং ফার্সী কাব্য রচনায়ও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিলো। তাঁর বংশধারা হজরত শায়েখ মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়াহ র. এর মাধ্যমে হজরত

মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. পর্যন্ত পৌঁছেছে[৩২]। শায়েখ মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া র. হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কনিষ্ঠ সাহেবজাদা ছিলেন। খেলাফত লাভের পর তিনি ভূপাল চলে যান। সেখানে সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেন। আমীর ও ফকীরগণ তাঁর হালকায় হাজির হতো। আমার পিতা শাহ্ আবু সাইদের ইনতেকালের পর এক বা দু' বছর পর্যন্ত হিন্দুস্তানে ছিলেন। তারপর হারামাইন শরীফাইন জিয়ারতের জন্য যাত্রা করেন। সমুদ্রে জাহাজে থাকা অবস্থায় ইয়ালামলামের কাছে ১২৪৯ হিজরীতে ইনতেকাল হয় তাঁর। ইয়ালামলামের নিকটেই তাঁকে দাফন করা হয়।

১২। হজরত শাহ্ খতীব আহমদ

তিনি হজরত শাহ্ রউফ আহমদের ফরজন্দ ছিলেন। প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। সহিষ্ণু এবং দানশীলতা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিলো। জুলুম বরদাশত করা তাঁর স্বভাব ছিলো। তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে তরিকার নেসবত লাভ করেছিলেন। হজ্বের সফরে পিতার সঙ্গী ছিলেন। পিতার ইনতেকালের পর তিনি পিতার মজলিশকে সুউজ্জ্বল করেছিলেন। ১২৬৬ হিজরীতে জমাদিউস্ সানি মাসে ভূপাল শহরে ইনতেকাল করেন। তাঁকে যখন কবরে রাখা হয়, তখন তাঁর চক্ষু খুলে গিয়েছিলো।

১৩। শাহ্ আবদুর রহমান মোজাদ্দেদী জলন্ধরী

তাঁর বংশধারা হজরত শায়েখ সাইফুদ্দীন র. এর মাধ্যমে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে [৩৩]। তাঁর পিতা শাহ্ সাইফুর রহমান মির্জা মাযহার জানে জানান শহীদ র. এর মুরিদ ছিলেন। তিনি (শাহ্ আবদুর রহমান) হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. এর কাছে বায়াত গ্রহণ করে নেসবত হাসিল করেন। তিনি মার্জিত চরিত্রের দিক দিয়ে অনন্য উদাহরণ ছিলেন। পাঞ্জাবের লোক তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীতে মুগ্ধ ছিলো। তাঁর বহুসংখ্যক মুরিদান ছিলো। একবার তিনি হজ্ব করেন। হজ্ব করে দেশে প্রত্যাবর্তন করার পর পুনরায় হজ্ব করার আগ্রহ প্রবল হয়ে যায় তাঁর। তিনি পুনরায় যাত্রা করেন। ফেরার পথে সিন্ধু[৩৪]তে পৌঁছার পর ১২৫৮ হিজরীতে ইনতেকাল করেন [৩৫]।

১৪। মৌলভী বাশারতুল্লাহ সাহেব

প্রথমে তিনি তাঁর শ্বশুর মাওলানা নাঈমুল্লাহ বাহ্‌রায়েচীর কাছে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর সম্ভবতঃ তাঁর ইনতেকালের পর হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. এর খেদমতে হাজির হন। তিনি তাঁর হালের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন,

যা তাঁর মকতুব থেকে দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি লিখেছেন, 'মৌলভী সাহেব (বাশারতুল্লাহ) আমার সাথীগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। জাহেরী এলেমেও তিনি পূর্ণতার অধিকারী।'

১৫। মৌলভী করমুল্লাহ মোহাদ্দেছ

তাঁর পিতা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম ছিলো আবদুল্লাহ। তিনি মৌলভী ফখরুদ্দীনের মুরিদ ছিলেন। হজরত শাহ্ আবদুল আজীজ 'তাফসীরে আজীজী' তাঁর জন্যই রচনা করেছিলেন। মৌলভী করমুল্লাহ শাহ্ গোলাম আলী র. এর খেদমতে হাজির হয়ে বায়াত গ্রহণ করেন এবং এযাজতপ্রাপ্ত হন। দিল্লীর অধিকাংশ লোক সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে এলমে ক্বেরাতে তাঁর শাগরিদ ছিলেন। তিনি হারামাইন শরীফাইন জিয়ারতে যান। দ্বিতীয় বার হজ্বের সফরে ইনতেকাল করেন [৩৬]।

১৬। হজরত মাওলানা খালেদ শাহরযুরী কুর্দী

তিনি একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন। সব বিষয়ে তাঁর বিস্ময়কর দক্ষতা ছিলো। হাদিস শাস্ত্রে পঞ্চাশটি কিতাবের সনদ হাসিল করেছিলেন তিনি। ভারতবর্ষের আলেমদের মধ্যে শুধু হজরত শাহ্ আবদুল আজীজের প্রশংসা করতেন [৩৭]। হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. তাঁর রচিত কাব্যকে আরেফ জামীর কাব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে বলে মন্তব্য করতেন। তিনি হজরত শাহ্ গোলাম আলী র.এর প্রশংসায় আরবী ও ফার্সীতে যে সকল কাসীদা রচনা করেছিলেন, তা খসরু পারভেজ এবং আবদুর রহমান জামীর কাব্য থেকে কোনো অংশে কম ছিলোনা। ওই কবিতাগুলো তিনি রচনা করেছিলেন সুলতানুল মাশায়েখ খাজা আহরার র. প্রশংসায়।

এলেম অর্জনের পর তিনি কোনো এক মাদ্রাসায় শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহপ্রাপ্তির প্রেরণা তাঁর দিলে সদা বিদ্যমান ছিলো। ঘটনাক্রমে দুনিয়া ভ্রমণকারী মির্জা রহীমুল্লাহ বেগ নামের এক দরবেশের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়। তিনি তাঁর কাছে কামেল পীরের অভাবের বিষয়ে অভিযোগ করেন। মির্জা বেগ সাহেব তাঁকে দিল্লীতে আসার পরামর্শ দেন। অতঃপর মাওলানা খালেদ ১২৩৪ হিজরীতে মাদ্রাসার শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে জন্মভূমি থেকে রওয়ানা দিয়ে ১২৩৫ হিজরীতে দিল্লী পৌঁছেন এবং হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. এর খেদমতে নয় মাস অবস্থান করেন।

যে ব্যক্তি হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. সম্পর্কে কটুক্তি করতো, মাওলানা খালেদ তাকে শুকরের আকৃতিতে দেখতে পেতেন। এতে তাঁর বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পায়। তিনি স্বেচ্ছায় খানকার জন্য পানি সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. এর হালকায় লোকেরা যেখানে জুতা রাখতো, তার পিছনে গর্দান নিচু করে বসে থাকতেন তিনি। হজরত তাঁর প্রতি যথেষ্ট কৃপাদৃষ্টি দিতেন। এভাবে কৃপাদানের মাধ্যমে গড়ে তুলে এক পর্যায়ে তাঁকে খেলাফত প্রদান করেন। হজরত তাঁকে খেলাফত দেয়ার পর বিদায় দেয়ার জন্য হজরত শায়েখ মোহাম্মদ আবেদ র. এর মাজার পর্যন্ত গিয়েছিলেন। বিদায় দিয়ে তাঁকে আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ করে দিয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে, হজরত তাঁকে বিদায় দেয়ার সময় উস অঞ্চলের কুতুবিয়াত দান করেছিলেন। সেখানে তিনি অনেক কঠোর রিয়াজত করেন। সেখানকার লোকসমাগম এতো বেশী ছিলো, মনে হতো যেনো সেখানকার সুলতানাত তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত। তাঁর খলীফা এবং খলীফাগণের খলীফার সংখ্যা হয়েছিলো হাজার হাজার। মাওলানা খালেদ যখন বড় পীর সাহেবের রূহের দিকে তাওয়াজ্জোহ করতেন, তখন খাজা নকশবন্দকে দেখতে পেতেন। তিনি বলতেন, আমার দিকে তাওয়াজ্জোহ করো। তাঁর সম্পর্কে এমন কথা আছে যে, তাঁর ঘোড়াও কোনো সন্দেহযুক্ত খাবার খেতো না। তাঁর থেকে অনেক কারামত প্রকাশ পেয়েছিলো। তিনি এমন সম্মানের অধিকারী ছিলেন যে, সেখানকার নেতৃবৃন্দেরও এমন সম্মান ছিলো না। একবার তিনি বাগদাদের শাসনকর্তার প্রতি অতুষ্ট হয়ে তাকে আপন মজলিশ থেকে বের করে দিয়েছিলেন। একবার তিনি এক মজলিশে হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. এর নাম উচ্চারণ করেছিলেন। সাথে সাথে সকল লোক বেহুঁশ হয়ে পড়ে গিয়েছিলো।

শায়েখ আবদুল ওহাব নামে তাঁর একজন খলীফা ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন কারামতও ছিলো। কোনো কারণে মাওলানা খালেদ থেকে তিনি বিমুখ হয়ে যান। অতঃপর দেখা গেলো যে, তাঁর নেসবত সলব হয়ে গিয়েছে। তাই তিনি মানুষের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট হয়ে যান। আমার পিতা হজরত শাহ্ আবু সাঈদ র. যখন হজ্বে যান, তখন তিনি তাঁর কাছে এই মর্মে অনেক কাকুতি মিনতি করে আবেদন নিবেদন করেন, যেনো তাঁর পীর মোর্শেদ তাঁর প্রতি নতুন করে তাওয়াজ্জোহ প্রদান করেন। আমি শুনেছি পরবর্তিতে তাঁর তওবা গ্রহণযোগ্য হয়। তার কয়েক বছর পর তিনি ইনতেকাল করেন।

মাওলানা খালেদ র. তাঁর অধিকাংশ মুরিদানকে আমার পিতা (শাহ্ আবু সাঈদ) এর আনুগত্য করার হুকুম দিতেন। তাঁর যে সকল মুরিদান আরব অঞ্চল থেকে আসতো, তারা বলতো, মাওলানা খালেদ কুর্দি হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. এর পর হজরত শাহ্ আবু সাঈদ র.কে প্রাধান্য দেন। মাওলানা খালেদ কুর্দি র. আমার পিতার কাছে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, তা এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

মকতুব

দুনিয়া-পরিত্যক্ততা এবং দারিদ্রের বৃত্তের কেন্দ্র খালেদ কুর্দি শহরযুরি সম্মানিত ও মান্যবরেষু হজরত আবু সাঈদ মোজাদ্দেদী মাসুমির খেদমতে আরয করছে যে, আপনার পূর্বপুরুষগণের যে ফয়েজসমূহ আত্মিক জগতের কেবলা হজরত শাহ্ গোলাম্ আলী র. এর হিম্মতের মাধ্যমে এই নাম নিশানাহীন ব্যক্তির কাছে পোঁছেছে, তার প্রকৃত বিবরণ লিখে শেষ করা যায় না।

'যা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়, তা সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য নয়' এই মহাজনবাণীটির পরিপ্রেক্ষিতে শোকরগোজারী হিসাবে আপনার খেদমতে আরয করছি, সমগ্র রোম সাম্রাজ্য, আরব দেশসমূহ, হেজায অঞ্চল, ইরাক, আজম দেশসমুহ এবং সমগ্র কুর্দিস্তান এই উচ্চ তরিকা মোজাদ্দেদিয়ার প্রেরণা ও প্রতিক্রিয়ায় মাতোয়ারা। ইমামে রব্বানী হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর প্রশংসায় মহফিল, মজলিশ, মসজিদ ও মাদ্রাসাসমূহে দিবানিশি আম খাস সকলের রসনায় এমন আলোচনা চলছে যে, মনে হয় কোনো শতাব্দীতে পৃথিবীর কোনো দেশে এর দৃষ্টান্ত নেই। এরকম কথা শোনাও যায় না। জগতসংসারও যেনো এরকম আগ্রহ ও সম্মেলন কোনোদিন দেখেনি। যেহেতু সাহেবে কেবলা শাহ্ গোলাম আলী র. এর প্রতি অনেক আগ্রহ এই পরিত্যক্ত মিসকীনের অন্তরে বিদ্যমান ছিলো, তাই গোস্তাখী করার মাধ্যমে জনাবের এবং অন্যান্য বন্ধুবর্গের অন্তরে একটু আনন্দ সিঞ্চন করলাম। অবশ্য এ ধরনের বিষয় প্রকাশের মধ্যে সব সময়ই গোস্তাখী এবং আত্মকেন্দ্রিকতার আবেশ থাকে। সে জন্য আমি লজ্জিত। কিন্তু বন্ধুগণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করাকে অগ্রগণ্য মনে করে এহেন বেআদবী আমি করেছি। অন্যথায় এ সমস্ত বিষয় লেখনির মধ্যে আনয়ন করা আমার মতো নালায়েকের জন্য কল্পনারও বাইরে ছিলো।

আমি আশা পোষণ করছি আপনি মোলাকাতের সময় অথবা পত্রের মাধ্যমে যেমন আপনার সম্মানিত স্বভাব— এই মিসকীন ও অপদস্থ ব্যক্তি সম্পর্কে হজরত সাহেবে কেবলা শাহ্ গোলাম আলীর নিকটে আলোচনা উত্থাপন করতে ত্রুটি করবেন না। অথবা যে কোনো নৈকট্যের মাধ্যমে ওই আস্তানায় অধমের নাম স্মরণ করবেন, যা সত্যবাদীদের খোশ কিসমতের জন্য নির্ধারিত। আর আপনিও আংশিক দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে এ সম্বলহীনের অন্তরের কৃষবর্ণ দূর করবেন। আর কী লিখবো। নেয়ামত দানকারী, পর্যবেক্ষণকারী আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে তাঁর স্বীয় আশ্রয়ে রাখুন এবং পীরানে কেরামের হিম্মতের অংশীদার বানিয়ে দিন (মকতুব শেষ)।

হজরত শাহ্ গোলাম আলীর ইনতেকালের পর মাওলানা খালেদ এক বা দু' বছর জীবিত ছিলেন। তিনি ১২৪২ হিজরীতে প্লেগ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে

শাহাদতের মৃত্যু বরণ করেন। বলা হয়ে থাকে, ইনতেকালের পূর্বে তিনি পর্যায়ক্রমে চারজন লোকের নাম ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরা একজনের অবর্তমানে আরেকজন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন। সে চারজনই পরপর প্লেগে আক্রান্ত হয়ে ইনতেকাল করেন।

রসুলেপাক স.ও মুতার যুদ্ধে পর্যায়ক্রমে তিনজন সাহাবীর নাম ঘোষণা করেছিলেন এভাবে যে, তাঁরা একজনের পর একজন ওই যুদ্ধের সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁরা ছিলেন হজরত জায়েদ ইবনে হারেছা রা., হজরত জাফর তাইয়ার রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রা.। তাঁরা একে একে শহীদ হয়েছিলেন। তারপর হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ পতাকা বহনের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর মাধ্যমেই মুসলমানগণ মুতার যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন এবং তিনি সাইফুল্লাহ উপাধিতে ভূষিত হন।

১৭। মৌলভী আবদুর রহমান শাহ্জাহানপুরী

তিনি অনেক বুজুর্গের নিকট গিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুই অর্জন করতে পারেননি। শেষে শাহ্ গোলাম আলী'র খেদমতে এসে সায়ের সুলুক করেন এবং খেলাফতের পরিচ্ছেদ পরিধান করেন। তিনি দুনিয়াদারদের থেকে আশ্চর্য ধরনের সম্পর্কহীন থাকতেন। তাদের প্রতি কোনোরূপ ভ্রূক্ষেপই করতেন না। একবার ফরখআবাদের নবাব অনেক আকাঙ্খা নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তার প্রতি কোনো গুরুত্বই দেননি। এজাযতপ্রাপ্তদের প্রতি তাঁর নেসবত সুদৃঢ় ছিলো। তাঁর কাশফ খুবই সহী ছিলো।

ফরখআবাদ এবং শাহ্জাহানপুরে তাঁর তরিকার প্রচলন খুব বেশী হয়েছিলো।

১৮। মীর তালেব আলী ওরফে মৌলভী আবদুল গফ্ফার

তিনি জাহেরী এলেম অর্জন করার পর হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. থেকে কলবী নেসবত অর্জন করেন। তারপর তিনি হারামাইন শরীফাইন জিয়ারতে চলে যান। তাঁর তরিকার প্রচলন হয়েছিলো ইয়ামন দেশের যুবায়দা শহরে। বলা হয়ে থাকে, তিনি ওই শহরের কাযীও ছিলেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম [৩৮]।

১৯। সাইয়্যেদ ইসমাইল মাদানী

তিনি প্রথমে মাওলানা খালেদ কুর্দির কাছে বায়াত গ্রহণ করে নকশবন্দী নেসবত হাসিল করেন। একদিন তিনি রসুলেপাক স. কে স্বপ্নে দেখেন। তিনি স. তাঁকে বলছেন, তুমি দিল্লী যাও এবং শাহ্ গোলাম আলীর কাছ থেকে মোজাদ্দেদিয়া তরিকার নেসবত গ্রহণ করো। রসুলেপাক স. এর নির্দেশে তিনি

শাহ্ গোলাম আলী র. এর খেদমতে হাজির হন। তারপর এজাযত ও খেলাফত লাভ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর কাশফ ও আত্মিক অর্জন বিশুদ্ধ ছিলো। তিনি দিল্লীর জামে মসজিদে আছারে নববীর নিকটে গিয়ে সেখানে ছবি বিদ্যমান থাকার কারণে তমসা অনুভব করেছিলেন, যার বর্ণনা ইতোপূর্বে দেয়া হয়েছে।

২০। মির্জা রহীম বেগ ওরফে মোহাম্মদ দরবেশ আজীমাবাদী

উপার্জন করা ছেড়ে দিয়ে তিনি হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. এর খেদমতে এসে তরিকার নেসবত হাসিল করেন। তারপর এজাযত ও খেলাফত লাভে ধন্য হন। কালো বর্ণের তালি দেয়া জামা পরিধান করে হজরত খাজা নকশবন্দ র. এর মাজার জিয়ারতে গিয়েছিলেন। তিনি অধিকাংশ ইসলামী দেশ ও শহর সফর করেছিলেন। যেমন, পারস্য, সিরিয়া, হেজায, ইরাক, মাগরিব মাওরাউন্নাহার, খোরাসান এবং হিন্দুস্তান। তিনি বলতেন, শাহ্ গোলাম আলী র. এর মতো শায়েখ আমি কোথাও দেখিনি। পিতা-মাতার হকের ব্যাপারে তিনি তাঁদের থেকে মাফ করিয়ে নিয়েছিলেন। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের বিষয়ে নির্ভীক ছিলেন। হেরাতের শাসক শাহ্জাদা কামরান তাঁর ভক্ত ছিলেন। তাঁর কঠোর বাক্যকে তিনি সংশোধনী মনে করতেন। তুর্কিস্তানের শাসকও তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। শরীয়তের বিষয়ে কঠোরতা করার কারণে তিনি সকল জায়গা থেকে নারাজ হয়ে ফিরে আসতেন। কাহকন্দের বাদশাহ্ যিনি তাঁর খুব ভক্ত ছিলেন, তাঁর প্রতিও তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। অবশেষে সবজ শহরে এসে স্থিতি লাভ করেছিলেন। সেখানকার শাসনকর্তা তাঁকে একটি বিশাল গ্রাম উপঢৌকন দিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে তাঁর শাসন অধিকার প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। সে গ্রামটি তাঁর আস্তানায় রূপান্তরিত হয়েছিলো। তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বিয়ে করেছিলেন। নিজেই লোকদের খেদমতের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি শাফেয়ী মাযহাব গ্রহণ করেছিলেন। তাই বোখারা প্রভৃতি দেশে তিনি পরিচিতি পেয়েছিলেন শাফেয়ী। সবজ শহরের শাসকের প্রতি তুর্কিস্তানের কোনো কোনো শাসকের দুশমনি ছিলো। সে কারণে তিনি তাদের মাধ্যমে গুপ্ত হত্যার শিকার হয়ে শাহাদতের শরবত পান করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন।

২১। হজরত আখুন্দ শের মোহাম্মদ

তিনি এলেম অর্জন করার পর হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. এর আস্তানায় আগমন করেন। নেসবত হাসিল করার পর তরিকার এজাযত প্রাপ্ত হন। হজরত আখুন্দ তাঁর খেদমতে আসার পর সমস্ত জাহেরী এলেম ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি

নিজে বলেছেন, হজরতের দরবারে আসার পর আমার হাল এমন হয়েছিলো যে, এলমে নাহুর সহজ তরকীব (বাক্য বিশ্লেষণ)ও আমার নিকট কঠিন মনে হতো। তারপর আমি জাহেরী এলেমের দিকে প্রত্যাবর্তন করি এই আশংকায় যে, না জানি অধিকৃত এলেম আবার ভুলে যাই। তারপর থেকে তিনি হাজার হাজার ছাত্রকে এলেম প্রদান করে ধন্য করেন। তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে তাকওয়া অর্জন এবং নেক আমল করার নির্দেশ দিতেন। তাঁর মজলিশে কোনো ছাত্র যদি অপর কোনো ছাত্রের গীবত করতো, তিনি তাকে জরিমানা করতেন। জীবন সায়াহ্নে তিনি খুব দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। কিতাবসমূহ বিক্রি করে দিয়েছিলেন এবং পাঠদান ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন কোরআন তেলাওয়াত এবং ফরজ নামাজ ছাড়া আর কোনো কাজ ছিলো না তাঁর। শেষ জীবনে এসে ভারতবর্ষে, যা দারুল হরব হয়ে গিয়েছিলো, সেখানে বসবাস করা মাকরুহ মনে করে রোগাক্রান্ত অবস্থায়ই সেখান থেকে হিজরত করে হারামাইন শরীফাইন অভিমুখে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে মুলতান শহরে পৌঁছার পথে ইনতেকাল করেন।

২২। শায়েখুল হেরেম মাওলানা মোহাম্মদ জান

এলেম অর্জন করার পর তিনি শাহ্ গোলাম আলী র. এর খেদমতে আসেন এবং অনেক রিয়াজত করেন। তিনি সেখান থেকে সাতক্রোশ দূরে হজরত খাজা কুতুবুদ্দীনের মাজার জিয়ারতের জন্য যেতেন। রাতে সেখানে এবাদতে মশগুল থাকতেন। সকাল বেলা সেখান থেকে হজরতের জন্য এক ঘটি পানি নিয়ে আসতেন। কেনোনা সেখানকার পানি খুব হজম সহায়ক ছিলো। সেখানকার জনৈক খাদেম বর্ণনা করেছেন, আমার এক পুত্রসন্তান অসুস্থ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো। রাতের বেলায় আমি তাকে কুতুবুল আকতাব খাজা কুতুবুদ্দীনের দরগায় নিয়ে গেলাম। মাওলানা মোহাম্মদ জান তখন মোরাকাবায় ছিলেন। আমি সন্তানটিকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি তার অসুস্থতা দূর করার জন্য আল্লাহ্পাকের নিকট দরখাস্ত করলেন। তার রোগ ভালো হয়ে গেলো। অপর এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, আমি এক রমণীর প্রেমে এমন মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম যে, ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিলো। আমি তাঁর কাছে আরয করলাম, আমার তো এখন যেনা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এমতাবস্থায় আমি যদি এরকম কিছু করেই ফেলি, তবে আল্লাহ্তায়ালার নিকট আপনার নামে অভিযোগ করবো। বলবো, আপনি আমার হালের প্রতি তাওয়াজ্জোহ প্রদান করেননি। তিনি আমাকে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ' পড়ার তালিম দিলেন। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! আমি তো সব সময় তাই পড়ি। তিনি বললেন, এখন আমার নির্দেশে

পাঠ করো। আমি পাঠ করলাম। মনে হলো যেনো আমার এবং উক্ত রমণীর মধ্যে সেকান্দরী দেয়াল দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তারপর থেকে দু'তিন বছর পর্যন্ত আমার মধ্যে কোনোরূপ যৌন উত্তেজনাই ছিলো না।

মাওলানা মোহাম্মদ জান হজরত গোলাম আলী র. থেকে খেলাফত লাভের পর তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হেরেম শরীফে চলে যান। সেখানে পৌঁছার পর প্রথম প্রথম অনেক কষ্ট করেছেন। তারপর বিজয়ের যাত্রা শুরু হলো। বাদশাহ্গণ তাঁর দিকে ধাবিত হতে শুরু করলেন। তাঁর খলীফাগণ ইস্তাম্বুল এবং পারস্যের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়েন। পারস্যের বাদশাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর জন্য মাশুহারা ধার্য করা হয়েছিলো। সেখানকার সুলতানের মাতা তাঁর ভক্ত হয়েছিলেন। সেখানে খানকা তৈরী করে মুসাফিরদের খেদমত করতে থাকেন। ১২৬৬ হিজরীতে মক্কা মোয়াজ্জমায় ইনতেকাল করেন।

২৩। সাইয়্যেদ আহমদ কুর্দি

তিনি বাগদাদে মাওলানা খালেদের নিকট তরিকা গ্রহণ করেছিলেন। তারপর রসুলে পাক স. এর নির্দেশে দিল্লী এসে হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. এর কাছ থেকে মোজাদ্দেদিয়া তরিকার তালিম গ্রহণ করেন। পথিমধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তখন রসুলেপাক স.কে স্বপ্নে দেখেন। তিনি তাঁকে রোগমুক্তির জন্য দরূদ শরীফ পাঠ করার তালিম দিলেন। সেই মোতাবেক আমল করার পর তিনি সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন।

২৪। সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ মাগরেবী

তিনিও প্রথমে মাওলানা খালেদ র. এর কাছ থেকে তরিকা গ্রহণ করেছিলেন। তারপর হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. এর খেদমতে হাজির হন এবং তাঁর কাছ থেকে তরিকার এজাযত লাভ করেন।

২৫। মোল্লা পীর মোহাম্মদ

তিনি হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. এর খেদমতে থেকে সুলুকের তালিম হাসিল করেন। তাঁর বিস্ময়কর নিমজ্জন অর্জিত হয়েছিলো। তিনি মির্জা মাযহার র. এর মাজারে বসতেন। এভাবে সারা রাত অতিবাহিত হয়ে যেতো। কখনো বৃষ্টি শুরু হতো। কিন্তু সে দিকে তাঁর কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিলো না। কাশ্মিরে তার যথেষ্ট জনপ্রিয়তা এসেছিলো।

২৬। মোল্লা গুল মোহাম্মদ

তিনি গজনী থেকে হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. এর খেদমতে হাজির হয়ে তরিকার নেসবত হাসিল করেন এবং এজাযত পেয়ে ধন্য হন। বেলায়তের নেসবতধারী লোকদের অনেক উপকার সাধন করেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে এজাযত প্রদান করেন। তিনি হজ্বব্রত পালনে গিয়ে সেখানে ইনতেকাল করেন।

২৭। মৌলভী হিবাতি ওরফে মৌলভী জান মোহাম্মদ

তিনি হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. থেকে ফয়েজ হাসিল করে খেলাফত লাভ করেছিলেন। লোকেরা তার অনেক কারামতের কথা বর্ণনা করেছে। কান্দাহারের হাজার হাজার লোককে তিনি হেদায়েত করেছিলেন।

২৮। মাওলানা মোহাম্মদ আজীম

মাওলানা মোহাম্মদ আজীম এক বিস্ময়কর মার্জিত চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন। সৎগুণাবলী তাঁর জন্মগত বৈশিষ্ট্য ছিলো। হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. এর কাছ থেকে এজাযত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর পীর মোর্শেদের ইনতেকালের পর হারামাইন শরীফাইন চলে যান এবং সেখানেই ইনতেকাল করেন।

২৯। মৌলভী নূর মোহাম্মদ

তিনি বহু রিয়াজত ও সাধনা করার পর হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. এর খেদমতে হাজির হয়ে বায়াত গ্রহণ করেন। জিকির, শোগল ও মোরাকাবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন এবং তরিকার এজাযত লাভ করেন। হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. বলতেন, চার ব্যক্তি আমার খান্দানের মধ্যে গৌরবান্বিত— মৌলভী শের মোহাম্মদ, মৌলভী মোহাম্মদ জান, মৌলভী মোহাম্মদ আজীম এবং মৌলভী নূর মোহাম্মদ। এই চার জনই এক পেয়ালা থেকে পানকারী, এক পেয়ালা গ্রহণকারী এবং এ চারজনই অভিজ্ঞ আলেম।

৩০। মির্জা মুরাদ বেগ

পূর্ণ যোহদ এর অধিকারী হওয়ার কারণে হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. তাঁকে ওই সময়ের জুনায়েদ বলে ডাকতেন। তাঁর নেসবত ছিলো খুব মজবুত। লোকেরা তাঁর কাছ থেকে অনেক উন্নত হাল লাভ করেছিলো। তিনি হজরতের কাছ থেকে এজাযত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর পীর মোর্শেদের জীবদ্দশায়ই ইনতেকাল করেছিলেন। মির্জা মাযহার জানে জানান শহীদ র. এর পায়ের কাছে তাঁকে দাফন করা হয়।

৩১। মোহাম্মদ মুনাওয়ার আকবরাবাদী

তিনি শাহ্ গোলাম আলী র. এর খলীফাবৃন্দের মধ্যে সুদৃঢ় নেসবতের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর কাছ থেকে অনেক ফয়েজ হাসিল করেছিলেন।

৩২। মিঞা মোহাম্মদ আসগর সাহেব

তিনি অত্যন্ত সুদৃঢ় নেসবতের অধিকারী ছিলেন। হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. এর নির্দেশে তিনি আমার পিতা শাহ্ আবু সাঈদ র. এর খেদমতে বসতেন। তিনিও তাঁর প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। খানকা শরীফের নিয়ম শৃঙ্খলা দেখা শোনার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়েছিলো। তাঁর তাওয়াজ্জোহ দ্বারা লোকেরা অনেক উপকার লাভ করতো। হারামাইন শরীফাইন জিয়ারত করার পর প্রত্যাবর্তন করেন এবং পুনরায় আমার পিতার সঙ্গে জিয়ারতে গমন করেন। জিয়ারত শেষে দিল্লীতে ফিরে আসেন। ১২৫৫ হিজরীতে তিনি ইনতেকাল করেন। এই খানকাতেই তাঁকে দাফন করা হয়।

৩৩। মীর নকশে আলী

তিনি হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. থেকে তরিকার নেসবত হাসিল করার পর লখনৌ চলে যান।

৩৪। মিঞা আহমদ ইয়ার

তিনি একজন সওদাগর ছিলেন। মোজাদ্দেদিয়া তরিকার সমস্ত নেসবত তিনি হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. থেকে হাসিল করেছিলেন। তাঁর কবরও এই খানকাতে অবস্থিত।

৩৫। মিঞা কমরুদ্দীন

তিনি কাদেরিয়া সিলসিলার বুজুর্গগণের মধ্যে ছিলেন। প্রথমে তিনি মোজাদ্দেদিয়া তরিকাকে অস্বীকার করতেন। পরে পেশোয়ার থেকে এসে হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. এর হালকায় প্রবেশ করেন এবং এজাযত প্রাপ্ত হয়ে চলে যান।

৩৬। মোহাম্মদ শের খান

তিনি আফগানিস্তানের ওলীদের মধ্যে ছিলেন। সেখান থেকে হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. এর দরবারে এসে তরিকার নেসবত হাসিল করে আবার সেখানে প্রত্যাবর্তন করেন।

৩৭। শায়েখ জলীলুর রহমান

তিনি হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. এর খাস খাদেম ছিলেন। সুদৃঢ় নেসবতের অধিকারী ছিলেন। তাঁর প্রতি হজরতের বিশেষ অনুগ্রহ ছিলো। একদিন তিনি হজরতের জিকিরের হালকায় তাঁর মুখোমুখি হয়ে বসেছিলেন। এক ব্যক্তি অকস্মাৎ তাঁর উপর তরবারীর আঘাত করে। তিনি হজরতের পায়ের উপর পড়ে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে শাহাদতবরণ করেন। হজরতের অসুস্থতার শেষের দিকে এই ঘটনা ঘটেছিলো। এই শহীদের কবরও মির্জা মাযহার জানে জানান শহীদ র. এর পায়ের কাছে অবস্থিত [৩৯]।

রব্বানা লা তুআখিয্না ইন্নাসীনা আও আখত্ব'না, সুবহানা রব্বিকা রব্বিল ইজ্জাতি আ'ম্মা ইয়াসিফূন ওয়া সালামুন আ'লাল মুরসালীন ওয়াল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন।

তথ্যপঞ্জি

১। শাহ্ আবদুল লতীফ সে যুগে মহৎ ব্যক্তিবর্গের অন্যতম ছিলেন। বাটালা (পাঞ্জাব) এর অধিবাসী ছিলেন। তিনি আপন পীর মোর্শেদের খেদমতের জন্য একা একা দিল্লীতে থাকতেন (জাওয়াহেরে উলুব্বিয়া পৃষ্ঠা ১৪০)। তিনি হজরত শাহ্ ফায়েলুদ্দীন কাদেরীর নিকটাত্মীয় ছিলেন (এরশাদুল মুস্তারশেদীন, পৃষ্ঠা ১৮-১৩৪)।

২। শাহ্ নাসেরউদ্দীন কাদেরী দিল্লীর নামকরা মাশায়েখের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি ১১৭৪ হিজরীতে ইনতেকাল করেন (দুররুল মাআরেফ পৃষ্ঠা ৯৭)।

৩। তিনি এলমে হাদিসের শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং সনদ প্রাপ্ত হন শাহ্ ওলিউল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভীর পুত্র শাহ্ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেছে দেহলভীর কাছ থেকে (নুযহাতুল খাওয়াতের ৭/৩৫৬ ও দুররুল মাআরেফ, পৃষ্ঠা ৭৫-৭৬)।

৪। আদাবুল মুরিদীন, রচয়িতা হজরত শায়েখ জিয়াউদ্দীন আবু নজীব আবদুল কাহের সোহরাওয়ার্দী। সুফিয়ানে কেরামের নিকটে এই কিতাব খুবই গ্রহণযোগ্য। এর বেশ কয়েকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে।

৫। মোহাম্মদ আকবর শাহ্ সানি, তাঁর পিতা শাহ্ আলম সানি।

৬। আল কোরআন, সুরা যারিয়াত, ৫১/২২।

৭। আল কোরআন, সুরা আনআম, ৬/২৬।

৮। আল কোরআন, সুরা নহল ২৭/৮৮।

৯। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর পিতা হজরত শায়েখ আবদুল আহাদ র. চিশতিয়া সিলসিলায় হজরত শায়েখ আবদুল কুদ্দুছ গাংগুহি র. এর পুত্র হজরত শায়েখ রুকুনুদ্দীন র. এর বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন।

১০। আল কোরআন, সুরা যুমার, ৩৯/৪২।

১১। আল কোরআন, সুরা সেজদা, ৩২/১১।

১২। শায়েখ ইবনে ইয়ামন ফার্সী ভাষার বিখ্যাত কবি ছিলেন। তাঁর দেওয়ান (কাব্যগ্রন্থ) ইরান থেকে ছাপা হয়েছে।

১৩। মেশকাত শরীফ (স্বপ্ন অনুচ্ছেদ) পৃষ্ঠা ৩৯৪, সাদী প্রেস, করাচী।

১৪। ইবনে মাজা, পৃষ্ঠা ১৮৮ (নূর মোহাম্মদ প্রেস, করাচী)তে রেওয়ায়েতটি এরকম– লা যাওয়ালুদ দুনইয়া আহ্ওয়ানু আ'লাল্লাহি মিন কাতলি মু'মিনিন বিগইরি হাক্কিন।

মাকামাতে মাযহারীতে আলাল্লাহ এর স্থলে 'ইন্দাল্লাহ' আর মুমিন শব্দের স্থলে 'নাফসি মুমিন' উল্লেখ করা হয়েছে । 'বিগাইরি জাককিন' শব্দের উল্লেখ নেই।

১৫। আল কোরআন, সুরা নিসা, ৪/৮৭।

১৬। এহাতাহ অর্থ বেষ্টনী– যার মধ্যে বর্তমানে এ চার বুজুর্গের মাজার অবস্থিত–

১. হজরত মির্জা মাযহার জানে জানান শহীদ
২. হজরত শাহ্ গোলাম আলী দেহলভী
৩. হজরত শাহ্ আবু সাঈদ মোজাদ্দেদী
৪. হজরত শাহ্ আবুল খায়ের মোজাদ্দেদী

১৭। মৌলভী যিয়াউন্নবী, পিতা এনায়েতুন্নবী– তিনি হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. আওলাদের মধ্যে একজন ছিলেন। সেরহিন্দ শরীফে তাঁর জন্ম হয় ১১৬৮ হিজরীতে। ১১৭০ হিজরীর মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে সেরহিন্দ শরীফে তৃতীয়বার শিখ হামলার সময় তিনি তাঁর শায়েখ আরশাদ র. এর সঙ্গে রামপুর চলে গিয়েছিলেন। সেখানে নির্লিপ্ততা এবং খোদাভীতির জীবন যাপন করেন। ১২১৫ হিজরীতে তাঁর ইনতেকাল হয় (এজন্য পাঠ করা যেতে পারে এলেম ও আমল— কৃত আবদুল কাদের, পৃষ্ঠা ৭৯, ৮৪, ৮৬।

১৮। মুফতী শরফুদ্দীন হানাফী রামপুরী রামপুরের বিখ্যাত আলেম ও শিক্ষক ছিলেন। অনেক নামকরা আলেম তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন (নুযহাতুল খাওয়াতের ৭/২০৭–২০৮)।

১৯। শায়েখ ফয়েজ বখশ দরগাহী নকশবন্দী। তাঁর জন্ম হয়েছিলো তখতে হাজারা, পাঞ্জাবে। বদায়ুনে শায়েখ জামালউদ্দীনের কাছে বায়াত গ্রহণ করে সুলুক সম্পন্ন করেন। হজরত রউফ আহমদ মোজাদ্দেদী প্রথম দিকে তাঁর কাছ থেকে ফায়দা হাসিল করেছিলেন (জাওয়াহেরে উলুব্বিয়া, পৃষ্ঠা ২৭১)। শাহ্ দরগাহীর ইনতেকাল হয়েছিলো রামপুরে ১২২৬ হিজরীতে (নুযহাতুল খাওয়াতের ৭/১৬৫)।

২০। জাওয়াহেরে উলুব্বিয়া, পৃষ্ঠা ২৭২ এ উপাধি 'সুলতানুল আরেফীন' লেখা হয়েছে— এটাই সঠিক। কেনোনা সুলতানুত্তারেকীন তো শাহ্ দরগাহীরই উপাধি ছিল।

২১। সাইয়্যেদ হাফেজ জামালুল্লাহ সাইয়্যেদ কুতুবুদ্দীন মোহাম্মদ আশরাফ হোসাইন ইবনে এনায়েতুল্লাহর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। ১২০৯ হিজরীর সফর মাসের ৩ তারিখে

রামপুরে তিনি ইনতেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয় (জাওয়াহেরে উলুব্বিায়া, পৃষ্ঠা ২৭২-২৭৭)।

২২। শাহ্ নিজামউদ্দীন হজরত শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী র. এর আওলাদ ছিলেন। হজরত খাজা বাকীবিল্লাহ র. এর কন্যাজাত আওলাদ ছিলেন। বিখ্যাত মারাঠা অধিপতি সিন্ধিয়া তাঁকে ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। বাদশাহ্ আলমেসানি তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। ইতোপূর্বে একবার সিন্ধিয়া তাঁকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে স্বীয় মনোনিত ব্যক্তি হিসাবে দরবারে প্রেরণ করেছিলেন। সিন্ধিয়া ভালো করেই জানতেন যে, শাহ্ নিজামুদ্দীনের ব্যক্তিত্ব দিল্লীতে তার কর্মতৎপরতার বিষয়ে সর্বসাধারণের সমর্থন পাবে। কেনোনা দিল্লীর বাদশাহ্ এ ধরনের পবিত্র ব্যক্তিগণকে খুবই সম্মান করেন। এ জন্য পাঠ করা যেতে পারে– Poona Residency correspondence, Vol-1 (Mohadji Sindhiz and North India Affairs. 1785-1797) by J N. Sarkar, Bombay.

তাছাড়া যদুনাথ সরকার তাঁর এক পত্রে শাহ্ নিজামুদ্দীন সম্পর্কে লম্বা ফিরিস্তি বর্ণনা করেছেন। এ জন্য পাঠ করা যেতে পারে ইব্রাহীম বেগ, তাজকেরা গমগীন, ছাপা গোয়ালিয়র ১৩৪৮ হিজরী। আরও পাঠ করা যেতে পারে কাজী আবদুল ওয়াদুদ রচিত গমগীনে দেহলভী, বোরহান– অক্টোবর সংখ্যা ১৯৬০ ইং।

২৩। আমাদের ধারণা অনুসারে হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. তাঁর প্রতি অসন্তুষ্টির কারণ এই হতে পারে যে, তিনি তাঁর মাশায়েখে কেরামের রীতির বিপরীত মুসলমানদের দুশমন মারাঠাদেরকে শুধু সাহায্যই করেননি, বরং মারাঠাদের দিল্লী হস্তগত করার জন্য রাস্তা সমান করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

২৪. এখানে পুস্তিকা বলতে বুঝানো হয়েছে 'হেদায়াতুত্বলেবীন'। এটি কয়েকবার ছাপা হয়েছিলো। ছাপানো কপি বিভিন্ন কুতুবখানায় পাওয়া যায়। মাওলানা মরহুম নূর আহমদ আমরতসরী নেহায়েত গুরুত্বের সাথে এর মতন সজ্জিত করে উর্দু তরজমার সাথে ১৩৪৪ হিজরীতে প্রকাশ করেছিলেন।

২৫। প্রশংসাসূচক বাণীর সারমর্ম নিম্নরূপ–

আমি ফকীর আবদুল্লাহ ওরফে গোলাম আলী এ পুস্তিকা পাঠ করে তার বিষয় বস্তু দৃষ্টে খুব খুশি হয়েছি। পুস্তিকা রচনাকারীর জন্য দোয়া খায়ের করি। এ পুস্তিকার মধ্যে তিনি যা কিছু সন্নিবেশিত করেছেন, তা সম্পূর্ণ হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর এলেম ও মারেফতের অনুকূলে। এ অধম বান্দার আলোচনা এই পুস্তিকায় জরুরী ছিলো না। তবে হাঁ, নেয়ামতের শুকরিয়া এবং নেয়ামতদাতার শুকরিয়া প্রকাশ করা তো আবশ্যকীয়ই বটে।

২৬। শাহ্ আবদুল মুগনী হজরত শাহ্ আবু সাঈদের তৃতীয় সন্তান ছিলেন। ১২৩৯ হিজরীতে লখনৌতে তাঁর জন্ম হয়। আর তিনি ইনতেকাল করেন ১২৯২ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায়। এ বিষয়ে পাঠ করা যেতে পারে 'মানাকেবে আহমদিয়া ও মাকামাতে সাঈদিয়া, পৃষ্ঠা ৬৬।

২৭। মৌলভী হাবীবুল্লাহ মুলতানী হজরত শাহ্ আহমদ সাঈদ র. এর খলীফাগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। আকলী ও নকলী এলেমের সমন্বয়কারী ছিলেন। তিনি হজরত শাহ্ আবু সাঈদ থেকে তরিকার তালীম নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সাথেই এক সঙ্গে হজ্বব্রত পালন করেছিলেন (মানাকেবে আহমদিয়া ও মাক্বামাতে সাঈদিয়া, পৃষ্ঠা ২২০। যিকরুস্ সাঈদাইন ফী সীরাতিল ওয়ালেদাইন, পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪)।

২৮। কাযী খলীলুর রহমান রামপুরী, পিতা ইরফান, পিতা ইমরান, পিতা আবদুল হাকীম। তাঁর জন্ম হয়েছিলো রামপুরে। টুঁক নামক স্থানে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। নবাব আমীর খান এবং ওযীরুদ্দৌলার শাসনামলে টুঁকের কাযী ছিলেন। এ বিষয়ে পাঠ করা যেতে পারে এলেম ও আমল এবং নুযহাতুল খাওয়াতের।

২৯। এখানে পুস্তিকা দ্বারা বুঝানো হয়েছে হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. রচিত কিতাব 'কামালাতে মাযহারিয়া' যা ১২৩৭ হিজরীতে লেখা হয়েছিলো।

৩০। হজরত শাহ্ সা'দুল্লাহর জন্মস্থান উচড়ি এলাকার পুগলি (পাঞ্জাব)। তিনি তাজিকিস্তানের লোক ছিলেন। তিনি তাঁর পীরভাই মৌলভী আখুন্দ শের মোহাম্মদের কাছে এলেম শিখেছিলেন। ১২৪৫ হিজরীতে হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্যে পৌঁছেন। সেখানে দু' বছর অবস্থান করার পর গোলকুণ্ডা চলে যান। বোখারা, কাবুল, কান্দাহার ও পেশোয়ারের বিভিন্ন আলেম ওলামা তাঁর কাছে এসে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। দেড় দু'শ' হকপন্থী লোক সব সময় তাঁর আস্তানায় সমবেত হতো। নবাব আফজলুদ্দৌলা তাঁর ভক্ত ছিলেন। হজরত শাহ্ সা'দুল্লাহর ইনতেকাল হয়েছিলো ২৭ জমাদিউল উলা ১২৭০ হিজরীতে।

৩১। ফেকাহ্শাস্ত্রে তাঁর রচিত কয়েকটি পুস্তিকা আছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আরকানে ইসলাম (উর্দু) নেজামী প্রেস কানপুর থেকে প্রকাশিত। তাফসীরে রউফী ছাড়াও তাবারাকাল্লাজী তাফসীরের একটি পুস্তিকা কুতুবখানা রেজা, রামপুরে রক্ষিত আছে।

৩২। অর্থাৎ শাহ্ রউফ আহমদ, পিতা শাহ্ শউর আহমদ, পিতা মোহাম্মদ শরফ, পিতা রেজাউদ্দীন, পিতা যয়নুল আবেদীন, পিতা খাজা মোহাম্মদ ইয়াহইয়া, পিতা হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র.।

৩৩। অর্থাৎ শাহ্ আবদুর রহমান, পিতা শাহ্ সাইফুর রহমান, পিতা শায়েখ সাইফুল্লাহ, পিতা শায়েখ কালেমাতুল্লাহ, পিতা খাজা সাইফুদ্দীন, পিতা খাজা মোহাম্মদ মাসুম, পিতা হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র.।

৩৪। পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের একটি শহর নাম আখুড়া। তখন স্থানটির নাম ছিলো খায়েরপুর। সিন্ধুতে কাহুড়া নামে খ্যাত ছিলো (আনসাবুল আঞ্জাব, পৃষ্ঠা ৪১)।

৩৫। হজরত শাহ্ আবদুর রহমানের জন্ম হয়েছিলো ১১৯৪ হিজরীতে (আনসাবুল আঞ্জাব, পৃষ্ঠা ১৪। হাদিয়া আহমদিয়া, পৃষ্ঠা ৮৩)। তিনি আকলী ও নকলী এলেম, ফেকাহ্, হাদিস, তাফসীর ও এলমে তাসাউফ— এ সকল এলেমের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবের জলন্ধর এলাকার পীর মোর্শেদ ছিলেন। সেখানে তাঁর অনেক মুরিদ ছিলো। (খাযিনাতুল আসফিয়া, পৃষ্ঠা ১/৭০৪)।

৩৬। মৌলভী করমুল্লাহ্‌র ইনতেকালের সন নিয়ে মতভেদ আছে। হাদায়েকুল হানাফিয়া এবং তাযকেরা উলামায়ে হিন্দ এ লেখা হয়েছে ১২৫৮ হিজরী– যা ভিত্তিহীন। নুযহাতুল খাওয়াতেরে হাদীকাতুল আহমদীয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা হয়েছে ১২৫২ হিজরী। এটিকে আমরা প্রাধান্য দিয়েছি। তাঁর জন্ম ও প্রতিপালন হয়েছিলো দিল্লীতে। তিনি জাহেরী এলেম হাসিল করেছিলেন শাহ্‌ আবদুল কাদের ইবনে শাহ্‌ ওলিউল্লাহ থেকে। তিনি শাহ্‌ রফিউদ্দীনেরও ছাত্র ছিলেন। ৪৩ বছর বয়সে তিনি হজ্বব্রত পালন করেন। তাঁকে সুরাটে দাফন করা হয়। নুযহাতুল খাওয়াতের ৭/৩৯৪।

৩৭। মাওলানা খালেদ হজরত শাহ্‌ আবদুল আজীজ থেকে সিহাহ্‌ সিত্তা কিতাবের এজাযত নিয়েছিলেন (মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ রচিত আল বাহজাতুস সানিয়াহ, পৃষ্ঠা ৮২)।

৩৮। মাওলানা খালেদ কুর্দির কাছ থেকে তিনি হাদিস শাস্ত্রের পঞ্চাশটি কিতাবের সনদ গ্রহণ করেছিলেন। স্বপ্নে রসুলেপাক স. এর নির্দেশ পেয়ে তিনি হজরত শাহ্‌ গোলাম আলীর খেদমতে দিল্লী হাজির হন (জাওয়াহেরে উলুব্বিয়া পৃষ্ঠা ২৪০)। শাহ্‌ আবদুল গাফ্‌ফার ১২৬৪ হিজরীতে মাদ্রাজ চলে যান। জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি হারামাইন শরীফাইনে সময় অতিবাহিত করেন। ১২৮৩ হিজরীতে ৯ শাওয়াল তারিখে মক্কা মুকাররমায় ইনতেকাল করেন।

৩৯ হজরত শাহ্‌ গোলাম আলী র. এর বহু সংখ্যক খলীফা ছিলেন। পরিশিষ্ট রচয়িতা জাওয়াহেরে উলুব্বিয়া কিতাবে প্রাপ্ত খলীফাগণের ফিরিস্তি উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া হজরত মাওলানা আবদুর রহমান শাহ্‌জাহানপুরী সাইয়্যেদ আহমদ কুর্দি, মোহাম্মদ মুনাওয়ার, মিঞা আসগর, মিঞা কমরুদ্দীন পেশাওয়ারী ও মোহাম্মদ শের খানের নাম বৃদ্ধি করেছেন। কিন্তু তাঁদেরকে ছাড়া আরও বিভিন্ন তথ্য থেকে প্রাপ্ত কতিপয় আসহাবের নাম পাওয়া যায়, যাঁরা হজরত শাহ্‌ গোলাম আলীর কাছ থেকে ফয়েজ প্রাপ্ত হয়ে আরব ও আজমের বিভিন্ন দেশে তরিকত শিক্ষা দানে নিয়োজিত ছিলেন।

শাহ্ গোলাম আলী র. এর জ্ঞানগত সম্পদসমূহ

শাহ্ গোলাম আলী র. এর রচনাবলী, পুস্তিকাসমূহ, তাঁর মলফুযাত (বাণীসমূহ) এবং মকতুবাত (পত্রাবলী) সম্পর্কে যা কিছু জানা গিয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে উপস্থাপন করা হচ্ছে—

১. ইজাহুত্ তরিকত। নকশবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার উসুল, জিকির আযকার এবং পরিভাষা সম্পর্কে তিনি এই কিতাবটি রচনা করেছিলেন ১২১২ হিজরীতে। এটি কয়েকবার ছাপা হয়েছে। এর বহু হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন কুতুবখানায় পাওয়া যায়।

২. আহওয়ালে বুজুর্গান। এই পুস্তিকাটিতে বিভিন্ন সিলসিলার বিখ্যাত কতিপয় মাশায়েখে কেরামের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত তুলে ধরা হয়েছে। পুস্তিকাটির হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি লাহোর কুতুবখানায় রক্ষিত আছে। রচনাকাল সম্ভবতঃ ১২২৫ হিজরীর পরে।

৩. রেসালা দর জিকরে মাক্বামাত ও মাআরেফ ওয়ারেদাতে হজরত মোজাদ্দেদ র.। পুস্তিকাটি হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর বিখ্যাত জীবনীগ্রন্থ হাজিরাতুল কুদস এবং যুবদাতুল মাকামাত থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত কিছু ঘটনাও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৩৭। এর হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি মৌলভী গোলাম নবীর খানকা শরীফ ঝিলাম অঞ্চলে, ডেরা ইসমাঈল খাঁ মুসাজাইয়ের খানকায় এবং হায়দরাবাদে দাক্ষিণাত্যে কুতুবখানা আসফিয়াতে মওজুদ আছে।

৪. রেসালায়ে তরিকে বায়আত ও আজকার। এই পুস্তিকাটি সাবয়ে সাইয়ারার সঙ্গে ছাপা হয়েছিলো।

৫. রেসালাদর তরিকায়ে শাহ্ নক্শবন্দ। এই পুস্তিকাটি সাবয়ে সাইয়ারা ও তাঁর মকতুবাতের অন্তর্ভূত।

৬. রেসালা সতরে চান্দ আয আহওয়ালে শাহ্ নকশবন্দ। হজরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দ র. এর জীবনচরিত ও তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে লিখিত। রেসালা সাবয়ে সাইয়ারা এবং তাঁর মকতুবাতের সাথে সংযুক্ত।

৭. রেসালা আজকার। এটি একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা রেসালা সাবয়ে সাইয়ারার সাথে যুক্ত।

৮. রেসালা মোরাকাবাত। পুস্তিকাটি মকতুবাত ও রেসালা সাবয়ে সাইয়ারার অন্তর্ভুক্ত।

৯. রেসালা দর রদ্দে এতেরাযাতে শায়েখ আবদুল হক বর হজরত মোজাদ্দেদ। হজরত শাহ্ গোলাম আলী এই পুস্তিকায় হজরত শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী র. এর কিছু প্রশ্নের জবাব প্রদান করেছেন। এই পুস্তিকাটিও রেসালা সাবয়ে সাইয়ারার মধ্যে শামিল।

১০. রেসালা দিগার রদ্দে মুখালেফীনে হজরত মোজাদ্দেদ। এই পুস্তিকাটি তিনি রচনা করেন হজরত মোজাদ্দেদ র. এর উপর আরোপিত প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদানার্থে। এটিও সাবয়ে সাইয়ারার অন্তর্ভুক্ত।

১১. রেসালায়ে মাশগুলিয়া। এই পুস্তিকাটি হজরত খাজা দোস্ত মোহাম্মদ কান্দাহারীর কুতুবখানার তালিকায় আছে। তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন, এটি শাহ্ গোলাম আলী রচিত। এর পাণ্ডুলিপিটি ছিলো অমুদ্রিত অবস্থায়।

১২. সুলুকে রাকিয়া নক্শবন্দিয়া। এটি শায়েখুল ইসলাম আরেফে হিকমত কুতুবখানা, মদীনা মুনাওয়ারায় রক্ষিত আছে। এটি হজরত শাহ্ গোলাম আলী কর্তৃক রচিত বলে দাবী করা হয়। এ সম্পর্কে অধিক কিছু জানা যায়নি।

১৩. মাকাতিবে শরীফা। এতে রয়েছে শাহ্ গোলাম আলীর ১২৫টি মকতুব, যা একত্রিত ও সংকলিত করেছেন তাঁরই সুযোগ্য খলীফা শাহ্ রউফ আহমদ রাফাত মোজাদ্দেদী। এটি সংকলন করা হয়েছিলো ১২৩১ হিজরীতে। এটি প্রথমবার ছাপা হয়েছিলো আজিজী ছাপাখানা মাদ্রাজ থেকে ১৩৩৪ হিজরীত। তারপর ১৩৭১ হিজরীতে হাকীম আবদুল মজীদ সাইফী লাহোর থেকে প্রকাশ করেন। অতঃপর ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে জনাব হোসাইন হেলমী তুর্কিস্তান থেকে প্রকাশ করেন।

১৪. দুররুল মাআরেফ। তাঁর খলীফা হজরত শাহ্ রউফ আহমদ রাফাত মোজাদ্দেদী শাহ্ আবু সাঈদ মোজাদ্দেদীর নির্দেশে তাঁর মলফুযাত (বাণীসমূহ) একত্রিত করেছিলেন। এটি জাহেরী ও বাতেনী এসলাহের মাধ্যম। অধিকাংশ তারিখ অনুসারে সাজানো হয়েছিলো। আবার কিছু কিছু মলফুযাত তারিখ ছাড়া এক সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সংকলন প্রকাশ করা হয়েছিলো নাদেরী প্রেস, বেরেলী থেকে ১৩০৪ হিজরীতে। মাহবুবুল মাতাবে প্রেস, দিল্লী থেকে প্রকাশ করা হয় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে, মুলতান থেকে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে এবং ইস্তাম্বুল, তুর্কিস্তান থেকে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে। পুস্তিকার উর্দু তরজমা প্রকাশ করে এনায়েতিয়া ফাউণ্ডেশন, পাকিস্তান, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে।

১৫. মলফুযাত শরীফা। শাহ্ গোলাম আলী র. এর মকতুবসমূহের অপর একটি সংকলন। সংকলিত করেছেন তাঁর সুযোগ্য খলীফা হজরত মাওলানা গোলাম মহিউদ্দীন কাসুরী র.। প্রকাশ কাল আনুমানিক ১২৩০ হিজরী। পুস্তিকাটি

এলমে তাসাউফ এবং নক্‌শবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার মূল্যবান সূক্ষ্ম বিষয়সমূহে পূর্ণ। এর সাতটি লিখিত পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে। তরজমা ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে লাহোর থেকে প্রকাশ করে মাকতাবা নববিয়া।

১৬. কামালাতে মাযহারিয়া। এই কিতাবটি হজরত শাহ্ গোলাম আলী র. তাঁর শায়েখ হজরত মির্জা মাযহার র. এর চিন্তা-চেতনা ও তাঁর জীবনের বিভিন্ন অবস্থা নিজের জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ১২৩৭ হিজরীতে রচনা করেছিলেন। কিতাবটির একটি লিখিত পাণ্ডুলিপি আছে। পাণ্ডুলিপিটি খানকা মাযহারিয়া মোজাদ্দেদিয়ার সাবেক সাজ্জাদানশীন ও মোতাওয়াল্লী হজরত শাহ্ আবুল হাসান জায়েদ ফারুকী র. এর ব্যক্তিগত কুতুবখানায় রক্ষিত আছে। লেখক শাহ্ গোলাম আলী এই কিতাবের কোনো নামকরণ করেননি। হজরত জায়েদ কিতাবটি অধ্যয়ন করার পর নাম নির্ধারণ করেন। কিতাবটি মূলতঃ মাক্বামাতে মাযহারীর সার সংক্ষেপ।

১৭. মাক্বামাতে মাযহারী। হজরত মির্জা সাহেবের বিস্তারিত জীবনচরিত। এর মধ্যে হজরত মির্জা মাযহার র. এর জন্মদিন থেকে শাহ্াদত দিবস পর্যন্ত তাঁর জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ও মর্যাদাসমূহ, তাঁর কতিপয় মকতুব ও মলফুযাত (বাণীসমূহ) সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এই গ্রন্থটি লেখা হয়েছে হজরত মির্জা সাহেবের শাহ্াদতের প্রায় ষোল বছর পর। এটি রচনা করতে মৌলভী নাঈমুল্লাহ বাহরায়েচী র. এর দুটি কিতাব 'বাশারাতে মাযহারিয়া' এবং 'মামুলাতে মাযহারিয়া' থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা নেয়া হয়েছে।

নকশ্‌বন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহ।

'আলিফ'

আদমিউল মাশরাবঃ তাজাল্লিয়ে ফেলী অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার কার্যাবলীর বিকাশ এবং কলবের ফানার আমল। এই লতিফার বেলায়েত হজরত আদম আ. এর পদতলে। এই বেলায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলা হয় আদমিউল মাশরাব। অর্থাৎ আদম আ. এর সঙ্গে এক পাত্রে পানকারী।

ইব্রাহিমি উল মাশরাবঃ এখানে সালেক নিজকে স্বীয় গুণাবলী থেকে শূন্য পায়, গুণাবলী সবই আল্লাহ্তায়ালার দিকে সম্বন্ধকৃত বলে দেখতে পায়। এই অবস্থাকে তাজাল্লিয়ে সিফত (আল্লাহ্তায়ালার গুণের বিকাশ) বলা হয়। এই লতিফার বেলায়েত হজরত ইব্রাহীম আ. এর পদতলে। এই বেলায়েত প্রাপ্তদেরকে ইব্রাহীমিউল মাশরাব বলা হয়।

এত্তেসালে বে-কাইফঃ (প্রকার ও ধরনবিহীন মিলন) প্রেমাষ্পদ ও প্রেমিকের মিলন এবং প্রেমিকের ফানা (লয় প্রাপ্তি) এর পর প্রেমাষ্পদের দর্শন। এখানে এত্তেসালে বে-কাইফ বলতে এত্তেসালে শুহুদী (দিব্যমিলন)কে বুঝানো হয়েছে।

এছবাতে গয়রিয়তঃ হক তায়ালাকে নফী (রহিত) করে অপরত্বকে সাব্যস্ত করা।

আছরঃ আসমা ও সিফতের (নাম ও গুণাবলীর) সৌন্দর্য ও পূর্ণতার প্রকাশস্থল।

আহদিয়াতে সেরফাঃ এটি লা তাআইয়ুন (সীমাহীনতা) এর স্তর। এখানে সিফতসমূহও দূর হয়ে যায়। কেবলই যাত পাকের খাঁটি ওজুদ বিদ্যমান থাকে। এখানে লা নেহায়া (অসীম) এর শুরু এবং লা বেদায়া (প্রারম্ভহীনতা) এর শেষ।

এহসানঃ ওই মাকাম, যেখানে আল্লাহ্তায়ালার আসমা ও সিফত (নাম ও গুণাবলী) এর নমুনা দেখা যায়।

আহওয়াল তাজাঃ সতেজ হাল। হালের বহুবচন আহওয়াল। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে ফয়েজের উপহার, যা নফসের পবিত্রতা ও কলবের পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে বান্দার নেক আমলের প্রতিদান অথবা নিছক আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ লাভ করা।

আযওয়াকঃ যওক এর বহুবচন আযওয়াক। এর অর্থ আত্মিক আস্বাদন। প্রিয়জনের বাণী শোনার পর তালেবের মধ্যে যে হাল পয়দা হয় তাকে যওক বলে। হক তায়ালার (আত্মিক) দর্শন লাভের প্রথম নমুনা হচ্ছে যওক। সুফিয়ানে কেরাম প্রথম স্তরের শুহুদ (আত্মিক দর্শন) এর নাম দিয়েছেন যওক।।

আরবাবে কাশফঃ কাশফধারী ব্যক্তি, যে হক তায়ালার মোশাহাদা (আত্মিক দর্শন) এবং তাঁর তাজাল্লী (আত্মিক বিকাশ) বারংবার প্রাপ্ত হয় না।

আরবাবে জেহেল— তালেবদের ওই প্রকার, যে তলবের ক্ষেত্রে মুর্দা দিল এবং হাকীকত লাভ করা থেকে বিমুক্ত।

এস্তেগরাকঃ নিমজ্জন অর্থাৎ হক তায়ালার জিকিরের মধ্যে ফানা হাসিল করা বা নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া।

এস্তেহলাকঃ সব সময় জামালে এলাহীর দর্শনের মধ্যে ডুবে থাকা। স্বীয় সত্তাকে হক তায়ালার সত্তার মধ্যে ধ্বংসশীল পাওয়া।

আসরারে তওহীদঃ একত্ববাদের এলেম তার প্রকার সহকারে জানা।

আসমা ও সিফতঃ ইসিম ওই শব্দকে বলা হয়, যদ্‌দ্বারা আল্লাহ্‌র গুণাবলীর দিকে ইশারা করা হয়। অর্থাৎ তাঁর নাম। ইসিম এর বহুবচন আসমা। সিফত ওই শব্দকে বলা হয়, যদ্‌দ্বারা আল্লাহ্‌র গুণাবলীর দিকে ইশারা করা হয়।

এসমায়ে নফসঃ মৌখিক জিকিরের সাথে কলবী জিকির। এটা মৌখিক জিকিরের প্রথম প্রকার। একে খফী জিকিরও বলা হয়।

ইসমুল বাতেনঃ আল্লাহ্‌র ইসমে যাত থেকে যে সকল ইসিম গোপন আছে সেগুলোকে ইসমুল বাতেন বলা হয়।

ইসমে সগীরঃ মানুষের আলমে খালক ও আলমে আমরের সমন্বয়ে ইসিমের যোগ্য হওয়াকে ইসমে সগীর বলা হয়।

ইসমুজ জাহেরঃ হক তায়ালা প্রকাশিত হওয়াকে ইসমুজ জাহের বলা হয়।

এশরাফে খাওয়াতেরঃ দিলসমূহের ভেদ জানা। একে কাশফে কুলুবও বলা হয়।

এস্তেফাঃ এক মাকাম থেকে একবারে অন্য মাকামে সফলকাম হওয়া বা মনোনীত করাকে এস্তেফা বলা হয়।

এসমেহলালঃ ফানা হওয়া, লয়প্রাপ্ত হওয়া।

এ'দামঃ আইনে ছাবেতার ওই এলেম যা হক তায়ালার নিকটে বিদ্যমান, কিন্তু বহির্জগতে অবিদ্যমান।

এ'দামে এযাফিয়াঃ যার উপর আছার ও আহকাম সাব্যস্ত হয়। ওজুদের ফয়েজ লাভের পর যা ওজুদের জন্য কল্যাণকর হয়।

আ'ইয়ানে ছাবেতা ফিল এলেমঃ সম্ভাব্য বস্তুর হাকীকত, যা আল্লাহ্‌তায়ালার এলেমের মধ্যে আছে।

আ'ইয়ানে খারেজিয়াঃ যেহেনের মধ্যে যা মওজুদ তার মোকাবেলায় তা বহির্জগতে বিদ্যমান থাকা। আ'ইয়ানে ছাবেতার এলেমগত আকৃতি।

এফাযা কামালাতঃ অনুসরণের একটি স্তর, যা শুধু মহব্বতের সাথে সম্পৃক্ত।

এফাকাঃ চৈতন্যময় অবস্থা।

এলকাঃ আল্লাহ্‌পাকের তরফ থেকে যে এলেম আসে, তাকে এলকা বলা হয়।

আমরে এনতেযায়ীঃ ওজুদ অর্থাৎ জগত এবং কোনো কিছু হাসিল হওয়াকে আমরে এনতেযায়ী বলা হয়।

এমকানঃ সম্ভাব্যতা, অর্থাৎ বিশেষিত জনের জন্য কোনো বিশেষজনের নেসবতের অপরত্ব জরুরী হওয়া।

আনাঃ 'আমি' এ দ্বারা ইশারা করা হয়েছে মর্তবায়ে ওয়াহদাত (এককত্বের স্তর) এবং হাকীকতে মোহাম্মদীর দিকে— যা পৃথককারী প্রাচীর, আবার সমন্বয়কারীও। তাকে এলমে মোজমাল, তাআইয়্যুনে আউয়াল (প্রথম নির্ধারণ)ও বলে।

আনাশ্ শামসঃ সুফীর নজর যদি নিজের দিকে এবং নিজের ধারকৃত নূরসমূহের প্রতি পতিত হয় তখন নিজেকে আনাশ্ শামস (আমি সূর্য) বলে দাবী করে।

আনওয়ারে জমইয়তঃ হিম্মতকে একত্রিত করা এবং নিজের তাওয়াজ্জোহ হক তায়ালার দিকে করার কারণে যে নূর হাসিল হয়, তাকে আনওয়ারে জমইয়ত বলে।

আউয়ালুল আউয়ায়েলঃ লাহুত জগতকে আউয়ালুল আউয়ায়েল বলা হয়।

আওলিয়ায়ে আজলতঃ এমন ওলি, যিনি গায়রুল্লাহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। অর্থাৎ আত্মগোপনকারী ওলি।

আউলিয়ায়ে ইশরতঃ জাহেরী ওলি, যিনি অনুভূতির অবস্থায় থেকে হক তায়ালার লজ্জত হাসিল করেন।

আওতাদঃ ওলিআল্লাহ্ বারো প্রকারের হয়ে থাকেন। তন্মধ্যে এক প্রকারের নাম আওতাদ। সারা বিশ্বে আওতাদ চার জন থাকেন।

বাযেগাশত্ঃ তালেব জিকির করার সময় দিল দ্বারা এই দোয়া করে 'ইয়া ইলাহী মকসুদ মেরা তুহি আওর রেজা তেরী' (হে প্রভু! তুমি আমার কাম্য এবং তোমার সন্তুষ্টি) একে বাযেগাশত্ বলা হয়। নকশবন্দিয়া মাশায়েখগণের শর্তসমূহের মধ্যে এটি ষষ্ঠ শর্ত।

বাতেনে ওজুদঃ প্রত্যেক বস্তুর ওজুদ আল্লাহ্তায়ালার এলেমের মধ্যে সাব্যস্ত আছে। এ স্তরকে সুফিয়ানে কেরামের পরিভাষায় বাতেনে ওজুদ বলা হয়।

বসত্ঃ কলবে কিছু ওয়ারেদ (মারেফত বা ফয়েজ) পতিত হওয়ার পর তা বন্ধ হয়ে যাওয়াকে কবজ বলা হয়। আর তা খুলে যাওয়াকে বলা হয় বসত্।

বসীতে হাকীকীঃ আল্লাহ্তায়ালার ওজুদ।

বা'দাল জমাঃ নফসের প্রকৃত ফানা হাসিল হওয়ার পর দাওয়াত ও এরশাদের দায়িত্ব মিলে। এই মাকামকে বা'দাল জমা বলা হয়।

বেখতরিগীঃ খাতরা এক প্রকারের কল্পনা যা অন্তরের মধ্যে উদয় হয়। বেখতরিগী এমন মাকাম যেখানে উপস্থিত হওয়ার পর তালেবের নফসে মুতমাইন্না হাসিল হয়ে যায় এবং তালেব শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে সুরক্ষিত হয়ে যায়।

বেখোদীঃ আত্মহারা হওয়া, এটি ফানার একটি বিরতি স্থল। হালতে সোকরকেও বেখোদী বলা হয়।

বেরঙ্গীঃ বর্ণবিহীনতা। তওহীদে ওজুদীর বহিঃপ্রকাশ।

বায়াত মাআ আকসামঃ স্বীয় জান-মাল মালেকে হাকিকীর হাওলা করে দেওয়া এবং আল্লাহ্তায়ালার আহকাম পালন করার বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া।

'তা'

তাজাল্লীঃ আল্লাহ্তায়ালার সত্তা, নাম, গুণাবলী ও কার্যাবলীর বিকীরণ কারও উপর পতিত হওয়াকে তাজাল্লী বলে। তাজাল্লীর অনেক প্রকার আছে।

তাজাল্লীয়ে আফআলঃ আল্লাহ্তায়ালা তাঁর কর্মগুণ ও প্রতিপালন গুণাবলীর জ্যোতিসম্পাতের মাধ্যমে সালেকের মধ্যে প্রকাশিত হন। এটাকেই তাজাল্লীয়ে আফআল বলে। তাজাল্লীয়ে আফয়ালীর সময় বান্দা কোনো কাজের নেসবত তার নিজের দিকে করতে পারে না।

তাজাল্লীয়ে যাতঃ যখন আল্লাহ্তায়ালার যাতের তাজাল্লী (সত্তাগত বিকাশ) ঘটে কোনো সালকের উপর, তখন সালেক পূর্ণতঃ ফানা হয়ে যায় এবং এলেম ও অনুভূতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাজাল্লী যাতীর মধ্যে বান্দার এহেন ফানা হাসিল হওয়ার পর সে কেবলই হক তায়ালার মধ্যে অবশিষ্ট থাকে। এটাকেই বাকা বিল্লাহ বলা হয়।

তাজাল্লীয়ে যাতে বাহাতঃ বাহাত মানে খালেস। তাজাল্লীয়ে যাত এর সংজ্ঞার আলোকে একে বলা হয় বিশুদ্ধ ফানা।

তাজাল্লীয়ে সিফতীঃ এখানে সালেক আল্লাহ্তায়ালাকে মূল গুণাবলীর মধ্যে বিকশিত দেখতে পায়।

তাজাল্লীয়ে সুরীঃ আল্লাহ্তায়ালার দীদার।

তাজাল্লীয়ে ফে'লীঃ এখানে সালেক আল্লাহ্তায়ালাকে তাঁর সিফতে ফেলী (কার্য গুণাবলী)সমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি গুণের মাধ্যমে বিকশিত দেখতে পায়।

এখানে বান্দার কথা, কাজ ও এরাদা রহিত হয়ে যায় এবং বান্দা সব কিছুর মধ্যেই আল্লাহ্‌র কুদরত দেখতে পায়।

তানায্‌যুলাতঃ অবতরণসমূহ অর্থাৎ ওজুদ। অতি গোপন স্তর থেকে ক্রমানুসারে সৃষ্টি জগতের মধ্যে নেমে বাগানরূপে সে সুশোভিত হয়েছে। একে তানায্‌যুলাত নাম দেয়া হয়েছে। সমস্ত তানায্‌যুলাতই দৃশ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের তানাযযুল আছে। যেমন, তানায্‌যুলে ওজুবী, তানায্‌যুলে রূহী, তানায্‌যুলে মিছালী এবং তানায্‌যুলে জাসাদী।

তানযিয়াহ্‌ঃ আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলী যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং মুমকিনাত থেকে পবিত্র হওয়াকে তানযিয়াহ্ বলে।

তাআদ্দুদ ও তাকাছ্‌ছুরঃ অনেক সংখ্যা বা অধিক হওয়া। মূলতঃ অধিক সংখ্যা হয় আল্লাহ্‌তায়ালার শান অধিক হওয়ার কারণে।

তাআইয়্যুনঃ অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার স্বীয় যাতকে পাওয়া।

তাআইয়্যুনে আমরঃ ওই জগত, যা আবিষ্কারকের নির্দেশে একবারে বস্তুর পরিধি ও সময়সীমা ব্যতীত বিদ্যমানতা লাভ করেছে। একে আমরও বলা হয়।

তামাক্কুন ও ছুবাতঃ স্থিতিশীলতা অর্থাৎ ওই মাকাম, যেখানে সালেক হালের কাছে পরাজিত হয় না।

তাওয়াজ্জোহ্‌ঃ আল্লাহ্ ছাড়া যা কিছু আছে, সে সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল তাঁর দিকে মনোনিবেশ করা।

‘জীম’

জমইয়তে কলবীঃ হিম্মতকে একত্রিত করে স্বীয় মনোযোগ আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে নিবদ্ধ করা এবং গায়রুল্লাহ থেকে মনকে বিশুদ্ধ করে নেয়া।

জেহেলঃ মূর্খতা– মুর্দা দিলকে সুফিয়ানে কেরাম জেহেল বা মূর্খতা বলে থাকেন। চাই কেউ বছর বছর এলেম হাসিল করে, তবু তার মধ্যে মূর্খতা থাকে।

‘হা’

হাবছে নাফাসঃ জিকির করার সময় দম বন্ধ রাখা।

হাবলুল মতীনঃ আল্লাহ্‌তায়ালার আহকামের অনুসরণ করা। কোরআন হাদিসের অনুসরণ করা। কোরআন ও হাদিসকেই মূলতঃ হাবলুল মতীন বলা হয়।

হুসনঃ যাতে আহাদিয়াতের কামালতকে হুসন বলা হয়।

হুসনে মহযঃ পরিপূর্ণভাবে যাতে আহাদিয়াতের কামালত অর্জন করা। এমন হুসন অর্জন করা, যা কখনও দূরীভূত হয় না। যাতে আহাদিয়াতের খাটি কামালত অর্জন করা।

হুসুলে জমইয়াতঃ জমইয়াত বা অন্তরের খাতিরজমা হাল অর্জন করা।

হুজুরঃ সৃষ্টি থেকে গাফেল হয়ে হক তায়ালার দরবারে কলবের হাজির থাকাকে হুজুর বলা হয়। মাকামে ওয়াহদাতে কলবের উপস্থিত থাকা। লামা কিতাবের লেখক বলেছেন, হুজুর বলতে বুঝানো হয়েছে কলবের উপস্থিতিকে।

হকঃ সুফিয়ানে কেরামের নিকট হক বলতে আল্লাহ্তায়ালাকে বুঝানো হয়। হক্কে বসীত (অবিভাজ্য হক)। পরিভাষাগতভাবে আল্লাহতায়ালার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হক্কে নফসঃ ফরজ বিধানসমূহ আদায় করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন অনুপাতে খাদ্য গ্রহণ করা।

হাকায়েকঃ ওই এলেম, যদ্দ্বারা হক তায়ালার মারেফত হাসিল হয়। হাকীকতের বিভিন্ন প্রকার আছে। তন্মধ্যে এই কিতাবে হাকায়েকে সাবআ (সাতটি হাকীকত) এর উল্লেখ করা হয়েছে।

হাকায়েকে মুমকিনাতঃ মুমকিনুল ওজুদ অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের হাকীকত কাছরত বা একাধিক হওয়াকে হাকায়েকে মুমকিনাত বলা হয়।

হাকীকাতুল হাকায়েকঃ হাকীকাতুল হাকায়েক বলতে যাতে আহাদিয়াত অর্থাৎ একক সত্তা আল্লাহ্তায়ালাকে বুঝানো হয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে ‘হাকীকাতু কুল্লি শাই হুয়াল হক’ অর্থাৎ সকল বস্তুর হাকীকত হচ্ছে হক তায়ালা।

হাকীকতে মোহাম্মদীঃ হাকীকতে ইনসানী বা মানব জাতির হাকীকতের মূল হচ্ছে হাকীকতে মোহাম্মদী। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. ৩/১২৪ মকতুবে এ বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

হাকীকতে হালঃ তালেবের বিভিন্ন অবস্থা ও আত্মিক প্রাপ্তিতে কোনো কোনো সময় হালের প্রাবল্য আসে। বিশেষ করে নামাজের সময় যে হাল অস্থায়ীভাবে উদয় হয়, তা থেকে চেতনা লাভ করাকে হাকীকতে হাল বলা হয়।

‘খ’

খিল্লতঃ খিল্লত অর্থ দুস্তি, বন্ধুত্ব। আল্লাহ্তায়ালার বান্দার বন্ধু হওয়াকে খিল্লত বলা হয়। খিল্লত শব্দ দ্বারা বিশেষ করে হজরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহর দিকে ইশারা করা হয়ে থাকে।

খায়রে মহযঃ নিছক কল্যাণ। দার্শনিকগণ ওজুদ (সৃষ্টিজগত)কে খায়রে মহয মনে করে। আর সুফিয়ানে কেরাম ওজুদকে যাতে মোতলাক এবং জমউল জমা আহাদিয়াতে মোতলাকার মাকাম মনে করেন।

'দাল'

দায়েরায়ে সিফতে কোবরা, দায়েরায়ে যেলাল. বেলায়েতে সোগরা, দায়েরায়ে জেলাল, আসমা ও সিফত, দায়েরায়ে বেলায়েত, দায়েরায়ে বেলায়েতে উলিয়া— এ সমস্ত দায়েরার বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা সুফিয়ানে কেরামের কিতাবাদে ভরপুর।

দায়েমী হুজুরঃ হুজুরীতে সর্বদাই অবস্থান করা।

'জাল'

জিকিরঃ আল্লাহ্‌র স্মরণ। আল্লাহ্‌র স্মরণে সমস্ত গায়রুল্লাহকে মন থেকে বিস্মৃত করে হুজুরে কলবের সাথে আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য ও সঙ্গতার আত্মিক দর্শন লাভ করার চেষ্টায় রত থাকার নাম জিকির। সুফিয়ানে কেরাম জিকিরের বহু প্রকার বর্ণনা করেছেন। যেমন— জিকরে খফী, জিকরে জলী, জিকরে রাবেতা, জিকরে কলবী, জিকরে লেসানী ইত্যাদি।

'র'

রবতে জিল্লিয়াতঃ সুফিয়ানে কেরাম এযাফী মওজুদাত বা সম্বন্ধিত জগতকে প্রতিবিম্ব সাব্যস্ত করেছেন। এই সম্বন্ধিত জগত মূলতঃ সম্ভাব্য জগত। প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে মাদুম— এর কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ওজুদে হাকীকির নূর ও ফয়েজের মাধ্যমে এই অস্তিত্বহীন প্রতিবিম্বটিই প্রতিবিম্বজাত ওজুদে (অস্তিত্বে) পরিণত হয়েছে।

রেজাঃ কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র মহব্বতের মধ্যে ফাটল না ধরা। আনন্দ, দুশ্চিন্তা ও কষ্ট— সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থেকে কৃতজ্ঞ থাকা।

রুইয়াতঃ কোনো জিনিস চোখ দ্বারা দর্শন করা। দিব্যদৃষ্টি দ্বারা অনুভব করা নয়। আল্লাহর দর্শন, আল্লাহর মিলন।

রুইয়াতে এলাহীঃ তাজাল্লীয়ে সুরী। আকৃতিগত বিকাশ।

'যা'

যাওয়ালে আইনঃ আইন এর অর্থ আইনে ছাবেত অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার এলেমের মধ্যে যা সাব্যস্ত। আলমের ওই দর্পন, যা হক তায়ালার এলেমে বিদ্যমান ছিলো এবং এখনও আছে। একে ওয়াহেদিয়াতের মাকামও বলা হয়।

'সীন'

সোকরঃ আত্মহারা হওয়া, আকল অকার্যকর হওয়া— যা মাশুকে হাকীকির জামালের দর্শনের প্রতিফল। এটি এমন একটি হাল, যদ্‌দ্বারা সালেককে অদৃশ্য থেকে সহায়তা করা হয়।

সায়েরে এলমিঃ সায়ের অর্থ ভ্রমণ। সালেকের এক হাল থেকে অন্য হালে, এক ফেল থেকে অন্য ফেলে এবং এক মাকাম থেকে অন্য মাকামে স্থানান্তরিত হওয়া।

'শীন'

শর্তে মোহাযাতঃ বরাবর হওয়ার শর্ত। সুলুকের মাকামসমূহ অতিক্রম করার জন্য মোর্শেদ বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। একেই শর্তে মোহাযাত বলা হয়।

শুহুদঃ দর্শনের হক অনুসারে হক তায়ালাকে দর্শন করা। হক তায়ালাকে এমনভাবে প্রত্যক্ষ করা যে, সালেক তাআইয়্যুনাত (নির্ধারণ) এর স্তরসমূহ অতিক্রম করে চাক্ষুষ তৌহিদের মাকামে পৌঁছে যায় এবং গায়রুল্লাহকে দূর করে ফেলে।

শুহুদিয়াঃ যারা ওয়াহদাতুশ্ শুহুদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বাস করে, তাদেরকে শুহুদিয়া বলা হয়।

শুয়ুনাতঃ শান এর বহু বচন শুয়ুনাত। শান শব্দের অর্থ অবস্থা। অর্থাৎ এলেমের স্তরে হক তায়ালার ওজুদের তাআইয়্যুন (নির্ধারণ)[১] সমূহকে শুয়ুনাত বলা হয়। শুয়ুনাত হচ্ছে খাস যাতে ইলাহীর প্রকার। আর সিফতে এলাহী হচ্ছে শুয়ুনাতের শাখা।

'সোয়াদ'

সানেঃ সানআত শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা। আল্লাহ্‌তায়ালার ফেলসমূহের মধ্যে তৃতীয় স্তর হচ্ছে সানআত, যার অর্থ কোনো জিনিস পয়দা করা। সানে শব্দটি বান্দা এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে যৌথভাবে ব্যবহৃত একটি শব্দ। খালক শব্দের অর্থও সৃষ্টি করা, তবে এটি আল্লাহ্‌র জন্য খাস। বান্দা কোনো কিছু নির্মাণ করলে তাক খালেক বলা যাবে না। বলা যাবে সানে।

সাদেরে আউয়ালঃ আলমে ওজুদের বিস্তৃতি।

সহুঃ চৈতন্য, সোকর (মত্ততা) এর বিপরীত শব্দ। আরেফের অদৃশ্য দিক থেকে অনুভূতির দিকে ফিরে আসা।

সফাঃ পবিত্রতা, খুলুসিয়াত। দিলকে গায়রুল্লাহর কল্পনা থেকে পবিত্র করা।

সিফতে হাকীকিয়া, সিফতে সলবিয়া, সিফতে মারইয়াঃ ওয়াজিবুল ওজুদ আল্লাহ্‌তায়ালার সিফত (গুণাবলী) চার প্রকার— ১. সিফতে সলবী ২. সিফতে

ছুবুতী হাকীকি, ৩. সিফতে হাকীকি মুযাফ, ৪. সিফতে এযাফী মহয। সিফতে সলবী (রহিত গুণাবলী) যেমন এ রকম বলা— আল্লাহ্ মানুষ নন, তিনি বৃক্ষ নন, তিনি শরীর নন। সিফতে ছুবুতী হাকীকি মহয (প্রমাণিত পূর্ণাঙ্গ প্রকৃত গুণাবলী) যেমন ওয়াজেবুল ওজুদ আল্লাহ্তায়ালা সর্বদাই জীবন্ত চিরকালীন সত্তা। সিফতে হাকীকি মুযাফ (সম্বন্ধিত প্রকৃত গুণাবলী) যেমন আল্লাহ্তায়ালা জগত সৃষ্টি করতে সক্ষম। সিফতে এযাফী মহয (নিছক সম্বন্ধিত গুণাবলী) যেমন কারণগত গুণাবলী যা কার্য কারণের বিপরীতে প্রয়োগ হয়। যেমন— পাপের কারণে পাপীকে শাস্তি দেয়া। পরিভাষায় সিফতের মানে হচ্ছে হক তায়ালার যাতের বহিঃপ্রকাশ। এ ছাড়াও সুফিয়ানে কেরামের নিকট সিফতের আরও বিভিন্ন প্রকার আছে।

সুওয়ারে এলমিয়াঃ আসমায়ে এলাহী (আল্লাহ্র নামসমূহ) যে সমস্ত সুরতে প্রকাশ পায় তাকে সুওয়ারে এলমিয়া বা ইসমের প্রকাশস্থল বলা হয়। ওই সকল সুরত যার মধ্যে আসমায়ে এলাহী এলমে এলাহী অনুসারে প্রকাশ পায়।

‘তোয়া’

তরিকায়ে আহমদিয়াঃ এলমে তাসাউফের সিলসিলায় নকশ্বন্দিয়া সিলসিলার ওই শাখা, যাকে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি শায়েখ আহমদ সেরহিন্দী র. সমুন্নত করেছেন। একে তরিকায়ে মোজাদ্দেদিয়াও বলা হয়।

তোফরাঃ নিম্ন থেকে ঊর্ধ্ব মাকামে পৌঁছানো।

তমানিয়াতঃ সালেকের কলব ও নফস হক তায়ালার সাথে মিলিত হয়ে প্রশান্তি লাভ করা।

‘যোয়া’

জিলঃ জিল অর্থ প্রতিবিম্ব। জহুরাত (যা কিছু প্রকাশ পেয়েছে), তাআইয়্যুনাত (যা কিছু নির্ধারণ করা হয়েছে) ওজুদে এযাফী (সম্বন্ধিত জগত) সম্ভাব্য মূল বস্তুসমূহ ও তাআইয়্যুনসমূহের মাধ্যমে যা প্রকাশ পায়, তাকে জিল বা প্রতিবিম্ব বলা হয়।

জুলমাতী আকলঃ ওই আকল, যা পথপ্রদর্শনের মাধ্যমে সঠিক পথে আসে।

জুলমাতী ও নূরানী হেজাবঃ হেজাব অর্থ পর্দা। ওই পর্দা, যা বান্দাকে হক থেকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। হেজাব দু’প্রকার— গোনাহ্ ও লজ্জতের মাধ্যমে যে আচ্ছাদন তৈরী হয়, তাকে জুলমাতী হেজাব বলে। বান্দার মধ্যে আরেক প্রকার হেজাব তৈরী হয় তার নাম নূরানী হেজাব— প্রচলিত এলেমসমূহ অর্জনের মাধ্যমে যে হেজাব তৈরী হয় তাকে নূরানী হেজাব বলে। আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করতে হলে বান্দাকে প্রথমে জুলমাতী হেজাব এবং পরে নূরানী হেজাবসমূহ দূর করতে হয়।

‘আইন’

আলমে আরওয়াহঃ আলমে আরওয়াহ বলতে আলমে মালাকুতকে বুঝানো হয়। আলমে মালাকুতের শাখা হচ্ছে আলমে মাহযুয (অনুভবযোগ্য জগত)। আলমে আরওয়াহ আলমে মাহসুযের বিপরীতে অবস্থিত। এই মাকামে আরওয়াহ আলমে মাহসুযের তুলনায় দর্শনের তৃপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর প্রকাশ্য এবং সুদৃঢ়। আলমে আরওয়াহতে অনুভবকৃত অর্থটি আকৃতিতে প্রকাশিত হয়।

আলমে আমরঃ ওই জগত, যা সময়সীমা ও মূল বস্তুবিহীন অবস্থায় আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুমে অস্তিত্ববান।

আলমে খালকঃ দৃশ্যমান জগত, যে জগত মূল বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আলমে মিছালঃ এটি আলমে মালাকুত এবং আলমে নাসুত (জড় জগত) এর মধ্যে অবস্থিত দেয়াল স্বরূপ একটি জগত।

উবুদিয়াতঃ স্বাধীনতার বাইরে যা। উবুদিয়াতের শেষ সীমা হচ্ছে হুররিয়াত বা স্বাধীনতা।

আদমঃ হীনতা, অসৃষ্ট, বিলুপ্ত, কোনো কিছু রহিত হয়ে যাওয়া, কোনো কিছু না হওয়া।

আদমুল কুদরতঃ অক্ষমতা।

আদমুল এলেমঃ মূর্খতা।

আদমে মহযঃ শুধুই নিস্তী বা হীনতা যা অজুদের বিপরীত। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালার সাথে কোনো কিছু অংশী হওয়ার ধারণা। এটা হচ্ছে আদমে মহয।

উরুজঃ দেহ থেকে আহাদিয়াত পর্যন্ত পৌঁছা। সালেক স্বীয় দেহকে নিমজ্জিত করে আলমে মিছালে, অতঃপর আলমে মিছালকে হারিয়ে আলমে আরওয়াহতে, তারপরে আলমে আইয়ানে, সেখান থেকে ওয়াহদাত, ওয়াহদাত থেকে আহাদিয়াতের মাকাম পর্যন্ত ঊর্ধ্ব আরোহণ করাকে উরুজ বলা হয়।

এলেমঃ কোনো বিষয় বা বস্তুকে যথাযথভাবে জানা। সুফিয়ানে কেরাম এলেমের অনেক প্রকার বর্ণনা করেছেন। যেমন এলমে হুসুলী, এলমে হুজুরী, এলমে আযলী ইত্যাদি।

আনাসেরে আরবাআঃ চারটি মৌলিক পদার্থ— আগুন, পানি, মাটি ও বাতাসকে আনাসেরে আরবাআ বলা হয়। সুফিয়ানে কেরাম চার আনাসেরকে চার প্রকার নফসের সাথে তুলনা করেছেন। আগুনকে নফসে আম্মারা, হাওয়াকে নফসে লাওয়ামা, পানিকে নফসে মোলহেমা এবং মাটিকে নফসে মুতমাইন্নার সাথে তুলনা করেছেন।

ঈসাবিউল মাশরাবঃ খফী লতিফার আসল। এই মাকাম হজরত ঈসা আ. এর পদতলে। এই লতিফার সালেক ঈসাবিউল মাশরাব হয়ে থাকে।

আইনঃ হক তায়ালার সত্তায় বিলীন হয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া, নিমজ্জিত হওয়া।

আইনিয়াত ও এত্তেহাদঃ মিলন, বাকার মাকামে উপনীত হওয়া।

'গইন'

গলবাঃ হালের কাছে পরাজিত হয়ে সালেকের কার্যকারণের এবং আদবের প্রতি লক্ষ্য করা অসম্ভব হওয়া।

গয়বতঃ নিজের সত্ত্বা এবং মাখলুকের দিক থেকে অনুপস্থিত থেকে হক তায়ালার দিকে হাজির থাকা।

গয়রতঃ লজ্জাশীল হওয়া। এর প্রকার দু'টি ১. মাখলুক থেকে লজ্জাশীল হওয়া, ২. হক তায়ালার প্রতি লজ্জাশীল হওয়া।

গয়রত আয খালকঃ এর অর্থ বান্দা স্বীয় গোনাহে লজ্জিত হয় এবং কোনো মাখলুকের হক নষ্ট করে না।

'ফা '

ফানাঃ অনুভূতিহীনতাকে ফানা বলা হয়। যাতে আহাদিয়াতের মধ্যে এমনভাবে নিমজ্জিত হওয়া, যেনো নিজের ব্যাপারেও হুঁশ না থাকে। ফানার কয়েকটি স্তর বর্ণনা করা হয়েছে।

ফানায়ে আফআলীঃ নিজের কাজ ও মাখলুকের কাজকে আল্লাহ্‌তায়ালার কাজের মধ্যে বিলীন করে দেয়া। ফানার অন্যান্য প্রকার— যেমন ফানায়ে সিফতী, ফানায়ে যাতী, ফানায়ে কলব ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একই বিধান।

'ক্বফ'

ক্ববজঃ ওয়ারেদাতে কলবী (কলবের মধ্যে যা কিছু আবির্ভূত হয়) তা বন্ধ হয়ে যাওয়াকে কবজ বলা হয়।

ক্বলবঃ কলব একটি নূরানী জাওহার (মৌলিক বস্তু) যার মূল নেই। যা মানুষের রূহ ও নফসের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

ক্বলবে সনুবরীঃ সনুবর বৃক্ষের (দেবদারু বৃক্ষের মতো এক প্রকার বৃক্ষ) ন্যায় গোশতের একটি টুকরার নাম কলব— যা মানুষের বাম স্তনের নিচে অবস্থিত। কলবের নূর হলুদ বর্ণ— সরিষা ফুলের রঙের মতো।

কেনাআত— রুচির চাহিদা শেষ হয়ে যাওয়ার অবস্থায় মনের মধ্যে যে প্রশান্তি আসে তাকে কেনাআত বলে।

'কাফ'

কাসরতে জিল্লিঃ (প্রতিবিম্বগত আধিক্য) এর দ্বারা মাখলুকসমূহকে বুঝানো হয়েছে। যা আল্লাহ্‌তায়ালার নামসমূহের প্রকাশের আধিক্য।

কসবঃ বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছার মাধ্যমে যে কাজ করা হয়, তাকে কসব বলে। এটা দু'প্রকার— ভালো ও মন্দ উভয় কাজেরই কাসেব (অর্জনকারী) হতে পারে বান্দা।

কাশফঃ অদৃশ্যের বিষয়াদি এবং বাস্তবতার রহস্য থেকে পর্দা অপসারিত হওয়া। পর্দার অন্তরালের ওজুদ (জগত) ও শুহুদ (দৃশ্য) বিষয়ে অবগত হওয়াকে কাশফ বলা হয়। কাশফ দু'প্রকার— কাশফে সুরী এবং কাশফে মানবী।

কাশফে কওনীঃ কাশফে সুরীর (আকৃতিগত উন্মোচনের) যে সকল বিষয় স্বপ্নের মাধ্যমে উপস্থিত হয়, তা জাগ্রত অবস্থায়ও দেখা যায়। কাশফে সুরীর মাধ্যমে জাগতিক বিষয়ে অদৃশ্য সম্পর্কে যদি অবহিত হওয়া যায়, তবে তাকে কাশফে কওনী বলা হয়।

কামালঃ গুণাবলী ও বস্তুগত প্রতিফলন থেকে পবিত্র হওয়ার নাম কামাল। কামাল দু'প্রকার, ১. কামালে যাতী (সত্তাগত পূর্ণতা) যার সম্পর্ক হক তায়ালার জহুরের (আবির্ভাবের) সাথে। ২. কামালে আসমায়ী (নামগত পূর্ণতা) যার সম্পর্ক হক তায়ালার স্বয়ং জহুরের সাথে এবং হক তায়ালার স্বয়ং সত্তা দর্শনের সাথে।

'লাম'

লাতায়েফঃ মানব দেহের মধ্যে এমন কিছু স্থান রয়েছে, যেখানে আল্লাহ্‌তায়ালার ফয়েজ, নূর ও বরকতসমূহ নাযিল হয়। সুফিয়ানে কেরামের মতে সাধারণতঃ তা দুই প্রকার। কিন্তু মোজাদ্দেদিয়া তরিকার বুজুর্গগণ বলেছেন, মানুষ দশ লতিফায় গঠিত।

লতিফাঃ লতিফা মানে মানব দেহের সূক্ষ্ম অঙ্গ। যে সম্পর্কে সহজে বোধগম্য হওয়া যায় না। বিভিন্ন ওয়ারেদাত (আত্মিক প্রাপ্তি) বিভিন্ন লতিফার মধ্যে নাযিল হয়। যেমন লতিফায়ে দেমাগী, লতিফা রূহ, সির, খফী, আখফা ও নফস।

'মীম'

মাবদাঃ প্রকাশস্থল। সালেকের যাত্রা শুরু হয় আসমায়ে কুল্লী কাওনীর রাস্তা থেকে। এ জন্য যাত্রাস্থলকে মাবদা বলা হয়। সুফীয়ানে কেরাম মাবদা (উৎপত্তিস্থল) ও মাআদ (প্রত্যাবর্তনস্থল) এর বিষয়ে বিভিন্ন পুস্তিকা রচনা করেছেন।

মোহাম্মদিউল মাশরাবঃ লতিফা আখফার আসল, যার বেলায়েত নবীয়ে আখেরুজ্জামান স.এর পদতলে। এই মাকামের সালেককে মোহাম্মদিউল মাশরাব বলা হয়।

মহবিয়তঃ মুনতাহী (শেষ সীমায় উপনীত সালেক) এর ওই মাকামকে মহবিয়ত বলা হয়, যেখানে পৌঁছার পর কাশফ ও কারামতসমূহ বন্ধ হয়ে যায়। হুজুরীর আত্মিক স্বাদের মাধ্যমেও তার সায়ের পরিচালিত হয় না।

মেরআতঃ অর্থ দর্পন। তাসাউফের পরিভাষায় এলমে এলাহীকে মেরআত বলা হয়।

মেরআতে কওনীঃ ওজুদ বা সৃষ্টজগতকে মেরআতে কওনী বলা হয়। কেনোনা সৃষ্টিসমূহ, তাদের গুণাবলী, দৃশ্য ও বিধানসমূহ এ জগতের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়।

মেরআতুল ওজুদঃ তাআইয়ুনাতে শুয়ুন বা বাতেনী শানসমূহের নির্ধারণকে মেরআতুল ওজুদ বলা হয়।

মোরাকাবাঃ গায়রুল্লাহর অবস্থান দিলের মধ্যে আছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করাকে মোরাকাবা বলা হয়। মোরাকাবা তারাক্কুব শব্দ থেকে এসেছে— যার অর্থ প্রতীক্ষা করা। অর্থাৎ ফয়েজে এলাহীর প্রতীক্ষায় থাকা। মোরাকাবার দু'টি শর্ত আছে। ১. যাতে আহাদিয়াতকে পর্যবেক্ষণ করা ২. নিজের দিলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা।

মর্তবাঃ যার উপর বস্তুর বিধান বর্তায়।

মারাতেবঃ মর্তবা এর বহুবচন মারাতেব।

মারাজাল বাহরাইনে ইয়ালতাক্বিয়ানঃ ওজুব (অবশ্যম্ভাবী সত্তা) এবং এমকান (সম্ভাব্য জগত) এর দুই সমুদ্র এক সাথে মিলিত হয়। কিন্তু এর মধ্যকার প্রাচীর দুটিকে একে অপরের সাথে মিশ্রিত হতে দেয় না।

মস্তিঃ বন্ধুর সৌন্দর্য দর্শনকারী সালেকের দিলের মধ্যে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, তাকে মস্তি বলা হয়।

মশহুদঃ দর্শিত।

মসনুঃ সৃষ্টিকৃত।

মাকামে রেজাঃ সন্তুষ্টির স্থান।

মাকামঃ হাল যখন স্থায়ী হয় এবং সালেকের যোগ্যতা সুস্পষ্ট হয়ে যায়, তখন তাকে বলা হয় মাকাম।

মালাকাঃ যোগ্যতা, আমল পাকাপোক্ত হওয়া, নেক আমলে অভ্যস্ত হওয়া।

মালাকায়ে হুজুরীঃ হুজুরীর যোগ্যতা স্থায়ী হওয়া।

মাওয়াজীদঃ সুফী কাশফ ও আত্মিকপ্রাপ্তির মাধ্যমে যে সমস্ত হাল প্রাপ্ত হয়, তাকে মাওয়াজীদ বলা হয়।

মুসাবিউল মাশরাবঃ সির লতিফার আসল, যার বেলায়েত হজরত মুসা আ. এর পদতলে। এ ধরনের সালেককে মুসাবিউল মাশরাব বলা হয়।

'নূন'

নেসবতঃ আল্লাহ্‌তায়ালা ও বান্দার মধ্যে যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, তাকে নেসবত বলা হয়। সুফিয়ানে কেরাম নেসবতের কয়েকটি প্রকার বর্ণনা করেছেন। যেমন—

নেসবতে বাকায়ী (স্থিত হওয়ার নেসবত), নেসবতে মোহাযাত (সমান্তরাল হওয়ার নেসবত), নেসবতে ফানা (লীন হওয়ার নেসবত) ইত্যাদি।

নফসঃ নফস শরীরের সাথে সম্পর্ক রাখে। শরীরের ব্যবস্থাপনায় সে চলে। তাই তাকে বলা হয় নফস।

নফসে আম্মারাঃ নফসে হায়ওয়ানী যখন নফসে রূহানীর উপর প্রবল হয়ে যায়, তখন তাকে নফসে আম্মারা বলা হয়।

নফসুল আমরঃ কোনো কোনো সুফিয়ানে কেরামের নিকট নফসে আমর হচ্ছে আকল।

নফসে মোতমাইন্নাঃ নফস নিজের মন্দ আমলের কারণে নিজেকে তিরস্কার করতে থাকলে তাকে নফসে লাউয়ামা বলে। আর যখন নফসের মধ্যে কলবী নূরসমূহ হায়ওয়ানী শক্তির উপর প্রবল হয়ে যায় এবং সে কারণে নফস প্রশান্তি লাভ করে তখন তাকে নফসে মোতমাইন্না বলা হয়।

নফী ও ইছবাতঃ তৌহিদের দুটি দিক রয়েছে— নফী (রহিত করা) ও ইছবাত (সাব্যস্ত করা)। দুটি দিকই রয়েছে কলেমা তাইয়্যেবায়। নফী হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার সত্তাকে নাকেস গুণাবলী থেকে পবিত্র করা। অর্থাৎ নাকেস গুণাবলী আল্লাহ্ থেকে নফী করে দেয়া। আর ইছবাত হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার সুন্দর নামসমূহ যা তিনি তাঁর শানের ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছেন, তা সাব্যস্ত করা। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার হাকীকত নফী ও ইছবাত উভয় থেকেই পবিত্র।

নূরানী আকলঃ যা কোনো মাধ্যম ছাড়াই মকসুদের দিকে পথ প্রদর্শন করে।

নূরে মোম্বাসাতঃ ওই নূর, যার বিস্তার খুব বেশী।

নিস্তীঃ অস্তিত্বহীন, তার বিপরীত হচ্ছে হাস্তি (অস্তিত্ববান)। হাস্তি মানে হচ্ছে যার বাস্তবায়ন হয়েছে, যা পাওয়া গেছে। কেনোনা যা হাস্তি (বাস্তবায়ন হয়েছে) তাকেই পাওয়া যায়। নিস্তীর জন্য বাস্তবায়ন নেই এবং তাকে পাওয়াও যায় না।

‘ওয়াও’

ওয়ারেদাতঃ আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহের মধ্যে যা বিনা চেষ্টায় অন্তরের মধ্যে আসে। ভালো কল্পনা, ওই কথা— যা বান্দা কোনো আওয়াজ ছাড়া বুঝতে পারে।

ওজুবঃ আল্লাহ্তায়ালার সত্তা নিজের ওজুদের আকাংক্ষী হওয়া। কখনও কখনও ওজুব দ্বারা আল্লাহতায়ালাকে বুঝানো হয়।

ওজুদঃ অস্তিত্ব, জাতে বাহাত (মূল ও অবিভাজ্য সত্তা), ওয়াহেদিয়াত, এককত্ব। জাতের ওই স্তর, যেখানে সিফত যুক্ত থাকে না। সুফিয়ানে কেরাম আপন আপন প্রজ্ঞা ও রুচি অনুসারে শব্দটির পরিভাষাগত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ওজুদে মোম্বাসাতে আমঃ ওজুদের প্রতিবিম্ব। হক তায়ালার প্রশস্ত রহমত ওজুদে খারেজীতে প্রতিবিম্বিত হওয়া। ওজুদে খারেজী এবং ওজুদে যেহনীর ছায়া উক্ত ছায়ারই প্রতিচ্ছায়া।

ওজুদে খারেজীঃ সম্ভাব্য জগত, যা প্রকৃতপক্ষে মাদুম (অস্তিত্বহীন) এর অন্তর্ভুক্ত। ইসমে নূর থেকেই তা জাহির হয়েছে। এ জন্য এর বহিঃপ্রকাশকে ওজুদে এযাফী এবং ওজুদে খারেজী বলা হয়।

ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদঃ এর ব্যাখ্যা হজরত মাযহার র. এর ২৩ নং মকতুবে দ্রষ্টব্য।

ওয়াহ্‌দাতুশ্‌ শুহুদঃ এর ব্যাখ্যা হজরত মাযহার র. এর ২৪ নং মকতুবে দ্রষ্টব্য।

ওয়াসলঃ মাহবুবের সাথে মিলিত হওয়া। বিচ্ছেদের পর মিলনের মধ্যে যে স্বাদ থাকে, তাকে ওয়াসল বলা হয়। সুফিয়ানে কেরামের নিকট অবশ্য মিলন ও বিরহ উভয়ই সুস্বাদু।

ওকুফে কলবীঃ আল্লাহ্‌তায়ালা সম্পর্কে জিকিরকারীর অবগতি ও চৈতন্যময়তা।

বেলায়েতঃ ওই মাকাম, যেখানে বান্দা আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ থেকে তাসাররুফাত (পরিবর্তন করানো) এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। এর দ্বারা আল্লাহ্‌ অন্বেষণকারী যোগ্য ব্যক্তির মধ্যে আছর সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় এবং তরিকতের সালেকদেরকে নৈকট্যের স্তরসমূহে পৌঁছে দিতে পারে।

বেলায়েতে উলিয়াঃ ফেরেশতাদের বেলায়েত।

বেলায়েতে সোগরাঃ অধিক জিকির যখন শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে, তখন তাকে বেলায়েতে সোগরা বলা হয়। এখান থেকে ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ আরম্ভ হয়। বেলায়েতে সোগরার মাকাম হচ্ছে কলব লতীফা।

বেলায়েতে কোবরাঃ সালেকের বৃহত্তম 'আমি' তে ফানা হওয়ার পর বাকা হাসিল করাকে বেলায়েতে কোবরা বলা হয়।

'হা'

হাবাঃ তানায্‌যুলাতে ওজুদ (সৃষ্টিজগতের অবতরণ) এর ওই স্তর, যেখানে আলমের দেহসমূহকে প্রসারিত করা হয়। স্তরটি হাকীকি নয়, কাল্পনিক। আকলে আউয়ালের পর এটি চতুর্থ স্তর।

হুজুমঃ কোনো কিছু শক্তিশালীভাবে অন্তরের মধ্যে আগমন করা, যার মধ্যে চেষ্টার কোনোরূপ দখল থাকে না।

সমাপ্ত

ISBN
984-70240-0061-3